প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ১৯৫৯

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ
অমিতাভ ভট্টাচার্য. . .

অক্ষর বিন্যাস
ভারবি
১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

কবি শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সুহৃদ্বরেষু

সূচী

নবচর্যাপদ ॥ ১
বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেব ॥ ১০
বাউল গান ॥ ২৩
প্রবন্ধনিবন্ধ ॥ ২৭
বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজপ্রেক্ষিত ॥ ৩৮
'শিক্ষার মিলন' ও 'শিক্ষার বিরোধ':
রবীন্দ্র-শরৎ প্রসঙ্গ ॥ ৫০
বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য ॥ ৬৪
আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে ॥ ৭৭
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ ৮৮
সুকুমার সেন ॥ ১০০
মোহিতলাল মজুমদার ॥ ১০৪
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১১২
শশিভূষণ দাশগুপ্ত ॥ ১১৮
তারাশঙ্কর, বিশালতা ও উত্তরকাল ॥ ১২৯
গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে ॥ ১৩২

নবচর্যাপদ

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) প্রায় আকস্মিকভাবেই বাংলা ভাষার আদি গ্রন্থ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ('চর্যাগীতিকোষ') সঙ্কলন গ্রন্থটি আবিষ্কার করিয়া (১৯০৭) এবং 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর পরে আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমূহের অধ্যক্ষ এবং বাংলা সাহিত্যের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক,' অধুনা প্রয়াত, ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯১৬) সেইরূপ আকস্মিকভাবেই বক্ষ্যমাণ সঙ্কলনে-গৃহীত 'নব চর্যাপদ' আবিষ্কার করিয়াছিলেন (১৯১৬)। * তাঁহার এই আবিষ্কারের সংবাদ কলিকাতার দুইটি সংবাদপত্রে (The Statesman, April 23, 1923 এবং আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ মে, ১৯১৬) ঘোষিত হইবার পর প্রাচীনসাহিত্যামোদী পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষকগণ ডঃ দাশগুপ্তকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অতঃপর নবাবিষ্কৃত চর্যাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগকে অবহিত করিবার জন্য ড. দাশগুপ্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯১৬) অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিদ্বজ্জনসভায় উক্ত সংগ্রহ হইতে দুইটি গান টেপ রেকর্ডারে বাজাইয়া শোনান এবং সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁহার এই আলোচনার সারাংশ প্রথমে 'সাহিত্যের খবরে', পরে 'নবপর্যায় চতুষ্কোণে' (শ্রাবণ ১৩৭১/আগস্ট ১৯১৬) পুনর্মুদ্রিত হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নেপালের বজ্রযানী বৌদ্ধ সাধকেরা একালেও চর্যাগানের অনুরূপ গান সাধনভজনে ব্যবহার করেন। এই অঞ্চলে 'চর্যা' শব্দ রূপান্তরিত হইয়া 'চচা' বা 'চাচা' গান নামে পরিচিত হইয়াছে। এই মতের সাধকদের কাছে উক্ত 'চাচা' গানের পাণ্ডুলিপি এখনও আছে।

বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান— যাহা সাধারণতঃ 'মন্ত্রনয়' বলিয়া পরিচিত, তাহার তত্ত্ব, দর্শন ও গান এখন আর বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ বৌদ্ধ সহজিয়াদের ধ্বংসাবশেষ হইলেও দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর তান্ত্রিক বৌদ্ধ সহজিয়ারা কীভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আত্মরক্ষা করিল, 'নেড়া-নেড়ী' এই অপনাম হইতে উদ্ধার পাইয়া নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের (বীরচন্দ্র) কৃপায় বৈষ্ণব সহজিয়া নামে বৈষ্ণব সমাজের একান্তে গৃহীত হইল এবং কীভাবেই বা তাহাদের কোনো কোনো উপদল পরবর্তীকালে বাউল সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করিল তাহা লইয়া পুংখানুপুংখভাবে গবেষণার এখনও বিশেষ অভাব আছে। সে যাহা হউক, ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় তাঁহার এই আবিষ্কারের কথা আনুপূর্বিক বিবৃত করেন।

এই প্রসঙ্গে ড. আর্নল্ড্ অ্যাড্রিয়ান বাকে (১৮৯৯-১৯১৬) সাহেবের নামটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। বস্তুতঃ তিনিই নেপালের এই 'চাচা' গানের প্রথম সন্ধান পান। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট বাকে সাহেব লণ্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড

* দ্রষ্টব্য : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'নব চর্যাপদ'।

আফ্রিকান স্টাডিজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। গানের নেশায় তিনি দক্ষিণ ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালের নানা স্থান হইতে গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বিপুল সংগ্রহের মধ্যে নেপালে সংগৃহীত 'চাচা' গানও ছিল। এই গানগুলি তিনি ১৯৫৪-৫৬ সালে নেপালের এক বজ্রাচার্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। তখনই তাঁহার মনে হইয়াছিল, এই 'চাচা' গানগুলির সঙ্গে বাংলা চর্যাগানের কোনো প্রকার সংযোগ থাকিতে পারে। তাঁহার অনুমানটি খতাইয়া দেখিবার জন্য একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। ১৯১৬ সালে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত লণ্ডনে স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজে রবীন্দ্রস্মারক বক্তৃতা দানের জন্য আহূত হন। তখন ড. বাকে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এই চাচা গানের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শশিভূষণ টেপরেকর্ডারে গৃহীত গান শুনিয়া এবং উহার কপি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, বাকে-সংগৃহীত চাচা গানগুলি অর্বাচীন হইলেও পুরাতন চর্যাগানেরই বংশাবতংস। তখন তিনিও নেপালে গিয়া ঐ-বিষয়ে সন্ধানের সিদ্ধান্ত করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি নেপালযাত্রা করেন এবং সকলানন্দ বজ্রাচার্য নামে এক বজ্রযানী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিছু কিছু বজ্রগীতির সন্ধান পান। ড. বাকের নিকট তিনি বাইশটি গানের কপি পাইয়াছিলেন —নেপালে গিয়া সন্ধান করিতে লাগিলেন ইহার অতিরিক্ত আর কোনো গান পাওয়া যায় কিনা। এই সমস্ত গোপনীয় পুঁথিপত্র মুষ্টিমেয় বজ্রযানী সাধকদের কাছে আছে, কিন্তু তাঁহারা সেগুলি কাহাকেও দেখিতে দেন না। যাহা হউক, শশিভূষণ তাঁহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া কিছু কিছু পুঁথি দেখিয়া ও নকল করিয়া লইলেন। অবশ্য ইঁহারা দিবালোকে এই পুঁথি বাহির করিতেন না, রাত্রিকালে প্রদীপের আলোকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া শশিভূষণ পদগুলি লিখিয়া লইতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা হইল পুঁথিগুলি বিশেষ পুরাতন নহে, নেওয়ারি অক্ষরে লেখা অর্বাচীনকালের নকল। পুঁথির পাঠও অধিকাংশস্থলে বিকৃত। কোনো কোনো পুঁথিতে নেওয়ারি ও নাগরি হরফের যথেষ্ট সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। বিশখানি পুঁথি সন্ধান করিয়া তিনি মোট ২৫০টি গান পাইলেন। কতকগুলি রচনা এত অর্বাচীনকালের যে, তাহা হইতে পুরাতন কালের স্বাদগন্ধ অতি অল্পই পাওয়া যায়। অনেক গান নিছক পুনরাবৃত্তি মাত্র। গানগুলির প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা বিচার করিয়া শশিভূষণ মুদ্রণের জন্য ১০০টি গান নির্বাচন করেন। গানগুলির ভাষাভঙ্গী ও তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ধরিয়া তিনি উহাদের তিনটি কালপর্যায়ে বিভক্ত করেন। তাঁহার মতে, এই সঙ্কলনের ১ হইতে ১৯ সংখ্যক গান শাস্ত্রী সম্পাদিত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর সমকালের পদ অর্থাৎ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে। ২০ হইতে ৬৩ সংখ্যক পর্যন্ত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে এবং ৬৪ হইতে ৯৮ সংখ্যক পদ তাহারও পরবর্তীকালের রচনা। আমরা এই গ্রন্থ সঙ্কলনের সময় তাঁহার কৃত প্রেসকপিতে মোট ৯৮টি গান পাইয়াছি, এখানে তাহাই মুদ্রিত হইল। ৯৯ ও ১০০ সংখ্যক গান দুইটি ড. দাশগুপ্ত বাদ দিলেন কেন তাহা বুঝা যাইতেছে না। আমরা তাঁহার সংগ্রহের দুই-এক খানি পুঁথি দেখিয়াছি, তাহার পাটায় বজ্রযানী দেবদেবীর রঙিন চিত্রও দেখিয়াছি।

শশিভূষণ নানা উৎস হইতে এই পদগুলির পাঠ নির্ধারণ ও টীকা রচনা করিয়া বিস্তারিত ভূমিকাসহ 'নব চর্যাপদ' প্রকাশ করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার মনোগত অভিলাষ। সেই অভিপ্রায়ে পদগুলিকে ছোট ছোট খাতায় লিখিয়া অনেকগুলি পদের পাঠান্তর দিয়া, কিছু ব্যাখ্যা করিয়া প্রেসকপি প্রস্তুত করিতেছিলেন। প্রথম দিকে গানের টীকা ও পাঠান্তর কিছু বিস্তারিত, শেষের দিকে টীকা ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত, কোনোটির একেবারেই কোনো টীকা বা পাঠান্তর নাই। কালব্যাধি তাঁহার দেহ গ্রাস করিলে প্রেসকপি আর পুরা করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রেসকপির অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি যথাদৃষ্ট প্রকাশ করা হইল। তাঁহার রচনা ও সঙ্কলনে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ

করা হয় নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী 'নবাবিষ্কৃত চর্যাপদের তত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতি' নিবন্ধে পদগুলির তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার 'চর্যাপদ ও ভাষাপ্রসঙ্গে' তাঁহার নিজস্ব অভিমত দিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক তাহা দেখিয়া লইতে পারেন।

তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনপদ্ধতি ও চর্যাগানের প্রতি ড. দাশগুপ্তের আকর্ষণের কথা পাঠক ও গবেষকগণ অবগত আছেন। এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করিতেছিলেন তখনই তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহল বোধ করেন। এম. এ. পাস করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে ১৯৩৭ সালে তিনি *An Introduction to Tantric Buddhism* শীর্ষক গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। তাহাতেই দেখা গেল, তিনি গবেষকের দৃষ্টির সাহায্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে তথ্য সন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য এ অমূল্য রচনার মুদ্রণ বহুদিন বন্ধ ছিল। অতঃপর ১৯৫০ সালে ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। ঐ গবেষণা সমাপ্তির দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি *Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature* শীর্ষক গবেষণার জন্য পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন (১৯৪০)। গ্রন্থটি ১৯৪৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ড. দাশগুপ্ত মধ্যযুগের নানা ধর্ম ও উপধর্ম সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়া বাংলা সাহিত্যের গবেষণাত্মক পরিচয় দিলেন এবং সবিস্তারে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধন-তত্ত্ব, তাহার নানা যান-উপযান ব্যাখ্যা করিয়া বাংলা চর্যাগানের গূঢ় রহস্যের গুটি ভাঙিয়া এবং প্রতীক-রূপকের খোলস ছাড়াইয়া সহজ ভাষায় এই বিচিত্র সাধনপদ্ধতি ব্যাখ্যা করিলেন। অবশ্য তাঁহার পূর্বে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব ১৯২৮ সালে প্যারিস হইতে তাঁহার যে গবেষণা গ্রন্থ (*Les Chants Mystiques de Kanha et de Saraha*) প্রকাশ করেন, তাহাতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও সাধনপ্রণালী ব্যাখ্যা করিলেও তাহার প্রধান উপাদান হইয়াছিল কাহ্ন ও সরহের দোহা। অবশ্য ইহাতে তিনি 'তাঞ্জুর' (*Bstanhgyur*) অবলম্বনে বাংলা চর্যাগানের ('চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বিধৃত) পাঠ নির্ণয় ও সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত শহীদুল্লাহ্ সাহেবের উক্ত গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের ঠিক নয় বৎসর পরে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত সবিস্তারে এই গ্রন্থস্থিত তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু দুইখানি ইংরেজি গ্রন্থ লিখিয়াই এ-বিষয়ে তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্ত হইল না। ইহার পর নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরে প্রবন্ধগুলি সঙ্কলিত হইয়া 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি' (১৯৫৭) নামে প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি বৌদ্ধ দর্শন, মহাযান মতবাদ এবং তাহার সঙ্গে বেদান্তের সম্পর্ক, বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনতত্ত্বসহ চর্যাগানের নানা দিক ধরিয়া আলোচনা করিলেন। তাঁহার পরেও অনেক দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম ও চর্যাগান লইয়া গবেষণা করিয়া চলিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' প্রকাশের পর এ বিষয় বিশেষজ্ঞমহলে কিরূপ কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত চর্যাগান ও দোহাকোষের বিভিন্ন সংস্করণ হইতেই প্রমাণিত হইবে।

১. চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ('হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'): সম্পাদনা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত। কলিকাতা, ১৯১৬

২. চর্যাপদ : সম্পাদনা —মণীন্দ্রমোহন বসু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত। কলিকাতা, ১৯৪৩

৩. চর্যাগীতিপদাবলী : সম্পাদনা—সুকুমার সেন। কলিকাতা, ১৯১৬

৪. চর্যাগীতিকা : বৌদ্ধ গান ও দোহা : সম্পাদনা সৈয়দ আলী আহ্‌সান। বাংলা অ্যাকাডেমি গবেষণা বিভাগ প্রকাশিত। ঢাকা, ১৯১৬

৫. চর্যাগীতিকোষ (ফটোমুদ্রণ সংস্করণ) : সম্পাদনা—নীলরতন সেন। কলিকাতা, ১৯১৬

৬. সিদ্ধসাহিত্য (হিন্দী) : ধর্মবীর ভারতী। এলাহাবাদ, ১৯৫৫

৭. দোহাকোষ (হিন্দী) : সম্পাদনা—রাহুল সাংকৃত্যায়ন। বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ। পাটনা, ১৯৫৭

৮. *Dohākosa, Part I, Edited by Prabodh Chandra Bagchi, Calcutta, Series No 25C*

৯. *Some Aspects of Buddhist Mysticism in the Caryāpadas, P. C. Bagchi, Calcutta Oriental Journal, Vol.I No.5, 1934*

১০. *Materials for a Critical Edition of the Old Bengali Caryāpadas (A Comparative study of the text and the Tibetan translation), Part I, Journal of the Department of Letters, Vol. XXX, Calcutta University, 1938 (Ed. P. C. Bagchi)*

১১. *Les Chants Mistiques de Kanha et de Saraha—Muhammad Shahidullah, Published by Adriea Maison neuve, Paris, 1928*

১২. *Buddhist Mystique Songs— Edited by Md. Shahidullah. First published in Dacca University Studies, Vol. IV, No. 11, 1940, Dacca. Reprinted by the Bengali Literary Society, Department of Bengali, University of Karachi, 1934. Revised and enlarged edition published by the Bangla Academy, Dacca, 1934*

১৩. *Index Verborum of the Old Bengali Caryā Songs and Fragments, Vol. IX, Sukumar Sen, Calcutta, 1947*

১৪. *Old Bengali Texts or Caryā-Gitikosa– Ed. by Sukumar Sen, Indian Linguistics, Vol, X, Calcutta, 1948*

১৫. *Caryāgitikosa of Buddhistic Siddhas– Ed. by Prabodh Chandra Bagchi in collaboration with Sānti Bhiksu Sāstri, Visva-Bharati, Santiniketan, 1956*

১৬. *The Old Bengali Language and Text– Ed. by Tarapada Mukherjee, Calcutta University, 1934*

১৭. *An Anthology of Buddhist Tantric Songs : A Study ot the Caryāgiti– Ed. by Per Kvaeme, Published by Det Norseke Vidensaps Akademi, Universitet forlaget, Oslo, 1934*

১৮. *Caryāgiti-kosa (Facsimile Edition)– Ed.by Nilratan Sen, Published by Indian Institute of Advanced Study, Simla, 1934*

চর্যাগানের ও দোহাকোষের এতগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *Origin and Development of the Bengali Language (Vols. I-II)*-এ চর্যার ভাষাবৈশিষ্ট্য, ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের *Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature* ও 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি'তে চর্যাগানের সাধনতত্ত্ব, ড. শহীদুল্লাহের *Les Chants Mystiques de Kanha et de*

Saraha-তে কাহ্নপাদ ও সরহপাদের দোহাকোষধৃত গানগুলির ফরাসি অনুবাদ ও তদ্ধৃত সাধনপদ্ধতির রহস্যোন্মোচন, তৎসহ 'তাঞ্জুর' তালিকায় প্রাপ্ত তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে চর্যার পাঠ সংশোধনের চেষ্টা, *Buddhist Mystique Songs*-এ (বাংলা এ্যাকাডেমি প্রকাশিত, ঢাকা) চর্যার বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ, ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচীর *Some Aspects of Buddhist Mysticism in the Caryāpadas* শীর্ষক প্রবন্ধে চর্যার রূপকার্থ বিশ্লেষণ, রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'হিন্দীকাব্যধারা'য় (এলাহাবাদ, ১৯৪৫) চর্যাগানের হিন্দী অনুবাদ, ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের *The Old Bengali Language and Text*-এ চর্যার ভাষা ও ব্যাকরণ বিশ্লেষণ, পার কোয়ার্ন সম্পাদিত *An Anthology of Buddhist Tantric Songs*-এ মুনিদত্তের টীকা ও তিব্বতী অনুবাদের তুলনামূলক আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, এ-দেশে এবং বিদেশে চর্যাগানের (এবং দোহাকোষের) অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, রূপক -প্রতীকের ব্যঞ্জনা, সংস্কৃত টীকা ও তিব্বতী অনুবাদ, সামাজিক পটভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে কী পরিমাণে কৌতূহল সৃষ্টি হইয়াছে । কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত সাড়ে ছেচল্লিশটি বাংলা চর্যাগান ব্যতীত এই জাতীয় পদের কোনো নমুনা আবিষ্কৃত হয় নাই বা আরো সাড়ে তিনটি গানেরও কোনো সন্ধান নাই । অবশ্য ড. সুকুমার সেন 'চর্যাগীতি পদাবলী'র পরিশিষ্টে দারুক, মীননাথ, কাহ্ন, শান্তি, শবর প্রভৃতি পদকর্তাদের দুই চারিটি পংক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। তাহা ছাড়িয়া দিলে, আর কোনো নূতন বাংলা চর্যাগানের সন্ধান পাওয়া যায় নাই । ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে চর্যার বাকি সাড়ে তিনটি পদের বাহ্যিক অর্থ উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু মূল বাংলা পদগুলির সন্ধান পাওয়া যায় নাই । চর্যার তিব্বতী অনুবাদের প্রথম সন্ধান পান ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তাহার পরে ড. বাগচী সমগ্র অনুবাদ সংগ্রহ করেন। এই প্রসঙ্গে তিব্বতী অনুবাদ সম্বন্ধে দু-একটি তথ্য নথিভুক্ত করা যাইতে পারে । নেপাল হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার আসল নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি', নেপাল দরবার গ্রন্থাগারের তালিকায় ইহা 'চর্যাচর্যটীকা' নামে স্থান পাইয়াছে। এই টীকা মুনিদত্তের কৃত। মূল সঙ্কলনের নাম 'চর্যাগীতিকোষ'। তিব্বতী অনুবাদে এইরূপ উল্লিখিত আছে। উক্ত তিব্বতী অনুবাদ ও তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, শুধু মুনিদত্তের টীকাই নহে, চর্যাগীতিকোষের আরো কয়েকখানি টীকা রচিত হইয়াছিল। যথা—আর্যদেবের 'চর্যামেলায়ন প্রদীপ', দীপঙ্কর পণ্ডিতের 'চর্যাগীতিবৃত্তি' শাক্যমিত্রের 'চর্যামেলায়ন প্রদীপ নাম টীকা' এবং শ্রদ্ধাকর বর্মণের 'চর্যামেলায়ন প্রদীপ'। 'চর্যাগীতিকোষে'র তিব্বতী অনুবাদক শীলচারী কীর্তিচন্দ্র (বা চন্দ্রকীর্তি) মুনিদত্তের 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'-ও তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।[১] এই সমস্ত অনুবাদ ও বৃত্তি ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর মধ্যেই সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শুধু সংবাদ ভিন্ন এ-সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত-আবিষ্কৃত 'নব চর্যাপদ' হইতে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, চর্যাগানের ঐতিহ্য বাংলাদেশে না মিলিলেও, নেপাল ও তৎসংশ্লিষ্ট অঞ্চলে এখনও কিছু কিছু নূতন গানের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য রহস্যময় সঙ্কেতে গূঢ়ার্থবাহী সাধনতত্ত্বের ব্যাখ্যা এদেশে পরবর্তীকালেও জনপ্রিয় হইয়াছিল। নাথগীতিকা, বৈষ্ণব কবিদের 'সহজ'রস, সহজিয়াদের আপাতবিরোধী রূপকাশ্রিত গান, সুফী ও বাউলদের ঐ জাতীয় গানে সেই ভাবধারা প্রচ্ছন্নভাবে অনুসৃত হইয়াছে। এমনকি কবীরের একটি দোহায় (ড. সুকুমার সেন উদ্ধৃত) এই কয় পংক্তির সহিত চর্যার ৩৩ সংখ্যক গানের (ঢেণ্ঢনপাদ-রচিত) আক্ষরিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাইবে :

বলদ বিয়াও এ গাভী ভই বাঞ্ঝা।

বাছুরি দুহাও এ তিন তিন সাঞ্ঝা।।
নিতি নিতি শৃগাল সিংহে সনে জুঝে।
কহে কবীর বিরল জনে বুঝে।।[২]

মনে হইতেছে কবীর এ চর্যার সংবাদ জানিতেন, তাহা না হইলে এতটা আক্ষরিক সাদৃশ্য থাকিত না।

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের নব চর্যাপদের ৯২টি পদই মৌলিক, পূর্বে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু প্রথম পদটি শাস্ত্রী সম্পাদিত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর ৭ সংখ্যক পদের প্রায় অনুবাদ। শশিভূষণের ১০ সংখ্যক পদটিও নূতন নহে, শাস্ত্রী মহাশয় পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সঙ্কলনে সংযোজিত ড. পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'নব চর্যাপদ ও ভাষা প্রসঙ্গ' হইতে জানা যাইতেছে যে, 'নব চর্যাপদে'র ২-সংখ্যক, ৩ সংখ্যক এবং ১৯-সংখ্যক পদগুলি 'হেবজ্রতন্ত্রে' উল্লিখিত হইয়াছে।

এই পদগুলিতে প্রধানতঃ এই দেবীদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে—যোগিনী, ডোম্বিনী, বজ্রবারাহী, শবরী, চণ্ডালী শ্রীবিদ্যাদেবী, শ্রীবজ্রদেবী, বাচ্ছলি (বাংছলি), বজ্রধাত্বেশ্বরী, বজ্রযোগিনী, বজ্রদেবী, শ্রীবাগীশ্বরী, নৈরাত্মাদেবী, জ্ঞানেশ্বরী, কালী, বজ্রসত্ত্বপরমেশ্বরী, বজ্রবৈরচণী, বজ্রবারুণী, শ্রীচিন্তাদেবী, নিরঞ্জনদেবী, শ্রীউগ্রতারণী, বুদ্ধডাকিনী, শ্রীবিদ্যাধরী, জ্ঞানেশ্বরী, চণ্ডিকা, মহাডাকিনী, শ্রীবসুধরা দেবী, জিনজননী, ধর্মধাত্বেশ্বরী, শ্রীবুদ্ধডাকিনী, ত্রিভুবনেশ্বরী, নৈরাত্মা, উগ্রতারুণী ইত্যাদি। শূন্যনিরঞ্জন, আদিবুদ্ধ, শ্রীসম্বররায়, শ্রীসম্বরনাটেশ্বর, শ্রীহেরুকনাথ, শ্রীবজ্রপাণি, শ্রীধর্মরায়, শ্রীদীপঙ্কর বুদ্ধ, শ্রীশাক্যমুনি, ত্রৈলোক্যনাথ, শ্রীবজ্রেশ্বর, শ্রীমহাকাল, শ্রীমঞ্জুকুমার, কালভৈরব প্রভৃতি দেবতাদেরও বন্দনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত দেবদেবীর প্রসঙ্গ হইতে দেখা যাইতেছে যত কাল অগ্রসর হইয়াছে ততই মহাযান এবং মহাযান হইতে উদ্ভূত বজ্রযানী দেবদেবীরা পুরাণোক্ত ও তন্ত্রধৃত চণ্ডিকা-কালিকার মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছেন। এই বিষয়ে পাঠকগণ এই সঙ্কলনে সংযুক্ত অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর 'নবাবিষ্কৃত চর্যাপদের তত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতি' এবং ড. পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'নব চর্যাপদ ও ভাষাপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধ হইতে অনেক জ্ঞাতব্য সংবাদ জানিতে পারেন।

নবচর্যাপদের তত্ত্বকথা যাহাই হউক না কেন, ইহার রচনাকর্মেও যৎকিঞ্চিৎ কাব্য-লক্ষণ অনুভব করা যাইবে। অবশ্য শাস্ত্রী মহাশয়ের 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে'র কয়েকটি গানে যেরূপ সৌন্দর্য ও রসের পরিচয় আছে নব চর্যাপদের ৯৮টি গানের মধ্যে তাহার অনুরূপ স্বাদ অল্পস্থলেই পাওয়া যাইবে। পদসমূহের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর (অর্থাৎ নির্বাণ) বর্ণনায় পদকারগণ ক্বচিৎ কদাচিৎ সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন। বজ্রবারাহী, বাচ্ছলি, যোগিনী বাগীশ্বরী, বজ্রযোগিনী, বজ্রদেবী, নৈরাত্মাদেবী—মোক্ষ-নির্বাণকে পদকর্তাগণ বিচিত্ররূপে ও বিচিত্র সাজসজ্জায় বর্ণনা করিয়াছেন। কখনো দেখিয়াছেন, তিনি নীলবর্ণ দেহা, দাড়িম্বকুসুমসঙ্কাশা রক্তবর্ণা, পিঙ্গলকেশা, কেয়ুর নূপুর মেখলায় শোভমানা। কখনো-বা ভয়ঙ্করী বীভৎসা—'করোটি খর্পর গ্রীবে রুদ্র নরশিরমালা''—পুরাণোক্ত দেবী কালিকার মতো। কখনো 'রক্তবর্তুল ত্রীণি নয়না ঘোর ভয়ঙ্কর ভীষণবদনা'। কোথাও তাঁহাকে হেরুক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছেন ('বাচ্ছলি কোলে লৈয়া কৃড়ন্তি হেরূব'), কখনো তিনি শ্রীসম্বরনাটেশ্বরের সঙ্গে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ ('নাচই শ্রীসম্বরনাটেশ্বর বজ্রবারাহি গাঢ়ে আলিঙ্গন'), কখনো তিনি সম্বরের বিরহে চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতেছেন ('হুম বিরহী[৩] তুজ্ঝ বিনু দেখবি অন্ধারা')। কোথাও শ্রীসম্বরবীরের সঙ্গে বজ্রযোগিনী সহস্র প্রকার শৃঙ্গারে লিপ্ত ('নাচে রে শ্রীসম্বরবীরা বজ্রযোগিনী রতি সহস্র শৃঙ্গারা')। তাঁহাদের যুগনদ্ধরূপের তাত্ত্বিক তাৎপর্য অধিকতর মূল্যবান হইলেও

তত্ত্বকথাকে পদকর্তারা আদিরসের সিঞ্চনে রূপময় করিয়া তুলিয়াছেন। বুদ্ধিগ্রাহ্য সাধনব্যাপারও তাঁহাদের লেখনী-স্পর্শে মানবীয় প্রেমের রক্তরাগে কাব্যত্ব লাভ করিয়াছে। যাঁহারা এই সমস্ত বজ্রগীতি রচনা করিয়াছিলেন, উক্ত তত্ত্বে তাঁহাদের বিশেষ অধিকার ছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহারা যৎসামান্য অলঙ্কারের ঝঙ্কার লাগাইয়া সাধ্যসাধন তত্ত্বের অতিরিক্ত রূপসৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়াছেন। জলে-প্রতিফলিত চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহারা বিশ্বপ্রপঞ্চের তুলনা দিয়াছেন — 'ধনজন জউবন উদবিন্দু চন্দা', যেমন জলের মধ্যে প্রতিফলিত চন্দ্র সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে—("জিম জলমঝেঁ চণ্ডড়া নউ সো সাচ্চ ণ মিচ্ছ")। এই ভাবপরিভাবনা স্বপ্নমায়ার মতোই মিথ্যা ("স্বপ্নমায়া সদৃশ ভাবপরিভাবনা") ভাব-অভাব, গ্রাহ্য-গ্রাহকহীন অদ্বয় অবস্থা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পদকর্তা ভাঙা সংস্কৃতের সাহায্য লইয়াছেন :

পরমরতৌ ন চ ভাব ন ভাবক
ন চ বিগ্রহ ন চ গ্রাহ্য ন গ্রাহক।।
মাংস ন শোণিত বিষ্ঠ ন মূত্রং
ন ছর্দ ন মোহ ন শৌচ পবিত্রং।।
রাগ ন দ্বেষ ন মোহ ন ঈর্ষা
ন চ পৈশুন্য ন চ মান ন দৃশ্যং।।
ভাবন ভাবক মিত্র ন শত্রু
নিস্তরঙ্গ সহজাখ্যবিচিত্রং।।

পিশুন ও মানী ব্যক্তি, শত্রু ও মিত্র নির্বিশেষে বোধিচিত্তের নির্ব্যূঢ়, নিস্তরঙ্গ, ইতি-নেতিহীন বাক্‌পথাতীত স্বরূপ স্বল্পকথায় চমৎকার ফুটিয়াছে।

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ কায়াসাধনা। দেহকে অবলম্বন করিয়া বৈদেহীলোকে যাত্রা, পিণ্ডদেহকে ধরিয়া সূক্ষ্ম চেতনায় উদ্বর্তন ইহা বহু প্রাচীন কালের সাধনসংস্কার। তন্ত্রমন্ত্র, নাথপন্থ, আউলবাউল প্রভৃতি লোকযানের সাধ্যসাধন পদ্ধতির মূল সূত্র এই কায়াসাধনা। পরমানন্দরূপ চতুর্থানন্দে পৌঁছাইতে হইলে মন্ত্রতন্ত্র, ধ্যানব্যাখ্যা, জপতপ প্রভৃতির প্রয়োজন না থাকিলেও ঐ সাধনায় দেহের গুরুত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। নাথ সম্প্রদায়ও পুনঃ পুনঃ কায়াসাধনার কথা বলিয়াছেন। নব চর্যাপদেও সেই কায়াসাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে 'কায়া অগ্নি বায়ু মেদনি কায়া সর্বতীরথ', 'কায়া চন্দ্র, কায়া সূর্য, কায়া নক্ষত্রমালা, কায়া গয়া কায়া মহাবোধি কায়া সর্বতীরথ'। যদিও পদকর্তা নির্দুখপা বলিয়াছেন, 'এ সংসার অসারা অসারা'—কিন্তু দেহকে শূন্যতায় নস্যাৎ করেন নাই, রাগদ্বেষমোহ ছাড়িয়া জগৎ-চেতনাকে মরীচিকাবৎ শূন্য বলিলেও দেহতন্ত্রের বন্ধন অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যখন শ্রীহেরুকনাথ ও শ্রীবজ্রযোগিনীর সামরস্যসম্ভূত যুগনদ্ধরূপ বর্ণনা করেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য সাধকের অন্বেষ্টব্য হইলেও পদকারগণ রহস্যময় সাধনাকে মিথুনলীলার রূপকেই আভাসিত করিয়াছেন। ফলে তত্ত্বকথাও যৎকিঞ্চিৎ আবেগে, সৌন্দর্যে ও কল্পনায় কায়া ও কান্তি স্বীকার করিয়াছে। অজ্ঞাতসারেই সাধকদের মস্তিষ্কে বাগ্‌দেবী ভর করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের বক্তব্যের কোনো কোনো স্থলে কিছু কাব্যসংস্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সর্বশেষে কর্ণপার একটি পদ উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি :

চণ্ডোগ্র শ্মশানে শিরীষ বৃক্ষ
বাসুকি নাগা তর্জিত মেঘা।

গহুর শ্মশানে অশোকবৃক্ষা
ঘূর্ণিত মেঘা তক্ষক নাগা।।

* * *

ঘোর শ্মশানে পর্কটি বৃক্ষা
অনন্ত নাগা পূরণ মেঘা।
কিলিকিলি রাবা অর্জুনবৃক্ষা
কুলিক নাগা বর্ষণ মেঘা। (পদ—৪৯)

এখানে পদকর্তা কালরাত্রির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে মেঘতর্জিত মহাশ্মশানভূমি শিরীষ-অশোক-চূতক-করঞ্জ-পর্কটি অর্জুনবৃক্ষের ঘনান্ধকারে শঙ্খপাল নাগদের অট্ট অট্ট হাসিতে এবং অনন্তনাগের কিলিকিলি রবে চারিদিকে হিমশীতল শঙ্কা ঘনাইয়া আসে। কর্ণপার এই পদে ছন্দ ও ভাষায় এমন কোনো পারিপাট্য নাই, কিন্তু তিনি দুই-চারিটি শব্দব্যঞ্জনার সাহায্যে যে ভয়ঙ্কর শ্মশানভূমির নৈশান্ধকার, মেঘ গর্জন এবং তাহার সহিত বিচিত্র জীবসমূহের উল্লাস-চীৎকার-গর্জনের শব্দচিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হইবে।

শশিভূষণ-আবিষ্কৃত এই 'নব চর্যাপদ' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম কারণ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে দুই শত বৎসরকে বন্ধ্যাযুগ বলে, অর্থাৎ ১৩শ ১৪শ শতাব্দীতে নিশ্চিতভাবে রচিত বলিয়া কোনো বাংলা রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই, এই সঙ্কলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের পদ এই যুগেরই রচনা। পদগুলিকে ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে যদি এই দুই শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অন্ততঃ এইটুকু মানিয়া লওয়া যাইবে যে, উক্ত বন্ধ্যাযুগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ্যা নাও হইতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, শাস্ত্রী-সম্পাদিত চর্যাসংগ্রহে উল্লিখিত শুণ্ডিনী, যোগিনী, হরিণী, করিণী, ডোম্বি, মাতঙ্গী, অবধূতী, শবরী, চণ্ডালী, নৈরামণি প্রভৃতি নারীরূপের সঙ্গে নব চর্যাপদের যোগিনী, বজ্রবারাহী, বজ্রযোগিনী, বাচ্ছলি, ধর্মধাত্বেশ্বরী, উগ্রতারুণী, জ্ঞানেশ্বরীর সম্পর্ক বিচার সম্ভব হইলে বজ্রযান, সহজযান এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের শাক্তদেবীদের পারস্পরিক যোগসূত্র আবিষ্কারের ইঙ্গিতও মিলিয়া যাইতে পারে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে রহস্যময় সাধনার প্রভাব এবং নারীভাবনায় তাহার উদ্বর্তন সমাজতত্ত্বের দিক হইতেও অনুসন্ধানের বিষয়। বাঙালীর মধ্যযুগীয় সংস্কার দুটি নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া শিল্পসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে— একটি রাধা, অপরটি উমাপার্বতী-দুর্গা-চণ্ডিকা-কালিকা। একটি আদিরসাশ্রিত নারীচেতনা, যাহা সমাজ সংসার প্রভৃতি সীমায়িত সংস্কারের বাহিরে অবস্থান করে, বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে পারি কেন্দ্রাতিগ শক্তি। অপরটি স্নেহবাৎসল্যধারায় সিঞ্চিত জননী সত্তা অর্থাৎ কেন্দ্রানুগ শক্তি। প্রিয়া ও জননী— নারীত্বের দুই রূপই যথাক্রমে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা ও শাক্ত পদাবলীর দুর্গা কালিকার রূপকে ঘর ও বাহিরের টানে গড়িয়া-ওঠা বৈষ্ণব ও শাক্ত গানকে শিল্পরূপ দিয়াছে। শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত চর্যাগানে মাতৃভাবনা নাই, কিন্তু শশিভূষণ-আবিষ্কৃত 'নব চর্যাপদে'র শেষভাগে দুই-এক স্থলে মাতৃকা-মূর্তির ছায়াপাত হইয়াছে। সুরতবজ্রের 'অচিঅ চিঅ চিত্তহি সেজহ না থি জননী ভাব-অভাবে' (১৭ সংখ্যক) পংক্তি, অমোঘবজ্রের 'চরণ শরণ শ্রীউগ্রতারুণী মাতা' (৭১ সংখ্যক), অজ্ঞাতনামা পদকর্তার 'শ্রীবিদ্যাধরী দেবী সুরনরসহিতা। সকল ঋদ্ধি সিদ্ধি দেহি মে মাতা' (৭২ সংখ্যক) প্রার্থনা, আর একটি গানে ধূম্রবর্ণাঙ্গী শ্রীচণ্ডিকাদেবীর বর্ণনা করা হইয়াছে, শ্রীবজ্রবারাহীদেবীকে 'ঋদ্ধি সিদ্ধিদায়িনী জগতজননী' (৭৯ সংখ্যক) বলিয়া প্রণাম নিবেদন করা হইয়াছে, কোনো কোনো পদে জিনজননী

শ্রীবসুধরাদেবীকে মাতৃভাবে দেখা হইয়াছে (৯০ সংখ্যক)। অবশ্য পরবর্তীকালের (১৪শ শতাব্দীর পরে) পদেই এই মাতৃভাবের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হইয়াছে। পূর্ববর্তী পদে কোথাও বিশুদ্ধ তত্ত্ববাদ প্রতীকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান অর্থ অপেক্ষা পারমার্থিক ব্যঞ্জনাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে। অধিকাংশ পদেই কিন্তু আদিরসের ইঙ্গিতের সাহায্যে 'প্রজ্ঞা' ও 'উপায়ে'র প্রতীকে নর-নারীর মিথুনাসক্তিই প্রাধান্য পাইযাছে। সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউল সম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্ত্ববাদ সূক্ষ্ম হইলেও অনেক সময়ে পদগুলির প্রতীকের খোলস ছাড়াইলেই স্থূল অনঙ্গরঙ্গের উদ্দামতা ধরা পড়িবে। এই সমস্ত কারণে সমাজমানসিকতা, সাধ্য-সাধনা ও নৃতত্ত্বের সঙ্গে বাঙালীর কায়াসাধনার যে নিগূঢ় যোগাযোগ আছে তাহার উপাদান হিসাবে 'নব চর্যাপদ' নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলিতে পারি, শশিভূষণের আকস্মিক আবিষ্কার শুধু বজ্রযানী তত্ত্বকথা নহে, বাঙালীর সাধনা, সংস্কার ও চিত্তপ্রবণতাকেও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রাখিয়া নবভাবে ব্যাখ্যা করিবে। গানগুলি নেপাল ও সন্নিহিত অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইলেও তত্ত্বদর্শনের দিক হইতে ইহারা বাংলা সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রাক্-মহাযান, মহাযান ও উত্তর-মহাযানের নানা শাখা-প্রশাখা, ধর্মসাধনা ও দার্শনিক বৈশিষ্ট্য লইয়া এদেশে ও বিদেশে অনেকদিন ধরিয়া আলোচনা গবেষণা হইতেছে। নগেন্দ্রনাথ বসুর *Modern Buddhism and its Followers in Orissa,* বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের 'সাধনমালা', বেণীমাধব বড়ুয়ার *A History of pre-Buddhistic Philosophy,* প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত *Doha Kosa,* শরৎচন্দ্র দাসের *Pag Sam Jon Zang,* বেণ্ডেলের *Bibliotheca Buddhica,* বারনেটের *Wisdom of the Easl,* ওয়াডেলের *Lamaism,* কোর্ডিয়ার-অনূদিত *Bstan-hgyur,* সুজুকির *Awakening of Faith in Mahajana* (মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদের অনুবাদ), লেভির নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক বৃত্তির অনুবাদ, বিবলিওথেকা বুদ্ধিকায় প্রকাশিত 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক', টেংক্নারের সম্পাদিত 'মিলিন্দপঞ্হো', এলিশ গেট্টির *The Gods of Northern Buddhism,* রমণশাস্ত্রীর *The Doctrinal Culture and Tradition of the Siddhas* (*'Cultural Heritage of Inida, Vol. II*), ভালী পঁস্যর (*Vallee Ponssir*) *'Encyclopaedia of Religion and Ethics'*-এ লিখিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ, গ্রুণ্ডওয়েডেলের *Edelsbi mine,* নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদিত 'ডাকার্ণব' প্রভৃতি আলোচনা, অনুবাদ, ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে যেমন মহাযান ও তাহা হইতে উপজাত অন্যান্য যান-উপযানের বিচিত্র বিবর্তন লক্ষ্য করা যাইবে, সেইরূপ ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত-আবিষ্কৃত 'নব চর্যাপদ'ও এই মত ও পথের আলোচনায় নূতন সূত্রের ইঙ্গিত দিতে পারিবে।

১ কোর্ডিয়ার (P. Cordire) *Bstan-hgyur* তালিকাটি (৩ খণ্ডে সমাপ্ত, প্যারিস হইতে ১৯০৯-১৯১৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত) ফরাসি ভাষায় প্রকাশ করেন। নাম— *Catalogue De Fonds Tibetain de la Bibliotheque Nationale*। এই তালিকা হইতে এই সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়াছে। দ্রষ্টব্য ড. সুকুমার 'চর্যাগীতিপদাবলী' (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা ২৫, এবং ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের *The Old Bengali Language and Text, pp.5-6*

২. দ্রষ্টব্য : ড. সুকুমার সেনের 'চর্যাগীতিপদাবলী' (২য় সং), পৃঃ ১৮১

৩. পাঠান্তর - বিরহিণী

বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেব

১

দেশ-কাল-পাত্রের সমবায়ী সত্তার নাম ইতিহাস। তিনটি কালপ্রবাহকে কেন্দ্র করে ইতিহাসের বিবর্তন হয়— 'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ' । অতীতের ধূসর স্মৃতি, বর্তমানের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যতের অনুমানসিদ্ধ ইঙ্গিত মানবসভ্যতার দিক নির্দেশ করে থাকে । কিন্তু ইতিহাস সর্বোপরি মানুষের কথা, যে-মানুষ কালের অধীশ্বর । মধ্যযুগের শ্রীচৈতন্যদেব তেমনি একটি বিচিত্র চরিত্রের কালাধিপতি । বাংলার মধ্যযুগের জীবনচেতনা তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে । বাঙালির সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মসাধনা— এককথায় সর্ববিধ সৃজনপ্রক্রিয়া ও হৃদয়ানুরাগ শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে যে সুদূরপ্রসারী আবর্ত রচনা করেছিল, তা পল্বলে-নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রপাতের মতো কেন্দ্র থেকে ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করে ক্রমে ক্রমে তটভূমির দিকে অগ্রসর হয়েছে । 'নেমিবৃত্তি' ইতিহাসের চরিত্র নয়, অর্থাৎ ইতিহাস একইভাবে, একই চক্রপথে আবর্তিত হয় না, সদাসর্বদা ঋজু পথেও চলে না । রসশাস্ত্রে প্রেম সম্বন্ধে বলা হয়েছে— "অহেরিব গতি প্রেম্নঃ", প্রেমের গতি সাপের মতো আঁকাবাঁকা । ইতিহাসও ভুজঙ্গগতি । মানুষও তাই— একই পন্থা ধরে সকলে চলে না । শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' কথাটি মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও প্রভাব একটি 'ঋতপথ' । ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত, এমন কি বিজ্ঞানালোকিত বর্তমানকালেও তাঁর জীবন, চরিত্র ও সাধনা বাংলাদেশ ও বাংলার বাইরেও এমন একটি সুস্থির ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য সৃষ্টি করেছে যে, তাঁকে যুগন্ধর পুরুষ বলে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে হবে ।

অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজারা গৌড়বঙ্গ শাসন করেছিলেন । তাঁদের আগে শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত অল্পকালের জন্য গৌড়ে শাসনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন, প্রবল বৌদ্ধপ্রভাবের যুগেও শৈবধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন । সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম গৌড়বঙ্গের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন । তারপর বৌদ্ধ মতাবলম্বী পালসাম্রাজ্য এবং তারও পরে কর্ণাটদেশীয় 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়' সেনবংশের অভ্যুদয় । সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ্য মতাশ্রয়ী ছিলেন । পালশক্তির অবসানে বাংলার বৌদ্ধসংস্কার অতি দ্রুতবেগে অপসৃত হয়ে গেল এবং সেখানে স্থান গ্রহণ করল ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত দর্শন-মনন, পৌরাণিক দেবতত্ত্ব, ধর্মীয় আচার-আচরণ, লোকবিশ্বাস এবং নানধরনের ব্রতকৃত্য, যার কিছুটা স্মৃতি-সংহিতা-শাসিত, কিছুটা বা বাঙালির নিষাদ সংস্কৃতি (যাকে নৃতত্ত্বে প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড বলে)-জাত অন্-আর্য সংস্কার, যার স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যাবে মঙ্গলকাব্যে, শিবায়ন, নাথসাহিত্য, বাউল ও সহজিয়াদের সাধ্যসাধনা এবং কর্তাভজা প্রভৃতি বিবিধ লোকবিশ্বাসের মধ্যে । যাকে আমরা বাঙালির মিশ্রসংস্কৃতি বলি তার বনিয়াদ প্রধানত সেনবংশের স্বল্পকালস্থায়ী শাসনে স্থাপিত হয় । পরে ইস্লামের অভিযান সত্ত্বেও বাঙালির এই সংস্কৃতি নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটি পূর্ণবলয়িত ঐক্যের মধ্যে আশ্রয় লাভ করেছে । শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই বৈষ্ণব আখ্যানকাব্য ও পদাবলী, সংস্কৃত মহাকাব্য পুরাণের অনুবাদ এবং দু-একটি মঙ্গলকাব্যের প্রাথমিক ভূমি প্রস্তুত হয়েছিল। লক্ষ্মণসেনের পূর্ব থেকে লিপিলেখন ও প্রকীর্ণ শ্লোকে কৃষ্ণলীলার স্পষ্ট ইংগিত আছে । জয়দেব এই যুগের সাংস্কৃতিক মানদণ্ড ধারণ করে

আছেন। তাঁর গীতগোবিন্দ আদিরসকে আশ্রয় করে রাধাকৃষ্ণলীলার যে উদ্দাম চিত্র এঁকেছে, ক্রমে ক্রমে সেই কামকবোষ্ণ ফেনোচ্ছাস সূক্ষ্ম আকারে পরবর্তীকালের বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রবেশ করে । বাঙালি যে-রসের সাধনায় আত্মহারা, আউলবাউল সহজিয়ারা যার আবেশে পরিচিত জীবনের কূল ছেড়ে রহস্যময় ও গূঢ়গুহ্য কৃত্যের অকূলে ভেসেছেন, তার সূচনা হয়েছিল পূর্বচৈতন্য যুগে । কেউ কেউ অনুমান করেন যে, দক্ষিণ ভারত থেকে আনীত ভাগবতপুরাণ ও আদিরসাত্মক ভক্তিসাধনা পূর্ব ভারত প্লাবিত করেছিল । দশম শতাব্দীর পূর্ব থেকেই তার সূচনা, সেনযুগে তার প্রথম বিকাশ, চৈতন্যের পূর্বে তার স্বাতান্ত্র্য এবং চৈতন্যযুগে তার পূর্ণতা ঘটেছে । তাই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব শুধু ধর্মীয় ব্যাপার নয়— তাঁর মধ্য দিয়ে বাঙালির ইতিহাস, সমাজ ও সাহিত্য যথার্থত 'গৌড়ীয়' হয়ে উঠেছে । অবশ্য গৌড় বলতে তখন গৌড় ও বঙ্গ, পশ্চিম ও পূর্ব— উভয় বঙ্গকেই বোঝানো হত ।

খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনা থেকে (অনুঃ ১২০২ খ্রীঃ অঃ) গৌড়ে এবং পরে বঙ্গে (পূর্ববঙ্গ) ও উত্তরবঙ্গে পাঠান অধিকারের (ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কী ও আফগান দল-উপদল) সূচনা এবং শতাব্দীকালের মধ্যে তার সুপ্রতিষ্ঠা হয় । কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে বাংলায় পাঠানশক্তির অবসান হয় । তার স্থান দখল করে উত্তরাপথের মুঘল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি । নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই মুঘল শাসন বাংলা ও তার প্রান্তীয় অঞ্চলে অগ্রসর হয় । ইংরেজ শাসন ও শোষণের মতোই ছিল মুঘল শাসনের ধারা । পাঠানগণ যেখান থেকেই আসুন, তাঁরা কালক্রমে বাংলাদেশকে নিজেদের দেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী মুঘল শক্তি বাংলাদেশকে স্বর্ণমৃগ শিকারের বনভূমি বলে মনে করতেন । পাঠান সুলতানেরা বাঙালি হিন্দু কবিদের কাব্যরচনাদি শুনতেন। কখনো খুশি হয়ে তাঁদের খেতাব-খেলাত দিতেন । কিন্তু মুঘল সুবাদারগণ বাঙালি হিন্দুদের কোনো প্রকার সাংস্কৃতিক আনুকূল্য করেননি । পাঠান সুলতানগণ বাঙালির হিন্দুর সঙ্গে বাস করে বাংলা ভাষা শিখেছিলেন, বাঙালি হিন্দু কবির কাব্য-কবিতা তারিফ করার মতো ভাষাজ্ঞানও তাঁদের ছিল । কিন্তু মুঘল সুবাদার ও তাঁদের উত্তর ভারতীয় কর্মচারীরা বাংলা ভাষা জানতেন না, তাঁরা নিজেদের মধ্যে ফার্সী এবং দরবারে হিন্দি-ফার্সি মিশ্রিত সঙ্কর ভাষা (উর্দুর পূর্বরূপ) ব্যবহার করতেন। বাঙালি কবিকে কাব্য রচনার জন্য তাঁরা উৎসাহিত করেননি। রাজমহল, জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা), মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে মুঘল আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তার সঙ্গে বাঙালি হিন্দু মুসলমানের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। তাই মুঘল শাসনের শোষণক্রিয়া ও ইংরেজ আমলের লুঠপাট অনেকটা এক ধরনের। উভয়ই সাম্রাজ্যবাদী অপশাসনের ফলশ্রুতি। অবশ্য একটা কারণে বাংলার মুঘল ইতিহাস স্মরণীয় হয়ে আছে। এই শাসনে বাংলার শাসনব্যবস্থা, রাজস্বের হার, জমি-জমার বিলিব্যবস্থা, আইন ও আদালত প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যে নিয়মানুগত্য ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। পাঠানশাসন প্রধানত ছিল বিকেন্দ্রীকৃত (decentralised), মুঘল শাসন ছিল কেন্দ্রানুগ। অবশ্য মুঘল আমলে বাঙালি উত্তর ভারতের সঙ্গে পরিচিত হয়। যাতায়াতের সুগমতার জন্য পুরী-বৃন্দাবন-বারাণসী-পুষ্কর-কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থে বাঙালি হিন্দুর পরিক্রমা আরম্ভ হয়। দিল্লী থেকে আসাম পর্যন্ত এক ধরনের শাসনব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতিনীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে ক্রমে বাঙালির 'দ্বৈপায়ন' চরিত্র বাংলার বাইরেও প্রসারিত হল। বাঙালি-মানসের ভৌগোলিক সীমা কিছু সম্প্রসারিত হয়েছিল তা স্বীকার করতে হবে।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও তিরোধান —দুই-ই পাঠান যুগে হয়েছিল। তাঁর দেহাবসানের

অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাংলায় মুঘলশাসন ক্রমে ক্রমে পাঠান সর্দার ও হিন্দু সামন্তদের ক্ষমতা চূর্ণ করে বাংলাকে দিল্লী-আগ্রার অধীনে আনে। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় চৈতন্যাবির্ভাবের তাৎপর্য বোঝা যাবে।

২

বাংলার সমাজে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব প্রবল পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে আনে। গৌড়বঙ্গে তখন মুসলমান রাজশক্তির প্রচণ্ড প্রভাব। হিন্দুসমাজ ধর্ম ও প্রাণ হারাবার ভয়ে সন্ত্রস্ত। ইস্‌লামের ধর্মান্তরীকরণের চণ্ডনীতি সমগ্র মুসলমান যুগেই অল্পাধিক অব্যাহত ছিল। প্রাণভয়ে বা স্বার্থের তাড়নায় উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও ইসলামি আচার-আচরণ বাধ্য হয়ে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে সমাজে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়েছিল। অবশ্য স্মৃতির বাঁধনে হিন্দুসমাজকে সংহত করার চেষ্টা হলেও উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে অপ্রীতি ও অবিশ্বাসের ফলে এবং ইস্‌লাম ধর্মের উদার ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে ধর্মান্তরীকরণের পথ সুগম হয়েছিল— শুধু তরবারি ঘুরিয়ে বাংলার একটা বড়ো সংখ্যক হিন্দুকে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করা কখনো সম্ভব হত না। উচ্চ-সমাজে ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিমীমাংসার কিছু চর্চা হত, কিন্তু বেদান্তাদি মোক্ষশাস্ত্রের অনুশীলন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। নব্যন্যায়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং বিবিধ ন্যায়গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী ও 'পত্রী'-র আলোচনায় অনুস্বার বিসর্গের স্তূপ বেড়ে উঠছিল। অভ্যাসবসে হিন্দুরা স্নানের সময় পুণ্ডরীকাক্ষের নাম উচ্চারণ করত, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসে কোনো নিষ্ঠা ছিল না। রাজভয়ে অনেকে প্রকাশ্যে নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠান করতে সাহসী হত না। অপরদিকে পীর ফকিরদের অলৌকিক প্রভাবের নানা কাহিনী ব্রাহ্মণেতর হিন্দু সমাজে প্রচারিত হয়েছিল। লৌকিক দেবদেবীদের পূজাতেও সাধারণ লোকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করত। নবদ্বীপে তখন বৃথা-পাণ্ডিত্যের অনুশীলন চলছিল। বিদ্যাচর্চা বলতে নব্যন্যায়ের এবং ধর্মচর্চায় তান্ত্রিকতার অবাধ অনুশীলন চলত। অপরদিকে নিম্নসমাজে বৌদ্ধ সহজিয়াদের কিছু প্রচ্ছন্ন প্রভাব ছিল। এককথায়, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙালি হিন্দুসমাজের স্বাভাবিক গতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছিল। অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল, ঘন ঘন যুদ্ধবিগ্রহের ফলে কৃষিব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছিল, পাঠান সর্দার ও দলপতিদের নিত্য বিবাদের ফলে দেশে একটানা শান্তি ছিল না। এর ফলে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভূস্বামীরা (বারো ভুঁইয়া) আঞ্চলিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। যাঁদের সামন্তশ্রেণী বলা হয়, তাঁরা পালযুগ থেকে শুরু করে পাঠানযুগ পর্যন্ত শাসন ও সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁদের অঙ্গুলিসঙ্কেতে রাজা ও সুলতানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হত। অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের দ্বারা দেশ অধিকৃত ও শাসিত হলেও, বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থার জন্য দেশের কোনো এক অংশে অব্যবস্থা দেখা দিলেও তা সমগ্র দেশকে আঘাত করতে পারত না, নানা অসুবিধা সত্ত্বেও এটি পাঠান-শাসনের সুফল বলে পরিগণিত হতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে আগ্রাসী মুঘল সাম্রাজ্যবাদ বাংলার এই বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ও সমাজব্যবস্থা চূর্ণ করল, এবং তার স্থানে সূক্ষ্ম ও স্থূল শোষণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল, যার পরিচালনাসূত্র ছিল দিল্লী-আগ্রার আমদরবার, খাসদরবার ও হারেমের হাতে। বাংলাদেশের শাসনগত বৈশিষ্ট্য মুঘল শাসনেই নষ্ট হয়ে যায় এবং তার ধ্বংসস্তূপের উপর আর এক প্রচণ্ডতর বহিরাগত শক্তির প্রেতনৃত্য আরম্ভ হয়, সে আর একযুগের কথা, আর এক পতন-অভ্যুদয়ের ইতিহাস।

৩

পাঠান ও মুঘল যুগের পটভূমিকায় শ্রীচৈতন্যের সামাজিক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য

গোচর হবে। ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বী ও জাতপাতে-শতধা-বিদীর্ণ হিন্দুসমাজে যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছিল তাকে জীমূতবাহন-রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি, শূলপাণি, রঘুনাথ তর্কবাগীশ, কাশীনাথ বিদ্যানিবাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ স্মৃতিসংহিতা ও ন্যায়শাস্ত্রের বাঁধ দিয়ে এই ভাঙন রোধ করতে পারতেন না। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে হিন্দু-সমাজের অন্তেবাসীরাও মনুষ্যত্বের মহিমা অনুধাবন করতে পারল। সে মহিমা প্রধানত ভক্তিনির্ভর, অধ্যাত্মমুখী ও আবেগাপ্লুত। সমাজের অনৈক্য হেতু যখন ছোটবড়োয় স্থানপরিবর্তন ঘটে তখন প্রলয় উপস্থিত হয়। য়ুরোপের ইতিহাসে এমন প্রলয়কাণ্ড অনেকবার ঘটেছিল। মধ্যযুগের বাংলাদেশে সেই ধরনের আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকলেও চৈতন্যপ্রভাব তাকে নিঃশ্রেয়স্ ভক্তির দ্বারা সংযত করেছে, একনিষ্ঠ পরানুরক্তির ('সা পরানুরক্তি ঈশ্বরে') দ্বারা সমাজের উচ্চাবচ পথ প্লাবিত করে দিয়েছে। সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তির বদলে ভক্তির স্রোত সর্ববিধ অনৈক্য ও বৈষম্যকে একটি স্থির বিন্দুতে আনতে সমর্থ হয়েছিল। মার্টিন লুথার, ফরাসি বিপ্লব, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় হিতবাদী সমাজদার্শনিকদের মতো শ্রীচৈতন্যের প্রভাব মানুষের বহির্জীবনে ঝড় তোলেনি, বরং তার অন্তর্লোকে সৃষ্টি করেছিল প্রচণ্ড উল্লাস, প্রবল উন্মাদনা— ফলে ছোটবড়োর ভেদরেখা এক-মুহূর্তে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বাঙালিসমাজের এই পরিবর্তন একালের সমাজদার্শনিকের কাছে যাই মনে হোক না কেন, প্রেমভক্তি ও আবেগ যে কতটা অসাধ্য সাধন করতে পারে, ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাস থেকেই বোঝা যাবে। চৈতন্যপ্রভাবে ইস্‌লামের ধর্মান্তরীকরণ কিছু বাধা পেয়েছিল, অনেক মুসলমানও তাঁর মহিমা উপলব্ধি করেছিলেন। কেউ কেউ তাঁরই প্রভাবে রাধাকৃষ্ণের গান বেঁধেছিলেন, কেউ গৌরচন্দ্রিকা রচনা করেছিলেন, কেউ তাঁর কাছে অনিকেত জীবনের আশ্রয় খুঁজেছিলেন। খোলাবেচা শ্রীধর ও পুরীর রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁর কাছে একই প্রকার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। কারণ ভক্তির দৃষ্টিতে সব বৈষম্য দূর হয়ে যায়। পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা সমগ্র গৌড়বঙ্গ ও প্রান্তীয় অঞ্চলকে গ্রাস করে নিয়েছিল। হিন্দুসমাজের বদ্ধ জলাশয়ে প্রবল তরঙ্গের আঘাতে যে নবজীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল, চৈতন্যদেব তার প্রাণপুরুষ ছিলেন। আধুনিক ইতিহাসের মতো রাষ্ট্রবিপ্লব, সামাজিক বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক বিরোধ চৈতন্যযুগে সংঘটিত হয়নি, কারণ দেশ-কাল-পাত্র তার অনুকূল ছিল না। বাঙালির মানসিকতাও সে সম্বন্ধে সচেতন হয়নি। ইস্‌লামীয় ধর্মান্তরীকরণের ফলে বাঙালি হিন্দু সন্ত্রস্ত হলেও তারা যে একতাবদ্ধ হয়ে আগন্তুক শাসকদের চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ভক্তিধর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের উপদ্রুত মানুষকে ইহব্যতিরিক্ত ঈশ্বরচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা ছাড়া কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন ও সামাজিক সংঘাত-সংঘর্ষের দ্বারা হিন্দুদের মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে উত্তপ্ত করাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু চৈতন্য ও উত্তরচৈতন্য যুগে একটা নতুন ধরনের অধ্যাত্ম উজ্জীবন লক্ষ্য করা যাবে। সেটি শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বাংলার সমাজবিকাশের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। সে বিকাশের অর্থ সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তি। ক্রমে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের ব্যবধান অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে এল। ভক্তিবাদ এই ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করে ঈশ্বরভক্তির অনুশীলনই ভক্তের প্রধান লক্ষ্য, এই ছিল শ্রীচৈতন্যের বাণী। এই জন্য অর্থনৈতিক ভেদ-বিভেদ এই যুগে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মানুষের ঐহিকজীবনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। শ্রীচৈতন্য নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী ছিলেন, পার্থিব ভোগসুখকে কৃমিকীট বলে মনে করতেন। কোনো ভক্ত-শিষ্য সুকঠোর

যতিবৃত্তি থেকে বিন্দুমাত্র স্খলিত হলে তিনি তাকে কখনো ক্ষমা করতেন না। তাঁর বিশ্রামের জন্য ভক্ত জগদানন্দ একটা তুলার বালিশের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেইজন্য শ্রীচৈতন্য প্রিয়ভক্তের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলেন। এক ভক্তপ্রদত্ত সুগন্ধ তেলের পাত্র দেখে তিনি এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে জগদানন্দ সর্বসমক্ষে সতৈল হাঁড়িটি ভেঙে ফেলেন, তবে মহাপ্রভুর রোষ শান্ত হয়। গোবিন্দ ঘোষ নামে তাঁর আর এক ভক্ত আহারান্তে মুখশুদ্ধির জন্য শ্রীচৈতন্যকে আধখানি হরিতকী দিয়েছিলেন, বাকি অর্ধেকটি পরের দিনের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। সঞ্চয়বৃত্তি বৈরাগীর ধর্ম নয়। এই বলে তাকে তিনি বৈরাগীর জীবন পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। সনাতনের গাত্রে তিনটাকা মূল্যের ভোটকম্বল দেখে তার প্রতি মহাপ্রভু ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। সনাতন তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে সেখানি তদ্দণ্ডে ধুলায় নিক্ষেপ করলেন। নিষ্কিঞ্চনতা বৈরাগীর একমাত্র ধর্ম, শ্রীচৈতন্য বোধ হয় সনাতন গোস্বামীকে ইঙ্গিতে সেই শিক্ষা দিলেন। ছোট হরিদাস শ্রীচৈতন্যের ওড়িয়া ভক্ত শিখী মাহিতির ভগিনী প্রবীণা মাধবীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেছিলেন, তাই তিনি ছোট হরিদাসকেও পরিত্যাগ করেন। কারণ হরিদাস সন্ন্যাসী হয়ে প্রকৃতি সম্ভাষণ করেছিলেন, হোক মাধবীদেবী বয়োজ্যেষ্ঠা প্রবীণা ও সর্বজনমান্যা। এই কঠোর বৈরাগ্য ও বিষয়ে অনাসক্তি তাঁর প্রধান উপদেশ। নিষ্কিঞ্চন যতিবৃত্তি ছাড়া ভক্তিমার্গে অগ্রসর হওয়া যায় না। পুরীধামে অবস্থানের সময়ে তিনি রাজা প্রতাপরুদ্র, রাজগুরু, সভাসদ ও ওড়িয়া অভিজাত সমাজের সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য, বিলাস, সুখৈষণা তাঁকে এবং তাঁর অনুচর-পরিকরদের স্পর্শ করতে পারেনি। অবধূত নিত্যানন্দ বোধ হয় এ-সব কঠোর নিয়ম ততটা মানতেন না, খাদ্য গ্রহণে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে ভেদ করতেন না। সন্ন্যাস গ্রহণ করেও পুনরায় সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করেন এবং দু'বার বিবাহ করেন, ফলে তাঁকে 'বান্তাসী'-দোষগ্রস্ত হতে হয়েছিল। যে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসজীবন ত্যাগ করে পুনরায় সংসারজীবনে প্রবেশ করেন তাঁকে সন্ন্যাসীসম্প্রদায় 'বান্তাসী' দোষগ্রস্ত বলে নিন্দা করে থাকেন। নিত্যানন্দ অদ্ভুত প্রকৃতির ছিলেন। কঠোর নিয়ম মানতেন না, এবং বিষয়ী লোকের মতো স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করে কখনো কখনো হস্তীপৃষ্ঠে শিষ্যভবনে যাতায়াত করতেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য সেজন্য কিছু মনে করতেন না। মনে হয় তাঁর ধারণা ছিল, যথার্থ ভক্তের চরিত্রে কোনো কিছুর দাগ লাগে না, যেমন পদ্মপাতায় কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে না।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরে বাংলার বৈষ্ণবসমাজ, কিছুকাল মূর্ছাগ্রস্ত অবস্থায় থাকলেও শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ ও নরোত্তমের আবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণবসমাজে আবার প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিল। তিনজনেই বৈরাগ্য অবলম্বন করে বৃন্দাবনের আচার্যদের দ্বারা দীক্ষিত হয়েছিলেন, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বৈষ্ণব দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। গৌড়ে হতবল বৈষ্ণবসমাজকে পুনরায় সবল করার জন্য তাঁরা বৃন্দাবন থেকে বহু পুঁথিপত্র সহ গৌড়দেশে প্রেরিত হন। পথে বিষ্ণুপুরের কাছে ডাকাতেরা গ্রন্থবোঝাই পেটিকা ধনরত্নে পূর্ণ মনে করে অপহরণ করে। বিষ্ণুপুররাজ বীরহাম্বীর জমিদারিও করতেন, ডাকাতিও করতেন, তাঁর ডাকাতের দলও ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারের পর তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের গভীর সংস্পর্শে এসে পাপকর্ম ত্যাগ করে নিষ্কাম বৈষ্ণব হন এবং শ্রীনিবাসের শিষ্য হন। শুধু তিনি নন, তাঁর পরিবার, পাত্রমিত্র, এমন কি প্রজারাও বৈষ্ণব মতাদর্শ গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে শ্রীনিবাসের প্রভাবে এই অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণব ভাবাদর্শ অবলম্বন করে, এখনও সেখানে সে-আদর্শের স্মৃতিচিহ্ন আছে। শ্রীনিবাসের গ্রন্থপেটিকায় বৈষ্ণব স্মৃতি-সংহিতা, দর্শন-মনন ও রসশাস্ত্রের সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পুঁথিও ছিল। পরবর্তীকালে যে

সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ বাংলাদেশে প্রচলিত হয় সেগুলি শ্রীনিবাসই বৃন্দাবন থেকে এনেছিলেন। অতঃপর তিনি বিষ্ণুপুরে রাজগুরু রূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হন। নরোত্তম জমিদার পুত্র হয়েও সর্বত্যাগী বৈরাগীর জীবন যাপন করতেন। উড়িষ্যার শ্যামানন্দ ঐ অঞ্চলে সাধারণ সমাজে মহাপ্রভুর ধর্ম প্রচার করেন, ফলে উড়িষ্যার এক বিস্তীর্ণ কৃষিপ্রধান অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের অত্যন্ত প্রসার হয়েছিল। নরোত্তম কায়স্থবংশোদ্ভূত হলেও ব্রাহ্মণগণ তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেন, অনেক ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বৈষ্ণবসমাজে কায়স্থগুরুর ব্রাহ্মণশিষ্যের এই বোধ হয় সূচনা। অবশ্য তাঁকে ব্রাহ্মণের মর্যাদায় তুলে ধরেন নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র। খেতুরীর মহোৎসবে তিনি সর্বসমক্ষে নরোত্তমকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করেন।

চৈতন্যজীবৎকালে শিষ্ট বৈষ্ণবসমাজে কিছু কিছু রক্ষণশীলতা ও জাতপাতের অল্প-বিস্তর পার্থক্য ছিল। কিন্তু তাঁর তিরোধানের অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বৈষ্ণবসমাজে বর্ণাশ্রমধর্মের আঁটাআঁটি বাঁধন শিথিল হয়ে গেল, সমাজের 'সৎ-শূদ্র' ও 'সঙ্কীর্ণ-শূদ্র' সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত হলেন। বীরভদ্রের প্রভাবেই বোধ হয় জাতিসম্প্রদায়ের বেড়া ভেঙে গেল। স্বয়ং নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের নেতা ও প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী উদ্ধারণ দত্তকে শিষ্যত্ব দিয়েছিলেন, তাঁর বাড়িতে আহারাদিও করতেন। কোনো কোনো মুসলমান ভক্ত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক চমৎকার পদ লিখেছিলেন, চৈতন্যবন্দনাও করেছিলেন, কিন্তু কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বধর্ম ত্যাগ করেছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁদের রচনার আন্তরিকতা, চমৎকারিত্ব, রচনাশৈলী ও ভক্তির গভীরতা যে-কোনো বৈষ্ণব মহাজনের সমকক্ষ। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটি ব্যাপারের উল্লেখ করি। এই সময় থেকে কোনো বৈষ্ণব আচার্যের আচার-আচরণে কিছু বিলাসিতার স্পর্শ লেগেছিল, বিশেষত যাঁরা ভূস্বামী ও ধনীসম্প্রদায়কে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যেমন—বিষ্ণুপুররাজ বীরহাম্বীরের গুরু শ্রীনিবাস আচার্য। তাঁর বিবাহ ও মাতৃশ্রাদ্ধে বীরহাম্বীর রাজোচিত জাঁকজমকের আয়োজন করেছিলেন ও প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন। এই সংবাদ বৃন্দাবনে বৈষ্ণব আচার্যদের কাছে পৌঁছালে তাঁরা সক্ষোভে বার বার বলেছিলেন, 'স্খলদ্ পাদ, স্খলদ্ পাদ'— অর্থাৎ রাজার গুরুগিরি করে শ্রীনিবাস পদস্খলিত হয়েছেন। ঐশ্বর্যের সংস্পর্শে এলে গুরুদের চরিত্রেও কিছু কলঙ্ক পড়বেই। শুধু শ্রীনিবাসই নয়, নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবাদেবীও ভক্তদের ভক্তির আতিশয্যে কিছু কিছু বিলাসিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর স্নানের সময় শিষ্যারা সূক্ষ্ম বস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করতেন।

উত্তরচৈতন্য যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য—বৈষ্ণবগোষ্ঠীর পরিচালিকা রূপে আচার্য-গৃহিণীদের প্রকাশ্যে আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সেই যে অবরোধবাসিনী হয়েছিলেন, আর কখনো লোকচক্ষুর গোচরীভূত হননি। কিন্তু অদ্বৈত আচার্যের জ্যেষ্ঠা পত্নী সীতাদেবী, নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবাদেবী এবং শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী নিজ নিজ শাখার নেত্রী হয়েছিলেন। দীক্ষাদান, শিষ্য গ্রহণ, দল-উপদল পরিচালনা সব ব্যাপারে তাঁরা পুরুষ আচার্যদের মতো দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে জাহ্নবাদেবী সর্বদলেই অতিশয় মান্যা ছিলেন। খেতুরীর মহোৎসবে এবং বৃন্দাবনে তিনি প্রধানা গোস্বামিনী বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন। সপত্নী-পুত্র বীরভদ্রের দীক্ষাও তাঁর কাছে হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতা সম্প্রসারিত হবার দু'শতাব্দী আগেই বৈষ্ণবসমাজে নারীশিক্ষা ও নারীপ্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল। একসময়ে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে উনিশ শতকের দু-তিন দশক) কলকাতার ধনাঢ্য পরিবারের (যথা রাধাকান্ত দেব, দিগম্বর মিত্র, পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, আশুতোষ দেবের পরিবার)

বালিকারা খড়দহের 'মা-গোঁসাই'-দের (বৈষ্ণবী) কাছে মোটামুটি বাংলা লেখাপড়া শিখত। স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রচার হয়েছিল মধ্যযুগের শেষপ্রান্তে--বৈষ্ণবসমাজে।

কালক্রমে বৈষ্ণবসমাজ ও আদর্শে কিছু শিথিলতা প্রবেশ করে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, উচ্চকোটির বৈষ্ণব আচার্যদের জীবনযাপনে ও আচার-আচরণে কিছু ঐশ্বর্যের স্পর্শদোষ সংক্রামিত হয়েছিল। ধনী ভূস্বামী ও বণিকেরা (সপ্তগ্রাম ও ঢাকার বণিকেরা) বৈষ্ণব মত গ্রহণ করলে যেমন অভিজাত ও সম্পন্নসমাজে বৈষ্ণব মতবাদ ছাড়পত্র পেল, তেমনি আবার সেই রন্ধ্রপথ দিয়ে নানা ত্রুটিও প্রবেশ করল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই বৈষ্ণবসমাজে গুরুগিরি ক্রমে অর্থোপার্জন ও প্রতিষ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু বৈষ্ণব আদর্শ ও সমাজে কঠিনতম আঘাত লাগল যখন বীরভদ্র সহজিয়াদের চৈতন্যধর্মে স্থান দিলেন। সহজিয়ারা হিন্দুসমাজ থেকে একটু পৃথক দূরত্বে বাস করত, এরাই ছিল পুরাতন কালের তান্ত্রিক বৌদ্ধ সহজিয়াদের ধ্বংসাবশেষ। এরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ে গুহ্যাতিগুহ্য কৃত্য পালন করত, বিবাহের পারিবারিক ও সামাজিক রীতির প্রতি উদাসীন ছিল এবং শিষ্টসমাজে অননুমোদিত সাধনরীতি গ্রহণ করেছিল। বৌদ্ধদের মতো স্ত্রী-পুরুষ মস্তক মুণ্ডন করত বলে এরা সমাজে 'নেড়া-নেড়ী' বলে নিন্দিত হত। বীরভদ্র ভেবেছিলেন, এই সমস্ত কদাচারী সম্প্রদায়কে শ্রীচৈতন্যের উদার ধর্মে স্থান দিয়ে তাদের সঞ্জীবনের আদর্শে ফিরিয়ে আনবেন। এরা কুণ্ঠিতভাবে বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত হল। কিন্তু নিজেদের গোপনীয় সাধনপ্রক্রিয়া ছাড়তে পারল না। ফলে শিষ্ট বৈষ্ণবসমাজও এদের পুরোপুরি গ্রহণ করল না। পাঁচসিকে দিয়ে কণ্ঠী বদল করলে যতবার ইচ্ছা বিবাহ করা যায়, এই রীতির ফলে তাদের বিবাহবন্ধনও অত্যন্ত শিথিল হয়ে গিয়েছিল। এরাই হল বৈষ্ণব সহজিয়া। যে-চণ্ডীদাস রাগাত্মিকা পদ লিখেছিলেন এবং রামী নামে এক রজককন্যার সঙ্গে সাধনভজন করতেন, তিনিও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরে সহজিয়া বৈষ্ণবসমাজ থেকে বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। আরও পরে কর্তাভজা ও অন্যান্য লোকযানের উৎপত্তি হয়, যাদের সাধনভজনের সঙ্গে গুহ্য কৃত্যের সংযোগ ছিল। ক্রমে উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত দেহচর্যাকেন্দ্রিক সাধনভজন পল্লীগ্রামের লোকসমাজে আত্মগোপন করে। অবশ্য এখনও শিষ্ট বৈষ্ণবসমাজে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিসাধনার আদর্শ অনুশীলিত হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শিক্ষিতসমাজে চৈতন্যভাবাদর্শ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে। কেশবচন্দ্র সেন এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র বৈষ্ণববংশের সন্তান। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার হলেও আচারে-আচরণে অনেক সময় বৈষ্ণব প্রভাব স্বীকার করেছেন। রাজেন্দ্রলাল আধুনিক শিক্ষিত হলেও বৈষ্ণব ঐতিহ্যেই লালিত হয়েছিলেন। রাধাকান্ত দেববাহাদুরও বৃন্দাবনে তীর্থবাস করে বৈষ্ণবভাবেই শেষজীবন অতিবাহিত করেন। চারশ বছর পূর্বে আবির্ভূত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শ ও তত্ত্বদর্শন এখনও বাংলা এবং প্রান্তীয় অঞ্চলে (মণিপুর, উড়িষ্যা) সগৌরবে প্রচলিত আছে। বৈষ্ণব, শাক্ত ও ব্রাহ্ম--প্রধানত এই তিনটি শাখার এখনও প্রচার আছে। তার মধ্যে বৈষ্ণব মতের অধিকতর প্রসার হয়েছে তা স্বীকার করতে হবে।

৪

শ্রীচৈতন্যদেবের সুগভীর প্রভাব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নবযুগ সৃষ্টি করেছে তা এই কালের বাংলা সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় নিলেই বোঝা যাবে। বাংলাদেশে দু'বার নবজীবন-চেতনার সঞ্চার হয়েছিল, একবার চৈতন্যাবির্ভাবের পর, যাকে পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী বলা হয় চৈতন্য-রেনেসাঁস। শ্রীচৈতন্যের চরিত্র, ভাবাদর্শ ও অধ্যাত্ম চেতনা বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে যে প্রবল উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছিল তার সঙ্গে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য

আছে বটে, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে জীবনবোধের সীমা সম্প্রসারণ যদি য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের মূল চরিত্র হয়, তাহলে তার সঙ্গে চৈতন্যপ্রভাবিত বাংলার নবযুগের কিছু মিল লক্ষ্য করা যাবে। অবশ্য বড়ো পার্থক্য-- রেনেসাঁস প্রধানত মানবতাবাদী ইহচেতনার প্রস্ফুট কুসুম, আর চৈতন্য-ভাবধারা ঈশ্বরচেতনারসে সিক্ত ভক্তিভাবের সূক্ষ্ম রসায়ন। বরং উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংঘাতে বাঙালির যে দ্বিতীয়বার জীবনোন্মেষ হল, তার সঙ্গে রেনেসাঁসের অপেক্ষাকৃত মিল দেখা যায়। কারণ, উনিশ শতকের বাঙালি-নবজাগরণের অর্থ ইন্দ্রিয়ময় বিশ্বচেতনার উদ্বোধন। অবশ্য আধুনিক ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী বাঙালির উনিশ শতকী জাগরণকে রেনেসাঁস বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত, কারণ বিদেশী ভাব ও ভাষার মারফতে বাঙালির সমাজে যে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তা প্রধানত কলকাতা কেন্দ্রিক ইংরেজিনবিশ সীমাবদ্ধ মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যাপার, তার সঙ্গে সমগ্র দেশের বিশেষ যোগ ছিল না। তা ছাড়া এই জাগরণে হিন্দুমনোভাব কিছু বেশি স্বীকৃত হয়েছিল, মুসলমানের সঙ্গে এই নবজাগরণের কোনো সম্পর্কই ছিল না, হিন্দুরা এই জীবনস্রোতের শরিক হতে মুসলমান সম্প্রদায়কে আন্তরিকভাবে আহ্বান করেন নি, মুসলমান সম্প্রদায় এই জাগরণকে হিন্দুদের ব্যাপার বলে মুখ ফিরিয়ে দুরে সরে গিয়েছিলেন এবং ইংরেজি শিক্ষাকে সর্বপ্রকারে বর্জন করেছিলেন। ফলে তাঁরা নবজীবনস্রোত থেকে শতাব্দীকাল পিছিয়ে গেলেন। এই জন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও শত্রুতা--যার বিষময় ফল একালে ফলতে আরম্ভ করেছে। অবশ্য বর্তমান প্রসঙ্গে এ-সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ নেই।

যে সমস্ত ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী উনিশ শতকের বাঙালি জাগরণকে 'এলিট' সম্প্রদায়ের স্বল্পজলে স্নানলীলা বলে ব্যঙ্গ করেন তাঁদের এ মনোভাব বোধ হয় পুরোপুরি মানা যায় না। বাংলার এই জাগরণ বিদেশী আলোকচ্ছটায় সম্ভব হলেও তার বিচ্ছুরণ অর্ধশতাব্দীর মধ্যে সুদুর পল্লীপ্রান্তে পৌঁছেছিল। এই শতাব্দীর সপ্তম দশকের মধ্যে মফঃস্বলে আধুনিক শিক্ষার ধারা প্রবেশ করতে আরম্ভ করে, ইংরেজি বিদ্যালয় এবং কোন কোন মফঃস্বল ও আধা শহরে কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত এই সমস্ত বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে আধুনিক শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় নবশিক্ষায় তৈরি হয়ে সমাজে ছড়িয়ে পড়ল। শুধু কলকাতা থেকেই নয়, গ্রামবাংলা থেকেও একাধিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশনার ফলে কলকাতায় উত্থিত ভাবের তরঙ্গ পল্লী অঞ্চলেও দ্রুত বিস্তার লাভ করে। সুতরাং কলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালির সমাজ-সাহিত্য-ধর্ম-রাজনীতি ও সংস্কৃতির নানা শাখার আন্দোলনকে 'ভদ্রলোকের ব্যাপার' বলে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। সে যাই হোক, চৈতন্যপ্রভাবিত বাঙালির মধ্যযুগের সাহিত্য ও সাধনায় সর্বশ্রেণী যোগ দিয়েছিল। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই বাঙালির মন ও হৃদয় দুই-ই পূর্ণতা লাভ করেছিল, একথা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় নিলেই বোঝা যাবে।

শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন ও মতাদর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবসাহিত্য, পদাবলী ও জীবনীকাব্যে। অবশ্য আদিরসপ্রধান রাধাকৃষ্ণ কাহিনী লক্ষ্মণসেনের সভা থেকেই প্রসৃত হয়েছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উপনিষদ হচ্ছে শ্রীমদ্‌ভাগবত। এটি সম্ভবত দশম শতাব্দীর দিকে দক্ষিণভারত থেকে পূর্বভারতে প্রচারিত হয়েছিল। কারণ সমকালীন লিপিলেখন ও সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রকীর্ণ শ্লোকে, যেখানে কৃষ্ণলীলার উল্লেখ আছে, সেখানে অধিকাংশ স্থলে ভাগবত পুরাণকেই অনুসরণ করা হয়েছে এবং ভাগবতে রাধার উল্লেখ নেই বলে সংস্কৃত রচনায় কৃষ্ণের সহধর্মিণী হিসেবে রুক্মিণী ও সত্যভামার কথাই বেশি প্রাধান্য

পেয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে কৃষ্ণলীলার আলম্বন বিভাব স্বকীয়া নায়িকা, না পরকীয়া নায়িকা তাই নিয়ে কিছু মতান্তর ঘটেছিল। বৃন্দাবনের আচার্য সমাজেও এই রকম সংশয় প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ছিল, তা রূপ গোস্বামীর 'ললিতমাধব' থেকেই অনুমান করা যায়। অবশ্য বাংলাদেশে কৃষ্ণলীলার মূল বনিয়াদ পরকীয়া অনুরাগ, যা রাধাকে অবলম্বন করে চার-পাঁচ শতাব্দী ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে। বাংলার বাইরে, বিশেষত পশ্চিমভারতে স্বকীয়া প্রেমকে কৃষ্ণরসাস্বাদনের প্রধান উপকরণ বলা হয়েছে, কিন্তু বাংলায় রাধাই সাধ্যসাধনতত্ত্বের মূল রহস্য। রাধাকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণলীলার পরিকল্পনা বাঙালি বৈষ্ণবসমাজ প্রত্যবায়, চাই কি, 'বৈষ্ণব অপরাধ' বলেই গণ্য করবেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে একবার জয়পুর মহারাজের এক সভাপণ্ডিত মুর্শিদাবাদে এসে বাংলার বৈষ্ণবদের সদম্ভে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। তিনি প্রমাণ করবেন, পরকীয়া নায়িকা নয়, স্বকীয়া অর্থাৎ বিবাহিতা নায়িকাই কৃষ্ণপ্রেমের মূল উৎস। বৈষ্ণবধর্মগুরু (মহারাজ নন্দকুমারের কুলগুরু) রাধামোহন ঠাকুর সশিষ্য প্রায় ছ'মাস ধরে এই তর্কযুদ্ধ পরিচালনা করেন, বৈষ্ণব সমাজের যাবতীয় প্রমাণপুঞ্জ ও গ্রন্থাদি উপস্থিত করা হয়। ব্যাপারটি সাধারণ সমাজেও প্রচুর কৌতূহল ও উৎসাহ সঞ্চার করেছিল। যাতে বিচারে কোনো বিভ্রাট না ঘটে তা দেখবার জন্য নবাব সরকার থেকে একজন পদস্থ মুসলমান কর্মচারীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত তর্কযুদ্ধে পরাভূত হয়ে স্বকীয়া মতের উক্ত পণ্ডিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পরকীয়া মত মেনে নিতে বাধ্য হন এবং রাধামোহন ঠাকুরকে 'অজয়পত্র' লিখে দেন। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনায় রাধা কৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকা। তাঁকে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগে বৈষ্ণবসাহিত্যের বিকাশ, বিবর্তন ও ঐশ্বর্য। আধুনিক যুগেও শ্রীরাধা বাংলা সাহিত্যের মণ্ডপে সগৌরবে বিরাজ করছেন। পরকীয়া নায়িকার প্রেম সমাজনীতির দিক থেকে দোষণীয় মনে হলেও অধ্যাত্ম সাধনায় এর নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। রাধাপ্রেম অচিন্ত্য ও অপ্রাকৃত, তাকে প্রাকৃত চেতনার দ্বারা দেখতে গেলে দারুণ বিচারভ্রান্তি হবে। তাই সাত্ত্বিক প্রকৃতির আচার্য, সাধক ও মহাজনেরা রাধাপ্রেমের মধ্যে কোনো আবিলতা দেখেননি, বরং রাধাপ্রেমই সর্বসাধ্যসার, ভক্ত ও সাধকের একমাত্র অবলম্বন, তা তাঁরা নিজ নিজ ধ্যান ও সাধনকর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।

এই রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার একটা লৌকিক সংস্করণ ছিল, যা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত হয়েছে, ভবানন্দের হরিবংশেও তার চিহ্ন আছে। এই লোক-জীবনের ধারাটি ঝুমুর ও লোকনাট্যের মধ্য দিয়ে গ্রামে-গঞ্জে এখনো চলে আসছে। কিন্তু শাস্ত্রসম্পর্কীয় রীতিটি শিষ্ট সমাজে অধিকতর প্রচলিত ছিল। ভাগবতে রাধাকৃষ্ণলীলা না থাকলেও এই গ্রন্থই বৈষ্ণবসমাজকে লালিত করেছে। অবশ্য পাহাড়পুরের পাথরের গায়ে কৃষ্ণ ও তাঁর দুই পত্নী রুক্মিণী-সত্যভামার চিত্র আছে। সে যাই হোক, বাংলার পল্লী অঞ্চলে অনেকদিন আগে থেকে গানে, লোকনাট্যে, পুতুল নাচে রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণিত হয়েছে। পুরাতন যুগের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে 'কানাইয়ের নাট্যশালা' নামক গ্রামে পুতুলনাচের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হত। মনে হয়, চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধবেন্দ্রপুরী গৌড়বঙ্গে ভাগবতের বিশেষ প্রচার করেন, প্রেমমার্গীয় রাধাকৃষ্ণ লীলাপ্রচারের তিনি আদি প্রবর্তক। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিল্বমঙ্গলের ('লীলাশুক') কৃষ্ণকর্ণামৃত, বোপদেবের মুক্তাফল, বিষ্ণুপুরীর বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী, শ্রীধর স্বামীর ভাগবতের টীকা-টিপ্পনীর প্রভাব প্রাক্‌চৈতন্যযুগের বাংলার শিষ্ট সমাজকে কৃষ্ণভক্তিরসে আর্দ্র করেছিল। কিন্তু যারা সংস্কৃত ভাষা জানত না, তারা লোকজীবনের কাছাকাছি কৃষ্ণকাহিনীতে পরিতৃপ্ত ছিল, যেমন বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, যার কথা আগে উল্লেখ করেছি। এই কবি সংস্কৃত ভাষা, কাব্য, অলঙ্কারশাস্ত্র, জয়দেবের গীতগোবিন্দ,

ভাগবতপুরাণ এবং অন্যান্য কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সংস্কৃত কাব্যাদি সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তিনি লৌকিক জীবনকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন, রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলায় অনেক সময় প্রাকৃত রুচির উত্তাপ প্রকাশ পেয়েছে। মিথিলার রাজসভার কবি ও রাজবয়স্য বিদ্যাপতি ঠাকুর সংস্কৃত, মৈথিলি ও অবহট্ট ভাষায় পুরাণ-স্মৃতি-পদাবলী রচনা করেছিলেন--শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের অন্তত অর্ধশতাব্দী পূর্বে। রচনার চমৎকারিত্বের জন্য তাঁর মৈথিলি পদগুলি মিথিলার সীমা ছাড়িয়ে উড়িষ্যা, বাংলা, নেপাল, আসামেও প্রচার লাভ করেছিল। বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, কেউই বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন না-- বড়ু চণ্ডীদাস তো কোনোক্রমেই নয়। বিদ্যাপতি সভামনোরঞ্জনের জন্য সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে রাধাকৃষ্ণ লীলাকে কেন্দ্র করে মৈথিলি ভাষায় যে-সমস্ত গান বেঁধেছিলেন তার অধিকাংশ পদেই বৈষ্ণবভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। কেবল মাথুর, ভাবসম্মেলন ও প্রার্থনা-বিষয়ক পদে প্রেমভক্তির গভীর উপলব্ধি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। মালাধর বসু ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেছিলেন, ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। এই অনুবাদের কোনো কোনো স্থলে রাধার ইঙ্গিত আছে, ভাগবতে যার উল্লেখ নেই এবং কোথাও কোথাও চৈতন্যযুগের প্রেমভক্তির নিগূঢ় উল্লেখ আছে। মনে হচ্ছে এগুলি পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ। সে যাই হোক, চৈতন্যপূর্বযুগে রচিত বাংলা ও মৈথিলি গান ও আখ্যানকাব্যে রাধাকৃষ্ণলীলা সবিস্তারে বর্ণিত হলেও তখনো তাতে প্রেমভক্তির ইন্দ্রিয়াতীত রহস্য সঞ্চারিত হয়নি, সেটির অবারিত প্রকাশ ঘটল শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের পর, বিশেষত তাঁর তিরোধানের পর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটি বহিরঙ্গগত সাধনা আছে, যা সাধারণ ভক্তদের সামাজিক ঐক্যের মধ্যে এনেছিল। বৃন্দাবনদাস তাঁর শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিয়েছেন যে, ভক্তিধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্যই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। সাধারণ ভক্তগণ বৈষ্ণব স্মৃতি-সংহিতা অনুযায়ী জীবনযাপন করতেন এবং নামকীর্তনের দ্বারা ভক্তির অনুশীলন করতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের আর একটা গূঢ়তর সাধন-ভজন আছে, যা সর্বসাধারণের জন্য নয়, অন্তরঙ্গ ভক্তেরাই তার রহস্যময় রসাস্বাদন করতে পারতেন। কৃষ্ণদাস কাবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সেই গভীর গূঢ় ভক্তিতত্ত্ব নানাভবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের যুগল তনুর নির্যাস রূপে আবির্ভূত মহাপ্রভু তাঁদের সাধ্যসাধনা। অবশ্য এই সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব সকলের অধিগম্য নয়, ফলে এতে কিছু আবিলতা প্রবেশ করেছিল। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবসমাজে যে 'রসরাজসাধনা'-র কথা শোনা যায় তার উৎস হচ্ছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যাখ্যাত রসতত্ত্ব। কেউ কেউ বলেন, আদিরসাত্মক এই সাধনার সঙ্গে সহজিয়াদেরও কিছু কিছু যোগাযোগ ছিল।

ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী ও জীবনীকাব্য শিল্প হিসেবে বিকশিত হলেও অনেক সময়ে জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস-বলরামদাস- রাজশেখর-রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্তারা বৃন্দাবনের আচার্যদের ব্যাখ্যাত ভক্তিতত্ত্বের দ্বারা (বিশেষত রূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি ও জীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ) গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সখীসাধনা। খুব সম্ভব সখীসাধনা রায়রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে তাঁকে ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন। ভক্তের একমাত্র উদ্দেশ্য সখীভাবে রাধাকৃষ্ণের যুগলরস উপলব্ধি। অষ্টসখীরা মিলিত হয়ে রাধাকৃষ্ণ মিলনলীলায় উপাদান যুগিয়ে থাকেন এবং তাঁদের লীলারস উপলব্ধি করে ধন্য হন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবসমাজে সখীসাধনা নামে আর একটি শাখার সৃষ্টি হয়েছিল।

ক্রমে বৈষ্ণবসম্প্রদায় তাত্ত্বিক হয়ে উঠেছিলেন, দার্শনিকতা ও মনন পদকারদের সহজাত

কাব্যশক্তিকে কখনো কখনো নিয়ন্ত্রিত করত, এবং তারই ফলে সংস্কৃতাশ্রয়ী কিছু কৃত্রিম কলাকৌশলও তাঁদের রচনায় প্রকট হয়ে উঠেছে। তবে শিল্পরূপ বিচার করলে উত্তরচৈতন্যযুগের পদসাহিত্যে বিশেষ চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা যাবে । শ্রীচৈতন্যজীবনীকাব্যগুলিও এই যুগের বিচিত্র সৃষ্টি। একজন নিষ্কিঞ্চন ভক্তকে নিয়ে এ ধরনের জীবনী রচনা পূর্বে এদেশে প্রচলিত ছিল না। পূর্বে সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষার রাজপাদোপজীবী কবিগণ নিজ নিজ পৃষ্ঠপোষক রাজামহারাজাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কাব্য রচনা করেছিলেন তার কাব্যমূল্য থাকলেও ঐতিহাসিক তথ্য ছিল স্বল্প। শ্রীচৈতন্যজীবনীকাব্য, যার কিছু সংস্কৃতে, কিছু বাংলায় এবং দু-একটি ওড়িয়া ভাষায় লেখা হয়েছে, তার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা ভক্তির দ্বারা বিবৃত হয়েছে। সুতরাং তার থেকে শ্রীচৈতন্যের বাস্তবধর্মী জীবনী আশা করা যায় না। আধুনিককালের 'বায়োগ্রাফি' লেখার রেওয়াজ সেযুগে এদেশে প্রচিলতি ছিল না। ভক্তের ও সাধকের জীবনকথা ঠিক দৈনন্দিন ঘটনাপঞ্জী নয়, অপার্থিবের ব্যঞ্জনা তার মূল উদ্দেশ্য। সেই দিক থেকে শ্রীচৈতন্য-জীবনীকাব্য এবং অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-শ্রীনিবাস-নরোত্তমের ছোট বড়ো জীবনীকাব্যগুলিও মধ্যযুগের কাব্যরচনার নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ই নিজ নিজ আচার্যদের জীবনী রচনা করে তাঁদের বিস্মৃতির গ্রাস থেকে উদ্ধার করেছেন। বাংলাদেশ অতি প্রাচীনকাল থেকে তন্ত্রের দেশ হলেও এখানে পুরাতন যুগে তান্ত্রিক আচার্যদের জীবনী রচিত হয়নি, এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য। বরং অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত পদকারেরা রচনাবিন্যাসের দিক থেকে বৈষ্ণব পদের কিছু কিছু অনুকরণ করেছেন। সে যাই হোক সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদসাহিত্য ঐশ্বর্য ও কারুকার্যের দিক থেকে বিশুদ্ধ শিল্প হয়ে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য ভাবের স্বাভাবিকতা ও আবেগের ঐকান্তিকতা কিছুটা খর্ব হয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। ভাব যেখানে মন্থর, প্রকাশভঙ্গী সেখানে কিছু কৃত্রিম হয়ে পড়েই। তাই উত্তরচৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদসাহিত্যের স্রোতে ভাটার টান শুরু হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর জগদানন্দ 'চিত্রকবিতা'-র মতো হাস্যকর কন্দুকক্রীড়ায় মেতে উঠবেন কেন? এই পদের ছন্দে গ্রথিত Crossword puzzle- এর পংক্তি লম্বালম্বি পড়ে গেলে এক অর্থ, এবং আড়ের দিকে প্রতি শব্দের আদ্যক্ষর ধরলে আর একপ্রকার অর্থ হয়। কিন্তু তাতে রসিক পাঠকের সান্ত্বনা কোথায়? সহজিয়া চণ্ডীদাসের পদে হেঁয়ালিপূর্ণ সাঙ্কেতিকতা থাকলেও রচনার মধ্যে বিশুদ্ধ কবিত্বের স্পর্শ আছে বলে দুর্বোধ্য গানও রসবস্তু হয়ে উঠেছে। একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, বিশুদ্ধ শিল্প ও রসের আদর্শে বিচার করলে চৈতন্যপ্রভাবিত পদাবলী পৃথিবীর যে-কোনো শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক ও মিস্টিক কবিতার সমতুল্য। ভাষাভঙ্গিমা, বাণীবিন্যাস, অলংকৃতি এবং সকলের উপর সূক্ষ্মভাবের বিলাস বৈষ্ণব পদাবলীকে মধ্যযুগের একমাত্র রসবেদ্য শিল্পরূপ দিয়েছে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব না হলে বৈষ্ণব পদের এই বিচিত্রবিশালতা ঘটতে পারত না। নরহরি সরকার ঠাকুর লিখেছিলেন :

গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে।।

গৌরাঙ্গের আবির্ভাব না হলে মহাভাবস্বরূপিণী রাধাচরিত্র নিশ্চয় রসতত্ত্বের 'প্রৌঢ়াপারাবতী' রূপে গণ্য হতে পারত না— নরহরি সরকারের এ মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত। তবে শুধু রাধার মহিমা নয়, চৈতন্যের আবির্ভাব না হলে বৈষ্ণব পদাবলীর এ ঐশ্বর্যও সৃষ্টি হতে পারত না।

শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যই নয়, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্যেও শ্রীচৈতন্যের

অভূতপূর্ব প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। যাঁরা শাক্ত মঙ্গলকাব্য (মুকুন্দরাম) লিখেছেন তাঁরাও শ্রীচৈতন্যদেবকে যথোচিত ভক্তি নিবেদন করেছেন। অনুবাদ সাহিত্যেও (কাশীরাম দাসের ভারত পাঁচালী ও রঘুনন্দন গোস্বামীর রামরসায়ন) শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দৃষ্টিগোচর হবে। সাধারণত বলা হয়, 'কানু ছাড়া গীত নাই', তেমনি বলা যেতে পারে চৈতন্যপ্রভাব ছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেরও অস্তিত্ব নেই। কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র নিশ্চয় মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যথাযোগ্য স্থান লাভ করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ শিল্পের আদর্শে বিচার করলে বৈষ্ণবপদাবলীকেই আমরা বিশ্বসাহিত্যের প্রাঙ্গণে সগৌরবে উপস্থিত করতে পারি। সেই রসভাবনার আধার হচ্ছেন শ্রীচৈতন্যদেব। এমন কি, উনিশ শতকের বিজ্ঞানালোকিত যুগেও শ্রীচৈতন্য বাংলা সাহিত্য ও সমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছেন। একমাত্র রামমোহন চৈতন্যদেব, বৈষ্ণব মতবাদ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে ঊনার্থক মন্তব্য করেছিলেন, যদিও তাঁর জন্ম হয়েছিল বৈষ্ণব-পরিবারে। এর কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী ও অদ্বৈতপন্থী রামমোহন (বরং তাঁকে একেশ্বরবাদী বা monotheist বলা যায়) শ্রীচৈতন্যের ভাবার্তি ও দ্বৈতবাদী ভক্তিরস স্বীকার করতে পারতেন না। সে যাই হোক, উনিশ শতকের ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালিসমাজ শ্রীচৈতন্যদেব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে 'বোষ্টমি ব্যাপার' বলে উপেক্ষা করেনি, বরং যুগধর্মানুসারে তাঁকে সমাজপরিপ্রেক্ষিতে রেখে তাঁর জীবনাদর্শকে বুঝবার চেষ্টা করেছিল। আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে তাঁর এবং তাঁর পার্ষদদের চরিত্রকে কেন্দ্র করে বহু জীবনচরিত, কাব্য ও নাটক রচিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য ও সাধনাকে বুঝতে হলে তার আরম্ভ করতে হবে শ্রীচৈতন্যকে দিয়ে, সমাপ্তও করতে হবে তাঁকে দিয়ে।

শুধু মধ্যযুগের কাব্যকবিতা ও গান নয়, বাংলা ভাষার বিবর্তন ও গঠনে শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ্য করা যাবে। সংস্কৃত শব্দযোজনা, বাক্‌নির্মিতি ও প্রয়োগবৈশিষ্ট্যের যথাযথ ব্যবহার না হলে আজকের সাহিত্য ভাষা-উপভাষার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারত না, মগহি-ভোজপুরিয়ার মতো উপভাষা হয়েই থাকত। তৎসম শব্দ ব্যবহারের জন্য শ্রীচৈতন্য-প্রভাবিত পদকার ও গোস্বামীরা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর প্রভাব না থাকলে ব্রজবুলি সাহিত্যে এতটা প্রাধান্য অর্জন করতে পারত না। সংস্কৃত বাণীবিন্যাস ও শব্দানুষঙ্গের অভিঘাতে বাংলাভাষা অল্প সময়ের মধ্যে গ্রাম্য ভাষাভঙ্গিমা পরিত্যাগ করে সংস্কৃত শব্দপ্রধান দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অবশ্য উড়িষ্যার বিখ্যাত কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ যেমন সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগবাহুল্যের দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীর ওড়িয়া কবিতার স্বাভাবিকতার অনেকটাই ক্ষুণ্ণ করে ফেলেছিলেন, বৈষ্ণব সাহিত্যে সেই ব্যাপারের হুবহু পুনরাবৃত্তি হয়নি, এটাই সৌভাগ্য। অবশ্য কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী ও নৃতাত্ত্বিক বলে থাকেন যে, বাংলার আদিম সংস্কার অর্থাৎ নিষাদ সংস্কৃতি ও জনমণ্ডলীকে উত্তরাপথের আগন্তুক ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য যেমন চেপে রেখেছে, তেমনি বাংলার যে লোকভাষা মূলত কোলগোষ্ঠী থেকে জন্মলাভ করেছে, তার ওপর ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবিত সংস্কৃত ভাষার জগদ্দল শিলা চাপিয়ে তার স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ করা হয়েছে, তার বদলে কৃত্রিম সংস্কৃত-প্রাধান্য উচ্চকোটির ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। যাঁরা একথা বলেন তাঁরা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য অন্যচোখে দেখে থাকেন। ইংলণ্ডে নর্মান বিজয় না হলে এ্যাংলো-স্যাক্শন ভাষার কতটা গৌরব বাড়ত এবং সে-ভাষা চসার থেকে শেক্সপীয়ার মিল্টন এবং উনিশ শতকের রোমান্টিক কাব্যকবিতার বিকাশের বাহক হিসেবে কতটা সার্থক হত তাতে

সন্দেহ আছে। নর্মান অর্থাৎ মার্জিত ফরাসি ভাষা ও ল্যাটিন ক্লাসিক ভাষা এ্যাংলো-স্যাক্শনের সঙ্গে যথার্থভাবে সুমিশ্রিত হয়েছিল বলেই ইংরেজি ভাষা এত গৌরব লাভ করেছে। মধ্যযুগের বাংলা ভাষার গঠন ও বিকাশেও তৎসম শব্দ ও সংস্কৃত ভাষানুযায়ী ঐশ্বর্যের পরিমিত প্রভাব পড়েছিল বলে আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পৃথিবীর যে-কোনো ঐশ্বর্যবান আধুনিক ভাষার সমকক্ষ হতে পেরেছে। সেইজন্য শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল।

শ্রীচৈতন্য-প্রভাবিত মধ্যযুগের গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতিকে মাঝে মাঝে প্রহেলিকা, কখনো-বা পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। একদিকে শ্রীচৈতন্য যেমন করুণা ও প্রেমের অবতার ছিলেন, পাপীতাপীকে অনায়াসে বুকে টেনে নিতেন, তেমনি আবার সামান্য অপরাধে কোনো কোনো ভক্তের প্রতি ক্ষমাহীন নির্মমতা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। এই সময়ে একদিকে বৈষ্ণবরসোদ্বেল ভাবের আবেগ, আর একদিকে নব্য ন্যায়শাস্ত্রের বুদ্ধির ব্যায়াম। একদিকে জাতপাতহীন বৈষ্ণব সমাজের প্রবল গ্রহণশক্তি, যাতে মুসলমানেরও প্রবেশাধিকার ছিল— আর একদিকে রক্ষণশীল বৈষ্ণব-সমাজে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের প্রাধান্য। একদিকে অতিশয় সংযত আচারনিষ্ঠ সাত্ত্বিক প্রকৃতির অদ্বৈত আচার্য, আর একদিকে 'বোহেমিয়ান' নিত্যানন্দ, যিনি বিশেষ কোনো বিধিনিষিধের ধার ধারতেন না। অথচ শ্রীচৈতন্য দু'জনকেই বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। একদিকে শুদ্ধ সাত্ত্বিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা, আর একদিকে 'রসরাজ' সাধনার নামে আবিল আদিরসের প্রচ্ছন্ন প্রবাহ— যার শেষ পরিণাম সহজিয়া বৈষ্ণব এবং অসংখ্য যান-উপযান। তাঁরা কামপিপাসাকে রসপিপাসায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে সামাজিক বিপর্যয় রোধ করা যায়নি। বাঘ্‌নাপাড়া ও শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের নেতারা সজ্জীবনের আদর্শে নিজ নিজ সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী চালাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও আবিলতার স্পর্শ-দোষ ঘটেছিল। বৈষ্ণব সহজিয়ারা শ্রীচৈতন্যকে গুরু ও পরম রসিক বলে ভক্তি করলেও নিজেদের দেহচর্যামূলক কৃত্য গোপনে গোপনে অনুশীলন করত, যা নৈষ্ঠিক সমাজে নির্জলা কামপরতন্ত্র বলে নিন্দিত হয়েছিল। বাউল সম্প্রদায়ও (হিন্দু ও মুসলমান বাউল দুই সম্প্রদায়) শ্রীচৈতন্যকে ভক্তি করলেও আধিদৈহিক সাধনপ্রক্রিয়ার ('চারচন্দ্রসাধন') প্রচ্ছন্ন অনুশীলনে ঘৃণালজ্জার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। এইসব বৈপরীত্য সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য সমগ্র মধ্যযুগের সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালের পূর্ণতা দান করেছিলেন, যদিও অন্যান্য ধর্মগুরুর মতো নিজ মত প্রতিষ্ঠা ও দল গড়বার জন্য সচেষ্ট হননি। কারণ তিনি মূলত ভক্ত, তত্ত্বরসে নিমগ্ন—বাইরের জগতে দল গড়ার কাজে তাঁর স্পৃহা ছিল না, শেষ কয়বছর বাহ্যিক চেতনাও ছিল না। নবদ্বীপ, নীলাচল ও বৃন্দাবনের অনুচর-পরিকরগণই তাঁর আদর্শকে দর্শন ও মননের সাহায্যে এমন একটা ব্যাপক ধর্মসম্প্রদায়রূপে গঠন করেছিলেন যে, দেশ ও সমাজের নানা পরিবর্তন ও বিবর্তন সত্ত্বেও সে প্রেমধর্মের ভাবধারা শুধু বাংলাদেশেই নয়, বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলে, এমন কি দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতেও কোনো কোনো ভক্তিমার্গের মধ্যে এখনো প্রচলিত আছে। বাংলাদেশের দু'যুগের দুই ব্যক্তি ধর্মজগতে বিচরণ করেও বিশাল দেশ ও কালে পরিব্যাপ্ত হয়েছেন— তাঁরা শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ।

বাউল গান

বাউল গান, সাধনভজন ও তত্ত্বদর্শন নিয়ে এদেশে এবং পশ্চিম বিশ্বে, এই বঙ্গে ও বাংলাদেশে অনেক গবেষক, কবি ও রসিক ছোট বড় নানা বই লিখেছেন। কিন্তু এ সমস্ত আলোচনার উৎস হচ্ছে পুঁথিগত বিদ্যা। তৃণমূল থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন দু-একজন তাত্ত্বিক গবেষক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষভাবে বাউলসাধনার সঙ্গে জড়িত নন, মাঝে মাঝে এদেশে আসেন, কলকাতার কাছাকাছি বাউলের আখড়ায় যান, কিছু কিছু রহস্যবাদী তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তারি উপর ভিত্তি করে গ্রন্থ রচনা করেন, যেমন সুপরিচিত এডোয়ার্ড ডিমক। বাউলপন্থীরা সাধারণত 'উল্টাপন্থী'। নিজেদের আচার-আচরণ, সাধনভজন, গূঢ় গোপন কথা নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে কাউকে বলেন না, সাহেবদের তো নয়-ই। বাঙালি ভদ্র সমাজ এদের কদাচারী অঘোরপন্থী বলে অশ্রদ্ধা করে, যাদের আচারে-আচরণে অশনে-বসনে, পারিবারিক ও বিবাহজীবনে সদাচার অনুসৃত হয় না, যারা জাতপাত মানে না, স্মৃতিশাস্ত্র সরিয়তও স্বীকার করে না, যাদের কাবা-কাশী নেই, যারা মালা ও তসবি জপে না, কোনো-এক 'মনের মানুষের' সন্ধানে নেচে গেয়ে সংসারটাকে 'ধুলোট-উৎসবে' পরিণত করে, সেই সমস্ত বে-সরাপন্থী শাস্ত্রবহির্ভূত আউল-বাউলদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি রাখা কি সম্ভব? তাই উনিশ শতকের ইংরেজিনবিস মধ্যবিত্ত সমাজ এই সমস্ত লোকযানের প্রতি খড়্গহস্ত হয়েছিল, এমনকি, এদের অসামাজিক কদাচারের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগও করেছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, এই সমস্ত অপাংক্তেয় সম্প্রদায় কদাচারী নয়, ঈশ্বরসাধনার একটি উচ্চতম সোপানে অবস্থিত। এদের সাধনায় পুঁথিপত্রের বালাই নেই, হিন্দু-মুসলমানের ভেদ নেই, স্ত্রী-পুরুষেরও পার্থক্য নেই। গানই এদের সাধ্যসাধনা, এরা নিত্যদিন মনের মানুষের সন্ধান করে, যিনি আছেন প্রত্যেকের হৃদয়ে। তবে কখন তিনি আসেন, কখন চলে যান— সেই সন্ধানে থাকতে হয়। তিনিই পরমগুরু 'সাঁই'। "কভু মিলে কভু না মিলে—দৈবের লিখন"। তাই দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের শেষে কোনো কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি এদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন ; কুষ্ঠিয়ার হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ বা ফিকিরচাঁদ বাউল) বাউলগানের সঙ্গীতরীতি ও তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নতুন বাউলের দল গঠন করেন, ঐ আদর্শে বহু গান রচনা করেন, অক্ষয়কুমার মৈত্র, দীনেন্দ্রকুমার রায়, জলধর সেন—অনেক শিক্ষিত বাঙালি তাঁর দলে যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনে গিয়ে বাউল গান, তত্ত্ব ও লালন শাহের সন্ধান লাভ করেন। তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র কোনো কোনো গানে বাউলের তত্ত্বের শৈল্পিক প্রভাব আছে, তাঁর হেপাজতে লালন-গানের দু'খানি খাতা ছিল। বাউলের উচ্চ অধ্যাত্ম সাধনার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল, কারণ তিনিও সেই পথের পথিক ছিলেন, তাঁর হিবার্ট বক্তৃতাবলী ('The Religion of Man') পড়লেই তা বোঝা যাবে। তাঁর গানে ও নাটকে একাধিকবার বাউল চরিত্র ঘুরে ফিরে এসেছে। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব-সংগৃহীত বাউল সঙ্কলনে ('হারামণি') তিনি একটি অনবদ্য ভূমিকা লিখে দেন যার মলাটে অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত নৃত্যগীতরত আবিষ্ট বাউলের ছবি ছিল। মোট কথা রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধ পড়ে শিক্ষিতসমাজ নতুনভাবে বাউল সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা করতে লাগলেন।

হিবার্ট বক্তৃতাবলী প্রকাশিত হলে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও গবেষকের দল এই সম্প্রদায়, তাদের সাধনভজন ও গানের প্রতি কৌতূহলী হলেন। তাঁরা বাউল গানকে লোকযানের এক

বিচিত্র শাখা বলে মনে করলেন। দক্ষিণ আমেরিকায় যেমন দুর্গম অঞ্চলে নানা ধরনের উপধর্ম সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, খ্রীষ্টান নিগ্রোরা নানা ধরনের রহস্যবাদী আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়েছে, সেই রকম হয়তো হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের একান্তে একদল গুহ্যপন্থী সাধক লোকচক্ষুর আগোচরে নিজ নিজ সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে। এদেশের আধুনিক গবেষকেরা বাউল সাম্প্রদায় ও তত্ত্ব সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থ লিখেছেন, কিন্তু মূল তত্ত্ব কতটা ধরতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ আছে। কোনো কোনো বাউল আমাকে জানিয়েছেন যে, ঐভাবে তাঁদের তত্ত্ব ও সাধনা ব্যাখ্যা করা যায় না, ছাপার অক্ষরে যা ছাপা হয়, তার অধিকাংশই লেখকদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা প্রসূত। বাউলের সঙ্গে মিশে তাঁদের সঙ্গে এক না হলে সেসব গুহ্যসাধনা জানা যায় না। গবেষকেরা প্রচুর পরিশ্রম করেন, কিন্তু প্রজ্ঞাদৃষ্টির অভাবে সমস্ত আলোচনা এক ধরনের বুদ্ধির ব্যায়ামে পরিণত হয়। কেউ কেউ আবার সীমাবদ্ধ সাম্প্রদায়িকতার বেষ্টনী লঙ্ঘন করতে পারেন না, অথবা চান না। কেউ-বা একচক্ষু হরিণের মতো মৌলবাদের (এ শব্দটি যথোপযুক্ত নয়, সাময়িক পত্রের দেবতাদের সৃষ্টি) মারফতে এই সম্প্রদায়ের কতটা ইসলাম, আর কতটাই বা বে-সরাপন্থী অনৈস্লামিক কদাচারের অঙ্গীভূত, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লালনফকিরের গানের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, 'গীতাঞ্জলি' কি লালনগীতিকার রসভাষ্য, ইত্যাদি সমস্যা একালের পাঠককে প্রশ্নমনস্ক করেছে। যে লালন জাতপাতের চালাঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন, পরিতাপের বিষয়, তাঁকে সেই ভাঙা কুঁড়ের মধ্যে স্থাপনের চেষ্টা চলেছে। লালন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নন, হিন্দু নন, মুসলিম নন, তিনি বিশ্বমানব, বিশ্বনাগরিক—এ কথাটা উচ্চকোটির হিন্দু-মুসলমান পণ্ডিতেরা বুঝতে চান না। সাম্প্রদায়িক ধর্মমত আমাদের কতটা সীমাবদ্ধ করে ফেলে, একালে লালন-গবেষণাই তার প্রমাণ।

লালনের গানের সুর যেমন মাঠের সুর, তাঁর তত্ত্বও তেমনি ভূমিতলচারী। অবশ্য স্থূল বস্তুপিণ্ডের উপরে তার প্রতিষ্ঠা হলেও গতি তার উর্ধ্বমুখী। প্রাগ্‌বৈদিক যুগ থেকে আর্যেতর সমাজে এক ধরনের দেহাশ্রিত সাধনার কথা সমাজের অন্তরালে প্রচলিত ছিল। ভারতের বাইরেও তার সন্ধান মিলবে। দেহকে অবলম্বন করে দেহাতীত হওয়া, দেহের মধ্যেই অজর অমর হয়ে থাকা, এই দেহসরোবরে সহস্রার সন্ধান করা— এসব প্রাচীন সংস্কার। এখনও মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী এবং আমেরিকার নিগ্রো সমাজে দেহকেন্দ্রিক সাধনার কথা শোনা যায় — যথা Voodooism । মোক্ষ ও নির্বাণ, মুক্তির স্বরূপ কী, এবং কীভাবে তা আয়ত্ত করা যায় তাই নিয়ে শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও আমেরিকা, য়ুরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার কোনো কোনো আদিবাসী সমাজে দুর্জ্ঞেয় আচার-আচরণ প্রচলিত আছে। এইসব আচার-অনুষ্ঠান ও অনুশীলনের মূলে আছে যৌনাসক্তি ও প্রজননক্রিয়া। এই স্থূল ভাব ক্রমে রহস্যবাদী সূক্ষ্ম তত্ত্বে পরিণত হয়। এক সময়ে খ্রীস্টান সংঘের কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে গোপনীয় ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হত। তবে তার সঙ্গে দেহগত কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা বলা যাচ্ছে না। মার্টিন লুথারের পরে এই সমস্ত রহস্যবাদী খ্রীস্টান উপসম্প্রদায় Antichrist বা খ্রীস্টবিরোধী বলে নিন্দিত এবং সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু তা কি সমূলে ধ্বংস হয়েছিল? এখনও য়ুরোপে শয়তান-পূজারীদের গুপ্ত আস্তানা আছে। দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম অরণ্যভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলে এমন দল-উপদল আছে যারা খ্রীস্টতত্ত্বের সঙ্গে আদিম সংস্কার মিশিয়ে এক ধরনের রহস্যময় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে, প্রাক্‌বৈদিক ও উত্তরবৈদিক সাধারণসমাজে দেহাসক্তিমূলক কিছু কিছু

আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। শিব-শক্তি, অর্থাৎ phenomenon ও noumenon -এর সমরসসম্ভূত যুগনদ্ধরূপ তন্ত্রাচারে স্বীকৃত। দেহের মধ্যেই দুই সত্তার মিলন, গোপনচারী উপসম্প্রদায়ের লক্ষ্য। কি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, আর কি বৌদ্ধতন্ত্র সর্বত্র মর্ত্যদেহের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। দেহভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে কতকগুলি দেহচর্যার শরণ নিতে হয়। তন্ত্রের পঞ্চ-মকার, শিবশক্তিতত্ত্ব, কুলকুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বায়ন, বিন্দু রক্ষা, সহজিয়া বৌদ্ধদের 'এ-বং', 'আলি - কালি', 'প্রজ্ঞা-উপায়'—এ সমস্ত রহস্যবাদী মন্ত্রতন্ত্র ও আচার-আচরণে সহজযান ও বজ্রযানের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। পঞ্চ মকার, লতাসাধন প্রভৃতি দেহকেন্দ্রিক অনুশীলনকে রূপকের আবরণে ব্যবহার করা হলেও তার স্থূল রূপ পুরো ঢাকা পড়েনি। হঠযোগে বিন্দু ধারণই প্রধান। তন্ত্রের মৎস্য, মাংস মদ্য, মুদ্রা, মৈথুনের প্রতীক-তাৎপর্য থাকলেও তার বহিরঙ্গকেও অস্বীকার করা যায় না। একশ্রেণীর বাউলদের 'চারচন্দ্রভেদ' ও রসরতির (ডিমক সাহেব কথিত Hidden moon) পিছনে যে স্থূল দেহের প্রভাব আছে, তা স্বীকার করতে হবে। নাথপন্থদের 'কায়াসাধনায়' পিণ্ডদেহকে সূক্ষ্মদেহে পরিণত করার পন্থা নির্দিষ্ট হয়েছে। এই সমস্ত গুহাহিত তমসাবৃত লোকচর্যা বহু শতাব্দী ধরে নানা ধর্ম, উপধর্ম, লোকধর্মের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বাংলাদেশে চর্যাগানের যুগ (১০ম-১২শ খ্রীঃ অব্দ) থেকে সহজিয়া বৈষ্ণব ও অন্যান্য রহস্যবাদী সাধনা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গোপনে অনুসৃত ও অনুশীলিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর আলোকিত যুগেও গ্রামে ও শহরতলীতে নর-নারীর দেহাসক্তিমূলক আচার-আচরণ শিক্ষিত সমাজেও প্রচলিত ছিল। সেই পিচ্ছিল পথে অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত ব্যাপারও গোপনে গোপনে ছাড়পত্র পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের শিল্পরূপ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার দেহমানসিক চর্যাকে পরিহার করেছেন, কোথাও নিন্দা করেছেন, তাঁর বিরস মন্তব্যটি উল্লেখ করি। "একদা পাড়াগাঁয়ে (অর্থাৎ শিলাইদহে) যখন বাস করতুম, তখন সাধুসাধকের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত। তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে। তাতে ধর্মের প্রশ্রয় ছিল। তাদের কাছে শুনেছি, এই প্রশ্রয় সুড়ঙ্গ পথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিয়ো শাখায়িত। এই পৌরুষনাশী ধর্মনামধারী লালসার লোলতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে সেই সমস্ত উপাদানের অভাব যাতে বড় বড় চিন্তাকে, বুদ্ধির সাধনাকে আশ্রয় করে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে।"

বাউলের পথ 'ক্ষুরস্য ধারা', 'ক্ষুরের উপর রাধার বসতি নড়িতে কাটিএ দেহ'। বাউল সাধনার দেহচর্যা বাদ দিয়ে তার গানের রসচর্চা একালের রসিক পাঠককে সর্বাধিক আকর্ষণ করে। এক সময়ে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বাউল সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছিলেন, লালন ফকিরকে. গুরুবৎ মান্য করতেন, তাঁর গান শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করতেন, নিজেরাও ঐ ধরনের গান রচনা করেছিলেন। তবে বাউলের সূক্ষ্ম তত্ত্বই ছিল তাঁদের অবলম্বন, তাকেই বলা যাবে অধ্যাত্ম রসায়ন, রবীন্দ্রনাথ যার ইঙ্গিত লালনের গানে লক্ষ্য করেছিলেন। একালে লালন গানের অনেকগুলি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর দর্শন ও তত্ত্ব নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, গানের শিল্পও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু দেহচর্যাঘটিত আচার-আচরণ সর্বদা অন্তরালে রাখা হয়েছে। কারণ সেই গুহ্য ব্যাপারে 'অনধিকারী'-র কোনো অধিকার নেই। তার তত্ত্ব দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত, কিন্তু আচরণমার্গ হচ্ছে তত্ত্বকে বাস্তব প্রতীতির মধ্যে উপস্থাপনা করা। একটি Theoretical অপরটি Practical। সে যাই হোক, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও সাগরপারের পণ্ডিতেরা লালন ফকির, বাউল সম্প্রদায়, তাদের গান, সমাজ, তত্ত্ব ও সাধনার বাস্তবতা নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। লালনের বহু গান উভয়বঙ্গের বাউলেরা কণ্ঠে রক্ষা

করেছেন, অবশ্য কোনো কোনো গানের প্রামাণিকতা নিয়ে কিছু সংশয় দেখা দিয়েছে। লালনের গানের দুখানি খাতা রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছিলেন।

১২৯৯ বঙ্গাব্দে জগৎ বিশ্বাস নামে আর এক ব্যক্তি লালনের খাতা থেকে যে নকল প্রস্তুত করেন, সেটি ১৩১৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত উক্ত লালন-আখড়ায় ছিল। পাণ্ডুলিপিটি লালনের সবচেয়ে প্রামাণিক সংগ্রহ। এটি নাকি ১৩১৬ বঙ্গাব্দের পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে আসে, এবং আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের কাছেই ছিল, কিন্তু শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে এর কোনো কপি নেই। এই সংগ্রহে একাধিক ব্যক্তির হাতের লেখা ছিল। অতি জনপ্রিয়তার জন্য লালন গানের যে নানা রূপান্তর হয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। ভারতে, বাংলাদেশে ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও গবেষকমহলে বাংলাদেশের রহস্যবাদী যান-উপযান সম্পর্কে বহু আলোচনা হচ্ছে। দেহ-তন্মাত্রের প্রতি কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা থাকাই স্বাভাবিক। কেউ কেউ মনে করেন, বাউল সম্প্রদায় মূলত দেহাত্মবাদী। 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন' এবং "আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো"—এই দুই সীমান্তকে কীভাবে সংযুক্ত করা যায়, পঞ্চ মহাভূত এবং সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, অর্থাৎ সাংখ্যের 'পঞ্চ তন্মাত্র'— এসব দার্শনিক তত্ত্বকথা বাউলদের আচার-আচরণে কতটা স্বীকৃত হয়েছে, এরা আত্মবাদী, না বস্তুবাদী— এই সমস্ত জটিল তত্ত্বে প্রবেশে সকলের অধিকার নেই। যাঁরা এ পথের পথিক, এ রসের রসিক, এ জগতের অধিবাসী, তাঁরা এই আলোচনা থেকে নতুন পথের সন্ধান পেতে পারেন। য়ুরোপ-আমেরিকায় প্রাক্-খ্রীস্ট আদিম ধর্মবিশ্বাস, যা এখনও নিগ্রো সমাজে প্রচলিত আছে, তার তাৎপর্য নিয়ে নানা গবেষণা হচ্ছে, কত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় সেরকম চেষ্টার বিশেষ অভাব আছে। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই লোকচর্যাকে গবেষণার রূপ দিয়েছিলেন। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী তন্ত্রের পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু চর্যার রূপক প্রতীকের যথার্থ তাৎপর্য, তার সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্ব ও দেহঘটিত গুহ্যাচারের কতটা যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা ভাষায় গভীর আলোচনার এখনও অভাব আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই তত্ত্বের গভীরে ততটা প্রবেশ করতে পারেননি, তাঁদের খ্রীষ্টীয় সংস্কার তার বাধাস্বরূপ হয়েছে। উপরন্তু পল্লবগ্রাহী অভিজ্ঞতা মৌলিক তত্ত্বজ্ঞানের কিছু পরিপন্থী। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাস না করলে, তাদের জীবনধারা ও আচার-আচরণের সম্যক পরিচয় না নিলে— সর্বোপরি তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন না করলে এ সমস্ত আলোচনা নিতান্তই বুদ্ধিগত ব্যায়ামে পর্যবসিত হবে।

(দ্র ফকির লালন সাঁই দেশ কাল এবং শিল্প—শক্তিনাথ ঝা)

প্রবন্ধনিবন্ধ

১

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বলা হয়েছে ঃ

তরবোহপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।।

গাছপালাও জীবনধারণ করে, মৃগপক্ষিরাও বেঁচে থাকে। কিন্তু মননই মানুষকে পশুধর্ম থেকে উদ্ধার করে উর্ধ্বতর চেতনায় নিয়ে যায়। এই চেতনার দু'টি স্তর — অনেকটা দ্বিদল বীজপত্রের মতো। একটি রসলোক আর একটি জ্ঞানলোক। রসের তাত্ত্বিক অর্থ বিশুদ্ধ আনন্দ। কাব্য, নাটক ও কথাসাহিত্য প্রধানত রসের কারবারী। নিজের আনন্দের প্রেরণায় লেখক রচনাকর্ম নির্বাহ করেন এবং পাঠক তার থেকে সেই আনন্দ সংগ্রহ করে। সুতরাং আনন্দ সঞ্চারই সারস্বত সাধনার শেষ পরিণাম। কিন্তু 'মস্তিষ্ক-কোটরবাসী, চিন্তাকীট রাশি রাশি'— সেই চিন্তাকীটকে গদ্যে প্রকাশ করতে হয়। তাই গদ্য যুক্তি ও তর্কের বাহন। অবশ্য নিবন্ধ সাহিত্যেও রস সঞ্চার করা যায়। তখন তা আর মননশীল রচনাকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, সে-জাতীয় রচনা মননের আমদরবারের পাশ কাটিয়ে রসের খাসদরবারেই আহূত হয়। তখন তা ব্যক্তিগত রচনা হয়ে ওঠে। তার সূতিকাগৃহ— রচনাকারের হৃদয়-অন্তঃপুর। তার সঙ্গে গীতিকবিতার ভাই-বোনের মতো সম্পর্ক। পরে সে বিষয়ে বিস্তারিত আকারে আলোচনার চেষ্টা করেছি বলে এখানে শুধু ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হলাম।

ছন্দেও চিন্তাত্মক রচনা সম্ভব, সংস্কৃতে তার ভূরি পরিমাণ দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু গদ্যই হচ্ছে চিন্তা ও যুক্তিতর্কের ভাষা। 'গদ্য' শব্দের মূল ধাতু হচ্ছে গদ্ অর্থাৎ কথা বলা। যে ভাষায় আমার নিত্য কথা বলি, আলাপ-আলোচনা করি, তাকেই বলা যাবে গদ্য। দণ্ডী 'কাব্যাদর্শে', বলেছেন— 'অপাদঃ পাদসন্তানো গদ্যম্'— যাতে কবিতার মতো চতুষ্পদীবৎ পদবিভাগ নেই, তাকে গদ্য বলে। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ গদ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'বৃত্তগন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্' ছন্দের লেশ বর্জিত পংক্তিকে গদ্য বলে । অবশ্য গদ্যেরও এক ধরনের যতি আছে, যাকে বলে ভাবযতি (sense pause)। কবিতার ছন্দোস্পন্দ ও অন্ত্যানুপ্রাসকে বলা যাবে শ্বাসযতি (breath pause)। বাণভট্টের কাদম্বরী, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় মাঝে মাঝে সেই ধ্বনিতরঙ্গের স্পর্শ পাওয়া যায়। মানুষ শিশুকাল থেকে গদ্যে মনোভাব প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং গদ্য যে একটা বিশেষ ভাষাপ্রকরণ তা অনেক সময়ে আমাদের খেয়াল থাকে না। কারণ তা অনায়াসলব্ধ ও অচেষ্টাকৃত— যেমন বাতাসের মধ্যে বাস করে অনেক সময়েই বাতাসের অস্তিত্ব ভুলে থাকি। মলিয়রের কমেডির ('La Bourgeois gentle homme') একটি চরিত্র সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিল যে, যাকে গদ্য বলে, সে সারাজীবন তাতেই কথা বলে আসছে, অথচ আগে তা বুঝতে পারেনি— 'Well my goodness! Here I've been talking prose for forty years and never known it...!'

যে ভাষা অচেষ্টাকৃত মুখের ভাষা, যাতে কবিতার মতো ছন্দের দোলা (cadence) থাকে না, থাকে না অলঙ্কারের কলাকৌশল, তাকেই বলা যাবে গদ্য। কবিতার সাহায্যে সহজেই পাঠকের মন জয় করা যায়, কারণ কবিতার সহায়ক হচ্ছে ছন্দ, কল্পনা, ভাষার ঝঙ্কার ও বাক্‌প্রতিমা। এই সব 'তুরুপের' সাহায্যে সহজেই পাঠকের মন আকর্ষণ করা যায়।

কিন্তু নির্ভেজাল, স্পষ্ট, অনলঙ্কৃত গদ্যে সহজে পাড়ি জমানো যায় না। কারণ তার তো কবিতার মতো কোনো ছলাকলা নেই। সেই জন্য প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, গদ্য হচ্ছে লেখক-প্রতিভা বিচারের নিকষ পাথর — 'গদ্য কবীনাং নিকষং বদন্তি'। লেখকের প্রতিভা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার বিচারের নিকষ পাথর হচ্ছে গদ্য। অর্থাৎ গদ্য হল যুক্তির ভাষা, তথ্য-প্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার ভাষা। চিন্তামূলক রচনার প্রধান বাহন হচ্ছে গদ্য। অপর দিকে ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ ও কল্পনার অনুষঙ্গে কবিতা রসসংবাদী হয়ে ওঠে।

২

নিবন্ধমূলক গদ্যরচনাকে দু'ভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে। একটি— তত্ত্বাশ্রয়ী প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সন্দর্ভ। অর্থাৎ যে গদ্যরচনায় যুক্তির বিশেষ বন্ধন আছে, তার মধ্যে তত্ত্ব ও তথ্য নিজ গুণেই প্রাধান্য লাভ করে। আর একটি হল রসাশ্রয়ী গদ্যরচনা, যা নিবন্ধ হলেও প্রবন্ধ নয়। এই জাতীয় গদ্যরচনায় লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রাধান্য। এখানে তিনি রসস্রষ্টা, রূপদক্ষ এবং কল্পনাপ্রবণ। বাংলায় আমরা তত্ত্বাশ্রয়ী গদ্য-রচনাকে বলতে পারি প্রবন্ধসাহিত্য এবং রসাশ্রয়ী গদ্যরচনাকে বলা যাবে রচনাসাহিত্য, অর্থাৎ ব্যক্তিগত নিবন্ধ—একালে যাকে 'রম্যচরনা' নাম দিয়ে লঘু করে ফেলা হয়েছে। গদ্যপ্রবন্ধকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে formal, objective, impersonal essay, একে treatise ও discourse বলা যেতে পারে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি চিন্তাগ্রাহ্য ব্যাপারকে তত্ত্ব ও তথ্যের আধারে এবং যৌক্তিক পারম্পর্যের বাহনে ফুটিয়ে তোলাই যথার্থ প্রবন্ধের লক্ষণ। তত্ত্ববহুল প্রবন্ধও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি তাতে যুক্তির পরিচ্ছন্নতা থাকে এবং বক্তব্যটি দৃঢ়মূল সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু প্রবন্ধ হবে নৈর্ব্যক্তিক। বস্তুগত ও যৌক্তিক পারম্পর্যে রূপনির্মিতি প্রবন্ধের প্রধান চরিত্র।

আর এক ধরনের গদ্যরচনা আছে যার মধ্যে বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের চেয়ে প্রাধান্য পায় বক্তব্যের ঢঙ, গীতিকবির মতো রচনাকারের মনের রঙ ও রস। তাকে ইংরেজি মতে বলা হয় informal, subjective, personal essay। বাংলায় নাম দেওয়া গেল রচনাসাহিত্য— আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ('বাংলা সাহিত্যের একদিক')। অবশ্য এই ধরনের রচনার বয়স চার-পাঁচ শতাব্দীর বেশি না হলেও প্রাচীন য়ুরোপেও কোনো কোনো তাত্ত্বিকের রচনায় রচনারসের অল্প-স্বল্প পরিচয় পাওয়া যায়। প্লেটো (আনুমানিক ৪২৭-৩৪৭ খ্রীঃ পূঃ), থিয়োফ্রেসটাস (আনুঃ ৩৭২-২৮৬ খ্রীঃ পূঃ), প্লিনি (২৩-৮৯ খ্রীঃ অঃ), সিনেকা (৫ খ্রীঃ পূঃ-৬৫ খ্রীঃ অঃ), সিসিরো (১০৬-৪৩ খ্রীঃ পূঃ), প্লুটার্ক (আনুঃ ৪৬-১২০ খ্রীঃ অঃ), মার্কাস অরেলিয়াস (আনুঃ ৩৭২-২৮৬ খ্রীঃ পূঃ) প্রভৃতি চিন্তাশীল হেলেনীয় লেখকদের কোনো কোনো প্রবন্ধে আধুনিক যুগের রচনাসাহিত্যের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। সিসিরো-র 'De Amicitia' অর্থাৎ বন্ধুত্ব ও 'De Seneatule' অর্থাৎ বার্ধক্য— এই দুটি রচনায় চার্লস ল্যাম্বের (১৭৭৫-১৮৩৩) স্বাদ পাওয়া যাবে। সিনেকার 'Epistles of Lucilius'-এ রচনাসাহিত্যের অনুরূপ 'Dispersed meditation'-এর ক্ষীণ স্পর্শ আছে। সেকথা স্বয়ং বেকন তাঁর 'Essays'-এর ১৬১২ সনের সংস্করণে ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। অনুসন্ধান করলে দু'হাজার বছরের পূর্ববর্তী গ্রীক-রোমক নিবন্ধ-সাহিত্যে লেখকদের ব্যক্তিগত চেতনার আতপ্ত স্পর্শ পাওয়া যাবে। অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে রচনাসাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে য়ুরোপের কোনো গদ্যলেখকই অবহিত ছিলেন না। ধর্ম, নীতি দর্শন, রাষ্ট্রতত্ত্ব সমাজনীতি, সাহিত্যতত্ত্ব প্রভৃতি বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়কে নিয়ে প্রাচীন গ্রীক, রোমক ও মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নিবন্ধসাহিত্যে য়ুরোপের মনঃপ্রকর্ষ স্পষ্টত ধরা পড়েছে। কিন্তু এ তো

হচ্ছে প্রবন্ধকারের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের কথা। তাঁদের অন্তর্লোকের স্পর্শ কিসে পাওয়া যাবে? তাকেই বলা হয়েছে রচনাসাহিত্য বা ইংরেজি মতে essay literature। ফরাসি essais শব্দটির মূল বোধ হয় 'assay' অর্থাৎ ধাতু প্রভৃতির গুণাগুণ নির্ণয় করার ক্রিয়াকৌশল। এর আর একটি অর্থ চেষ্টা করা, এর থেকেই essay শব্দের উৎপত্তি। এক ধরনের ব্যক্তি-আশ্রয়ী সচেতন গদ্যরচনার জনক ফরাসি লেখক মিচেল দে মনতেইন (১৫৩৩-৯২) সর্বপ্রথম 'essais' (অর্থাৎ eassay) শব্দটি চেষ্টা (attempt) অর্থে প্রয়োগ করেন। ব্যক্তিগত চিন্তা ও আত্মকথনের অর্থে প্রয়োগ করে এবং নিজের মনের কথাকে কেন্দ্র করে ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দে *Essais*-এর প্রথম-দ্বিতীয় এবং ১৫৮৮ অব্দে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করলেন মনতেইন। তিনি বোধ হয় এই রচনাগুলি সম্বন্ধে কিছু সংশয়ী ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, এই প্রবন্ধগুচ্ছে খানিকটা অপূর্ণতা, শিথিলতা ও অপ্রাসঙ্গিকতা আছে ; এতে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের মতো আঁটসাঁট বন্ধন নেই, নেই কোনো উদ্দেশ্যমূলক স্থির লক্ষ্য ও সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত। যেন লেখক আপন মনে নিজেকে সম্বোধন করে বলে যান, পাঠক আড়ি পেতে শুনে থাকে। তাই মনতেইন বলেছেন, তাঁর *Essais* তাঁরই অপৃথগ্‌যত্ন সত্তা, তাঁর ভাষায়— তাঁর 'Consubstantial' স্বরূপ তাঁর ব্যক্তিপুরুষীয় সত্তার সঙ্গে এক হয়ে গেছে। কিন্তু যাঁরা তথ্যনিষ্ঠ ও তত্ত্ববাদী প্রবন্ধ বা dissertation-এর ভক্ত, তাঁরা এই ধরনের রচনার শিথিলতা, এলোমেলো অসম্পূর্ণতা এবং লেখকের নিতান্ত ব্যক্তিগত স্বগতোক্তিকে গদ্যসাহিত্যের আসরে বড় বেশী গুরুত্ব দিতে চান না। ডেভিড হিউমের (১৭১১-১৭৭৬) 'A Treatise on Human Nature', জন লকের (১৬৩২-১৭০৪) 'An Essay Concerning Human Uderstanding' প্রভৃতি তাত্ত্বিক আলোচনায় essay শব্দ যুক্ত হলেও এ-গুলি আদৌ essay বা রচনাসাহিত্য নয়, treatise ও discourse-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ছন্দে লেখা আলেকজাণ্ডার পোপের (১৬৮৮-১৭৪৪) 'Essay on Criticism' এবং 'Essay on Man' essay-ও নয়, কবিতাও নয়। সে যাই হোক, essay বা রচনাসাহিত্যের মধ্যে চেষ্টাকৃত শিথিলতা আছে বলে এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-৮৪) বলেছেন, 'loose sally of mind, an irregular, undigested piece, not a regular and orderly composition'— যেটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধালোচনায় পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হয়ে আসেছে। জর্জ ক্র্যাব্‌-ও (১৭৫৪-১৮৩২)মনে করতেন, রচনাসাহিত্যে গভীরতা বা পরিশ্রমসাধ্য অনুসন্ধান নেই বলে হাল্কামনের পাঠক এই সমস্ত 'superficial' রচনা পড়ে মজা পায়। কিন্তু স্যাঁৎ বোভ (১৮০৪-৬৯) মনে করতেন রচনাসাহিত্য অতি চমৎকার উপভোগ্য হলেও খুব অল্প লেখকই শ্রেষ্ঠ রচনাসাহিত্যের নাগাল ধরতে পেরেছেন। শ্রেষ্ঠ রচনাসাহিত্য শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার চেয়েও দুর্লভ।

ইংরেজি রচনাসাহিত্যের প্রথম পত্তন করেন স্যর ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) তাঁর *Essays* (১৫৯৭) গ্রন্থে। অবশ্য এই নিবন্ধসংগ্রহের বক্তব্য ও বস্তুর মধ্যে বিশেষ গুরুভার অনুভূত হয় বলে এটি সব সময়ে মনতেইনের মতো সুখপাঠ্য নয়, যদিও তিনি মনতেইনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বে ইংরেজি গদ্যে কতকটা এই ধরনের লেখা পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে রচনাসাহিত্যের চরিত্র ততটা পরিস্ফুট হয়নি। জন অড্‌লের (John Audeley) *Fraternity of Vagabonds* বেকনের পূর্বে, ১৫৬৬-রও পূর্বে রচিত বলে অনুমিত হয়, এতেই সর্বপ্রথম রচনা-সাহিত্যের কিছু স্পর্শ পাওয়া যায়। বেকনের একটু পরে প্রকাশিত রবার্ট জনসনের *Essaies, or rather Imperfect offers* (১৬০১)-এ রচনাসাহিত্যের ব্যক্তিগত স্পর্শ আর একটু স্পষ্ট হল। কাব্য ও সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে

সুপরিচিত আব্রাহাম কাউলের (১৬১৮-১৬৬৭) গদ্য ও পদ্যে রচিত *Several Discourses, by way of Essays, in Verse and Prose* (১৬৬৮) শীর্ষক সঙ্কলনের 'Essay' অংশে সংযোজিত 'On Myself' নিবন্ধে সপ্তদশ শতাব্দীর রচনাসাহিত্যের প্রকৃষ্ট লক্ষণ ধরা পড়েছে, তিনি সচেতনভাবে মনতেইনের অনুসরণ করেছিলেন। তারপর অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে ব্যক্তিগত-রচনার বান ডাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ্যাডিসন, স্টিল, জনসন, ডিফো, পোপ, সুইফ্‌ট্‌, গোল্‌ড্‌স্মিথ, স্মলেট এবং উনবিংশ শতাব্দীতে হ্যাজলিট, লে হান্ট, টমাস পেইন, সিডনে স্মিথ, সাদে, চার্লস ল্যাম্ব, স্টিভেনসন, ডি কুইন্সি, পরবর্তীকালে রাসকিন, কার্লাইল প্রভৃতি অসংখ্য রচনাকার রচনাসাহিত্যকে গদ্যসাহিত্যের শক্তিশালী বাহনে পরিণত করেছেন। আমেরিকার প্রাবন্ধিক হেনরি ডেভিড থোরো (*Thoreau,* ১৮১৭-৬২), যিনি *Walden, or Life in the Woods* (১৮৫৪) রচনা করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন এবং র‍্যাল্‌ফ্‌ ওয়াল্ডো এমার্সন (১৮০৩-১৮৮২) আমেরিকার অধিবাসী হয়েও সারা বিশ্বে নন্দিত হয়েছেন। ফরাসি রচনাকার স্যাঁৎ বোভ (১৮০৪-১৮৬৯), থিয়োফিল গোটিয়ে (১৮১১-১৮৭২), আনাতোলা ফ্রাঁস (১৮৪৪-১৯২৪), আঁদ্রে জিদ্‌(১৮৬৯-১৯৫১) প্রভৃতি রচনাকারেরা ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে রসশিল্পের কোঠায় তুলে ধরেছেন। সার্থক রচনাসাহিত্যে কবিতার রস, দার্শনিকতা, কথাসাহিত্য, স্মৃতিকথা, রঙ্গকৌতুক ও উদার প্রসন্নতা থাকা একান্ত আবশ্যক। তা না থাকলে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সম্বন্ধে ক্র্যাবের এই অপ্রসন্ন অভিমত মেনে নিতে হয়, 'The essay is the most popular mode of writing because it suits the writer who has neither talent nor inclination to pursue his inquiries further, and... generality of readers who are amused with variety and superficiality,' বিশ শতকে যে পাশ্চাত্য সাহিত্যে ব্যক্তিগত রচনার মান নেমে যাচ্ছে, এর কারণ কী? একালের মানুষ অহোরাত্র কাজ এবং অকাজ নিয়ে ব্যস্ত, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি আধুনিক য়ুরোপের অবসর হরণ করেছে। তাই বোধহয় অবকাশের সহচর ব্যক্তিগত রচনা ক্রমেই ম্লান হয়ে পড়েছে। কিংবা হয়তো সুলভ ভাবাতিরেকযুক্ত ব্যক্তিগত খামখেয়াল ও অতি-ঢিলেমি একালের কর্মব্যস্ত য়ুরোপের ভালো লাগছে না।

বস্তুত ব্যক্তিগত রচনার কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নেই। এ্যামিবা থেকে 'ব্রবৃডিংনাগ', হিমালয় থেকে বল্মীক স্তূপ, তক্তে-তাউস থেকে ভাঙা চৌকি, পারিজাতবিতান থেকে পুঁইমাচা, আকবর বাদশা থেকে হরিপদ কেরানি— ব্যক্তিরূপ ধারণ করলেই রসরূপ লাভ করতে পারে। তার জন্য চাই লেখকের ভূয়োদর্শনজনিত উদার মনোভাব। লেখার মধ্যে 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'— এই ধরনের অসমাপ্তির অতৃপ্তি ফুটে উঠবে লেখক ও পাঠকের অজ্ঞাতসারে, কোনো পূর্বনির্ধারিত কাটাছাঁটা চিন্তাভাবনা মাথা চাড়া দিলে ব্যক্তিগত রচনা প্রায়শই 'সার্মনে' পরিণত হয় এবং লেখক হয়ে পড়েন গুরুদেব বা আচার্যমশাই, যা ব্যক্তিগত রচনার পরম শত্রু। গীতিকবিতার সঙ্গেই ব্যক্তিগত রচনাসাহিত্যের কুলবন্ধন। আলেকজাণ্ডার স্মিথের (*On the Writing of Essays*) এই অভিমতটি গ্রহণযোগ্য : 'The essay as a literary form, resembles the lyric, in so far it is moulded by some central mood— whimsical, serious or satirical'। অন্তরঙ্গতা ব্যক্তিগত রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খামখেয়াল, প্রসঙ্গচ্যুতি, রঙ্গকৌতুক, হাল্‌কা ব্যঙ্গ, মার্জিত নাগরিকতা, সহজ প্রবাহ— এই সব বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত রচনাকে লীলায়িত ভঙ্গি দিয়ে থাকে। তাই কেউ কেউ এই জাতীয় রচনাকে বলেছেন playful essays— রচনার লীলারস। তাই যদি কেউ বলেন, প্রবন্ধসাহিত্যের পশ্চাতে আছে ঘর্মসিক্ত পরিশ্রম (perspiration) এবং ব্যক্তিগত রচনাসাহিত্যের প্রেরণা 'অকাজের কাজ যতো আলস্যের সহস্র সঞ্চয়' সৃষ্টির

লীলারস (inspiration), তা হলে আমাদের বক্তব্য অনেকটা কাছাকাছি যাবে। অবশ্য ইংরেজি গদ্যসাহিত্যে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিগত রচনার শিথিলতা, প্রসঙ্গচ্যুতি, এলোমেলো ভাব বিশ শতকের রচনায় অনেকটা সংযত হয়েছে।

৩

একাধিক লেখক বাংলায় চমৎকার ব্যক্তিগত রচনা লিখেছেন। কারো কারো তাত্ত্বিক রচনাতেও ব্যক্তিগত স্পর্শ ঘটেছে— লেখকের অজ্ঞাতসারেই। রামমোহনের সতীদাহ নিরোধ বিষয়ক দুটি পুস্তিকা ('সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'—১৮১৮, দ্বিতীয় সম্বাদ ১৮১৯) এবং একটি কৌতুকমিশ্রিত রচনা (পাদরি ও শিষ্য সংবাদ—১৮২৩), বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক দুটি পুস্তিকা ('বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা-এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'—১৮৫৫, দ্বিতীয় প্রস্তাব—১৮৫৫), বিদ্যাসাগর চরিত (১৮৯১) এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'প্রভাবতী সম্ভাষণে'র কোনো কোনো স্থানে ব্যক্তিগত উপলব্ধির চকিত স্পর্শ পাওয়া যাবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা ও আচার্যের উপদেশ তত্ত্বকথা- পূর্ণ হলেও ব্যক্তিগত উপলব্ধিও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'বিজ্ঞানরহস্য'(১৮৭৫) ও 'কমলাকান্তের দপ্তরে' (১৮৭৬) ব্যক্তিগত আতপ্ত স্পর্শ রচনাসাহিত্যের প্রধান লক্ষণসমূহ ফুটিয়ে তুলেছে। সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ (১২৮৭-৮৯), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চানন্দ' ও 'পাঁচুঠাকুর' ছদ্মনামে প্রকাশিত চুটকি রচনাতে কিছু কিছু ব্যক্তিগত লক্ষণ আছে। তবে ব্যক্তিগত রুচি ও রসিকতার চাবুক হাতে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি হুতোম অর্থাৎ কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় (১৮৬১-৬২) অনেক সময়ে তীব্র ব্যক্তিগত আক্রমণ থাকলেও এবং সব সময়ে রুচির মুখ রক্ষা না হলেও ছদ্মবেশের অন্তরালে বসে তিনি যেভাবে তরবারি চালনা করেছেন তাতে তাঁর মজলিসি বাঙালির খোলামেলা মনটি সমস্ত নির্মোক ত্যাগ করে 'আদুড়গায়ে' আত্মপ্রকাশ করেছে। বঙ্কিম-শিষ্যদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ('উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'— ১৮৭৬), চন্দ্রনাথ বসু ('ত্রিধারা'র অন্তর্ভুক্ত 'পাখীটি কোথায় গেল' এবং 'ফুল ও ফলের' অন্তর্ভুক্ত 'ফুলের বৃন্ত', 'ফুলের ভাষা,' 'ভালবাসা') নানা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ (শকুন্তলাতত্ত্ব, হিন্দুবিবাহ, হিন্দুত্ব, কঃ পন্থা) লিখলেও ব্যক্তিগত ঢঙে রচিত ছোট ছোট নিবন্ধগুলির রস এখনও উপভোগ্য। অবশ্য রবীন্দ্রনাথই ব্যক্তিগত রচনায় নিবন্ধরচনার শক্তিশালী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ভ্রমণ-কাহিনী, ডায়েরি, চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, আত্মকথা— এমন কি ধর্মতত্ত্বকেও (মানুষের ধর্ম, ধর্ম, শান্তিনিকেতন) তিনি রসসাহিত্যের পর্যায়ে তুলে ধরেছেন। ছিন্নপত্র, জীবনস্মৃতি, পঞ্চভূত ও বিচিত্র প্রবন্ধ রচনাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে বাংলা সাহিত্যে চিরদিন স্বীকৃতি লাভ করবে। রবীন্দ্রনাথ মূলত গীতিকবি বলে ব্যক্তিগত গদ্যরচনায় সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন এবং যে সমস্ত তত্ত্বমূলক গ্রন্থ লিখেছেন তাতেও ব্যক্তিগত সুরের রেশ শোনা যাবে। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, তত্ত্বকথাও তাঁর মনের স্পর্শে ব্যক্তিগত রসরূপ লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কথা মনে পড়বে। মূলত তিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হলেও তাঁর বুদ্ধিগ্রাহ্য রচনাতেও স্বাদু রসের স্পর্শ পাওয়া যাবে। হুতোমের পর যাঁরা কলকাতার চলিত ভাষায় নিজ নিজ মনের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁদের প্রধান হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ ও প্রমথ চৌধুরী। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, আচার্য, ধর্মপ্রচারক ও ধর্মগুরু। কিন্তু তাঁর চিঠিপত্র, ভ্রমণকাহিনী ও রোজনামচায় যে ব্যক্তিগত উত্তাপ, কৌতুক, পরিহাসের বিচিত্র স্বাদ লাভ করা যায় তা প্রমথ চৌধুরীর বিদগ্ধ রচনাতেও দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের শিষ্যসম্প্রদায় এবং সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী কখনো স্বনামে, কখনো বে-নামে

কোথাও কোথাও উইট হিউমারের মধ্য দিয়ে গুরুগম্ভীর বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে যে কৌতুকরসের খোলা হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত এ-সাহিত্যে বড়ো বেশি পাওয়া যায় না। একালে আরো বেশ কয়েকজন রচনাকার ব্যক্তিগত রচনার মূল্য বৃদ্ধি করেছেন। কয়েকজনের নাম উল্লেখ করি : অন্নদাশংকর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পরিমল রায়, বুদ্ধদেব বসু, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (বিপমুখ), যাযাবর, মুজতবা আলি, রূপদর্শী, শঙ্কর, সুকন্যা, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। তবে জনান্তিকে একটি কথা বলে রাখি। কেউ কেউ মনে করেন, যে রচনার কোনো বাঁধন নেই, যুক্তি যেখানে এলানো, চিন্তা যেখানে শিথিল এবং অসংবদ্ধ, উক্তি যেখানে ব্যক্তিগত রচনা নামে অভিহিত হয় তার প্রতি সহজিয়া পথের বাঙালি লেখক ও পাঠকের আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক। তাই যার অন্য কোনো রচনার শক্তি নেই, নেই কোনো প্রবণতা, সে মনে করে, ব্যক্তিগত রচনা অতি সহজ ও অনায়াসলব্ধ ব্যাপার। কিন্তু এতটা সহজভাবে রম্যরচনা সৃষ্টি করা যায় না। সমস্ত অসঙ্গতি, অপ্রাসঙ্গিকতা, শিথিলবদ্ধ চিন্তা যখন লেখকচিত্তের যাদুমন্ত্রে একটি সমগ্র সুসমঞ্জস রসচেতনায় পরিণতি লাভ করে, তখনই ব্যক্তিগত রচনা শুধু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, ব্যক্তিকে অবলম্বন করে তা বিশ্বগত হয়ে ওঠে, যাকে অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'সাধারণীকরণ'। এ-ধরনের রচনা স্বতই স্বল্পতম। কিন্তু খোলা মাঠে চলতে সকলের ইচ্ছা হয়, মাঠ ভেঙে রাস্তা বার করতে যে মানসিক প্রস্তুতির আবশ্যক, বুদ্ধিবৈগুণ্যে অনেকেই তা থেকে বঞ্চিত। ফলে অনধিকারী ব্যক্তি যখন একালে রম্যরচনার নামে অমেধ্য বস্তু তৈরি করছেন, এবং জড়বুদ্ধির পাঠক সেই পিটুলিগোলা পান করে দুগ্ধপানের তৃপ্তি লাভ করছে, তখন বুঝতে হবে এই সমস্ত লেখকের কলমে দুষ্টা সরস্বতী ভর করেছে। এ-সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর বিরস মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে : 'যাঁরা কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস কিছুই লিখতে পারেন না, এবং সত্যিকারের সাংবাদিক পর্যন্ত নন, যাঁদের না আছে তথ্য বা জ্ঞান, না উদ্ভাবনশক্তি বা কলানৈপুণ্য, সঙ্গতি রক্ষা করে কোনো বিষয়ে একদণ্ড চিন্তা করতে বা পরস্পর দুটো বাক্য রচনা করতে স্বভাবগুণে অক্ষম, তাঁদের বিশৃঙ্খল প্রগলভতা ছাপার অক্ষরে উদ্ধত হয়ে উঠতে পারত না, যদি না 'রম্যরচনা' শব্দটি সৃষ্টি হত' (কবিতা, ২৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)। ব্যক্তিগত রচনার প্রধান শত্রু সাংবাদিকতা। একথা সাংবাদিক ও রচনাকারেরা যত শীঘ্র অনুধাবন করতে পারবেন ততই সত্যকারের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মান উন্নত হবে।

৪

এবার বস্তুগত, তথ্যপ্রধান ও তত্ত্বকেন্দ্রিক প্রবন্ধ সাহিত্য-সম্বন্ধে দু-একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাক। প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সন্দর্ভ—যে নামেই এই জাতীয় মনঃপ্রধান রচনাকে বিশেষিত করি না কেন, এটি মূলত মানুষের চিন্তার ঐশ্বর্য, চেতনার বিস্ময় ও উদ্দেশ্যের গাঢ়তা। তার প্রধান লক্ষণ হল লেখকের মানসিক পরিশ্রম ও যৌক্তিক শৃঙ্খলাবোধ। মননের মধ্যেই মানুষের দ্বিজত্ব লাভ ঘটে— সে কথার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের মধ্যে। কোনো একটি তত্ত্ব, যাকে বলা যাবে চেতনার দুর্গ, সেই দুর্গকে আক্রমণ করতে হয় অতন্দ্র বুদ্ধির অস্ত্রে। যুক্তির সাহায্যে অবিন্যস্ত চিন্তাকে উদ্দেশ্যের অনুকূলে প্রেরণ করা এবং অবশেষে বিশ্লিষ্ট চিন্তাকে একমুখী করে তোলা প্রবন্ধনিবন্ধের ধর্ম। বস্তুত প্রবন্ধের মধ্যে জাতির মেরুদণ্ডের স্বরূপ বোঝা যায়। প্রবন্ধসাহিত্য ও রচনাসাহিত্য একই গাছের ফল। গণ্ডকী-শিলা কখনো শালগ্রামরূপে পূজা লাভ করে, আবার তা দিয়ে মশলা পেষণও চলতে পারে। আরণ্যক কথায় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির কাহিনী আছে। তাঁর দুই স্ত্রী— মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। বানপ্রস্থ অবলম্বনের পূর্বে ঋষি দুই স্ত্রীর মধ্যে তাঁর পার্থিব সম্পদ বণ্টন করে দিতে চাইলে ব্রহ্মবাদিনী

মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করেছিলেন, এই সব ধনজন-ঐশ্বর্য, স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত সহস্র দুগ্ধবতী গাভী এরা কি আমাকে অমৃতত্ব দিতে পারবে? উত্তর পেলেন— না, এ-সব পার্থিব ঐশ্বর্য ভোগসুখ দিতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞান নয়। তখন মৈত্রেয়ী স্বচ্ছন্দে এ-সব ত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন— মোক্ষমুক্তি ব্রহ্মসাযুজ্য লাভের এষণায়। কাত্যায়নী সম্ভবত গৃহিণীপনায় অধিকতর অভ্যস্ত ছিলেন, এবং পার্থিব ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ব্রহ্মবিহার কামনা করেননি। তিনি যথারীতি উদূখলে গোধুম-যব-ব্রীহি চূর্ণ করতে লাগলেন, গবীযূথের পরিচর্যা ও দুগ্ধদোহনে অনীহা প্রকাশ করলেন না। অনুমান করি, তাঁর কাছে উদূখলতত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্বের চেয়ে অধিকতর গ্রহণীয় হয়েছিল। এই রূপক ও রহস্যের তাৎপর্য হচ্ছে প্রবন্ধ-নিবন্ধ সন্দর্ভাদি গদ্যরচনা প্রয়োজনের ব্যাপার। তার সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়, তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়, চিন্তাকে যুক্তির শানপাথরে পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করে যে-কোনো 'Gordian knot' দ্বিখণ্ডিত করা যায়। মন তখন বিষয়কে কেন্দ্র করে। বিষয়ী অর্থাৎ প্রাবন্ধিক থাকেন পশ্চাদ্‌ভূমিতে অনেকটা লুপ্ত-অকারের মতো। অপরদিকে রচনাসাহিত্য বা ব্যক্তিগত রচনা হচ্ছে রসশিল্প, গীতিকবিতার জাতি। প্রবন্ধসাহিত্য ও রচনাসাহিত্য—দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য শুধু একস্থানে দুটোই গদ্যে রচিত, কিন্তু চরিত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। রচনাসাহিত্য হচ্ছে 'হেলা খেলা সারা বেলা, সকল খেলা আপন মনে', প্রবন্ধ সাহিত্য হচ্ছে 'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত'। একটিতে আত্মার মুক্তি, আর একটিতে যুক্তি-তর্ক, তথ্য ও তত্ত্বের নিশ্ছিদ্র ব্যূহ রচনা। একটি রসৈষণা, আর একটি গবেষণা। একটি আনন্দঘন সম্বিতের আস্বাদন, আর একটি জ্ঞানরত্নাকরের তরঙ্গ বিক্ষেপ। অবশ্য একথা ঠিক যে, তত্ত্বপূর্ণ ও তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে একটা জাতির ইতিহাস সহজেই ধরা পড়ে। চিন্তার জগতে সাবালকত্ব অর্জন করতে না পারলে কোনো জাতি দেশে ও কালে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না। তার জন্য তথ্যপূর্ণ ও তত্ত্বনিষ্ঠ প্রবন্ধের প্রয়োজন।

উনিশ শতকের দু-তিন দশক থেকে ছাপাখানার যুগে প্রবন্ধ-নিবন্ধের যথার্থ আবির্ভাব হল, রামমোহন তার সূচনা করলেন। তিনি সুতার্কিক, পক্ষপাতহীন বিচারক ও পরিশীলিত বুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু যাকে আমরা যুক্তিতর্কসমন্বিত আদি-মধ্য-অন্ত্য বিশিষ্ট প্রবন্ধ বলি, সে লক্ষণ তাঁর রচনায় অতি অল্পেই পাওয়া যায়। তিনি মূলত ও প্রধানত ছিলেন মল্লবেশী তার্কিক, 'পলেমিক' লেখায় ধৃতাস্ত্র, তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও পরিশ্রম প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করতেই খরচ হয়ে গেছে। এই ব্রাহ্মণসন্তানকে দেশবাসীর পর্বতপ্রমাণ কুসংস্কার এবং হিমশীতল জাড্যের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের মতো সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে অগ্রসর হতে হয়েছিল। অবশ্য তাঁর অস্ত্র হয়েছিল ক্ষুরধার লেখনী। অবকাশ পেলে হয়তো তিনি পুরো মাপের প্রবন্ধ রচনায় অগ্রসর হতেন এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রাবন্ধিকের গৌরব লাভ করতে পারতেন। যথার্থত বলতে গেলে একথা বলতেই হবে যে, বিদ্যাসাগর থেকেই চিন্তাশীল বাংলা রচনা প্রবন্ধ-নিবন্ধের আকারে আত্মপ্রকাশ করল। তাঁর পরে ও সমকালে অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর আবির্ভাবে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য যথার্থত চিন্তার জগতে পদার্পণ করল। রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর নাম স্মরণে রেখেও বলা যায়— বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। ভাষার প্রগাঢ় প্রকাশভঙ্গী, যুক্তির তীক্ষ্ণবাণে মৎস্যচক্রের চক্ষুভেদ, সাধ্যমতো ব্যক্তিগত প্রবণতার উচ্ছ্বাস বর্জন এবং উদ্দেশ্যের ঋজুতার (directness) শরবৎ গতি— যা হচ্ছে প্রবন্ধের প্রধান লক্ষণ, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই এ-গুণ লক্ষ্য করা যাবে।

অবশ্য কোথাও কোথাও তিনি ব্যক্তিগত প্রবণতার একেবারে উর্ধ্বে উঠেছেন, তা বলা যাবে না। 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্বে'র তত্ত্বগুলি তাঁর সত্তার সঙ্গে এক হয়ে গেছে, যাকে মনতেইন বলতেন consubstantial। অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞান ও সমাজবিষয়ক প্রবন্ধ, ভূদেবের জীবন, পরিবার ও সমাজসম্পর্কিত সংযত রচনা (অবশ্য প্রকাশভঙ্গিমায় চারুত্বের অভাব), রাজেন্দ্রলালের ভাষা-সাহিত্য-ইতিহাস সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন আলোচনা, বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর বুদ্ধিদীপ্ত রচনা—সর্বোপরি গ্রহসনাথ বঙ্কিমচন্দ্র —যিনি উনিশ শতকের বাঙালিকে যুক্তিবুদ্ধির রাজপথে নামিয়েছিলেন। তার প্রধান প্রমাণ বিবিধ প্রবন্ধের দুটি খণ্ড। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গদ্যপ্রবন্ধে আকার ও প্রকার যেমন বিচিত্র, তার স্বাদও তেমনি অভিনব। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, রসের অভিসারই তাঁর একমাত্র অন্বেষ্টব্য। আবেগ, কল্পনা, ছন্দ ও রূপচর্যা যাঁর নিত্যসঙ্গী, সুতরাং রচনারসের দিকেই তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি, তাই প্রবন্ধের মধ্যেও উপমা রূপকের এত ছড়াছড়ি, আবেগের এত লীলায়িত ভঙ্গী। ফলে তাঁর প্রবন্ধে তাঁরই মনের ঝঙ্কার রণিত হয়েছে। তাঁর মনের সঙ্গে একাত্ম হলেই প্রবন্ধগুলির স্বরূপ বোঝা যাবে। তা না হলে তাঁর অনেক প্রবন্ধকে অতিকথন-দোষদুষ্ট মনে হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে পরিমিত, সংহত ও সুসমঞ্জস, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আবেগের সোনার তরীতে উধাও হয়ে যান, তাতে চীনাংশুকে তৈরি কল্পনার পাল তুলে দেন, ক্ষেপণির তালে তালে বাজতে থাকে সুদূরের অনিকেত আহ্বান। তথ্য-তত্ত্ব ও নিরেট বস্তু-উপাদান ক্রমে রসানন্দে পর্যবসিত হয়, বক্তব্য বক্তার মনের রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। হৃদয় তখন যুক্তির দাসত্ব মানতে চায় না। সেই অপার্থিব, অলৌকিক ব্যঞ্জনাময় সুধাসমুদ্রে পাঠক যেন স্বেচ্ছানিমজ্জন কামনা করে, এবং উপলব্ধির এমন একটা তুঙ্গলোকে উপনীত হয় যে, যার থেকে ব্রহ্মাস্বাদ বেশি দূরবর্তী নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ যুক্তিতর্কের অস্ত্রঝন্ঝনা নয়, নিস্পন্দ বস্তুপিণ্ডের স্তূপ রচনা নয়, চিন্তাগর্ভ তত্ত্বজিজ্ঞাসাও নয়। তাঁর প্রবন্ধ তাঁর উপলব্ধিরই প্রকাশ। তাকে যদি বস্তু-উপাদান ও যুক্তিবাদের বাটখারা দিয়ে মাপতে হয়, তাহলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না।

প্রবন্ধ সাহিত্যে আর দুটি প্রতিভার উল্লেখ কবি যাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রের অধিরাজ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) ও প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের নতুন পথ নির্দেশ করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানী, তাত্ত্বিক, দার্শনিক. — তাঁর প্রবন্ধগুলিতে সেই অভিজ্ঞতার নতুন মাত্রা যোজিত হয়েছে। ভাষার পরিমাণসামঞ্জস্য, বক্তব্যের ঋজুতা ও লেখকের নিস্পৃহ চিত্ত একত্রে মিশে গিয়ে বিজ্ঞান ও তত্ত্ববিদ্যাকে নিয়ে যেভাবে কন্দুকক্রীড়া করেছে তাতে তাঁকে প্রাচীন ভারতীয় ও হেলেনীয় মনীষার সার্থক উত্তরসাধক বলে গ্রহণ করতে হবে। আবার অপর দিকে পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে ছিল তাঁর সমপ্রাণ সখ্যভাব। য়ুরোপ যাকে বলবে এনসাইক্লোপীডিক মনীষা, ভারতবর্ষ তাকেই বলেছে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। মনের উত্তুঙ্গ হিমশিলা থেকে পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী একই সঙ্গে নেমে এসেছে, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর প্রবন্ধে তাদের শ্যামল প্রান্তরে মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর মননিষ্ঠ রচনায় কুশাগ্রতীক্ষ্ণ তত্ত্বমানসিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরস কৌতুকরসোজ্জ্বল প্রসন্নতা। পাণ্ডিত্যের নখদন্ত ভেঙে দিয়ে তাকে মনোহারী করার দুর্লভ শক্তি ছিল তাঁর। উনিশ-বিশ শতকের প্রবন্ধসাহিত্যে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) ও বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) তত্ত্বদৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সুদূরপ্রসারী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ— শঙ্কর ও কান্টের দুই ভুজ আশ্রয় করে আত্মসম্বিতের উপাধানে অলস অপরাহু যাপন করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কোনো কোনো স্থলে সহজ প্রসন্নতার চেয়ে দণ্ডপাণি

মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন। সেদিক থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের মন ও মনন সুগভীর প্রত্যয়ে নিমজ্জিত হলেও তাঁর প্রকাশভঙ্গিমায় আছে কান্তাসম্মিত প্রসন্নতা। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮) আর এক আর্ষদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী, কিন্তু বাংলা ভাষা তাঁর বিচরণক্ষেত্র নয় বলে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়নি।

প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ-নিবন্ধকে বিশুদ্ধ বুদ্ধিমার্গ থেকে নিরীক্ষণ করেছিলেন, কিন্তু তা নিছক বুদ্ধির ব্যায়ামে পর্যবসিত হয়নি। কারণ ফরাসী মনের সঙ্গে ছিল তাঁর মিতালি। উইট বা বাক্‌কৌশল, কৌতুক, এপিগ্র্যাম, এ্যান্টিক্লাইম্যাক্স ও শ্লেষ তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত চিন্তাকে পাঠকের শুধু জ্ঞানার্জনী স্পৃহা নয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিকেও পরিতৃপ্ত করেছিল। দেশ-কালের চিরাচরিত সংস্কারকে পরিহার করে তিনি স্ব-ভাবে স্ব-প্রতিষ্ঠ হতে ভালোবাসতেন। তাঁর আরো বড়ো কৃতিত্ব, তাঁর চারিদিকে একটি সহমর্মী ভক্তগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, এবং তাঁর 'সবুজপত্র' হয়েছিল প্রাণসঞ্জীবনী নবীনতার কল্পলতা। তাঁর প্রবন্ধে বুদ্ধির দাহের চেয়ে দীপ্তি বেশী। অবশ্য কোথাও কোথাও ঝঙ্কারের চেয়ে টঙ্কার বেশি তা স্বীকার করতে হবে। পাঠকের মনে তিনি বাক্‌কৌশলের লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেছিলেন এবং বহুকালাশ্রিত প্রবীণতাব জাড্য থেকে রক্ষা করে বাঙালির ভালে তারুণ্যের জয়টীকা পরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। প্রথম প্রথম রবীন্দ্রনাথ ও আরো কয়েকজন নবীন অনুরাগী তাঁকে সমর্থন ও অভিনন্দিত করেছিলেন, কিন্তু সে তীক্ষ্ণ আলো জন্মান্ধদের চিরতমসাবৃত নয়নযুগলে বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। অবশ্য সর্ববিধ রচনায় চলিত বাংলা গদ্যের ব্যবহার প্রচার করলে পুরাতন কোটরে বন্দী প্রবীণের দল 'গেল রাজ্য গেল মান' বলে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। বাঙালির বুদ্ধি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে আবেগের জলাভূমিতে। কংকরখচিত শুষ্ক কঠিন গ্রানাইট শিলা তার হৃৎকম্পের কারণ ঘটায়। ফলে বিশুদ্ধ বুদ্ধি, যুক্তি ও শাণিত বচন সাধারণ বাঙালির পক্ষে গরহজমের মতো অরুচিকর। তাই প্রমথ চৌধুরীর বাক্‌রীতি ও চিন্তাপ্রণালী বাঙালিকে বিস্মিত করলেও অনুপ্রাণিত করতে পারেনি।

দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, সাহিত্যতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিভাগে একালের পাঠকদেব পদচারণা শুরু হয়ে গেছে, পণ্ডিত গবেষকেরাও বাংলাভাষায় আত্মপ্রকাশে আব ততটা কুণ্ঠিত নন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের বুদ্ধির মুক্তি ঘটেছে প্রবন্ধসাহিত্যে। ওদেশে নবীন ও প্রবীণ বুদ্ধিজীবীরা রাজনীতি-আরোপিত সীমাবদ্ধতা এবং মধ্যযুগেব ধর্মীয় গুহান্ধকার থেকে ক্রমে সূর্য-করোজ্জ্বল সমসাময়িক দেশকালে বিচরণের অধিকার অর্জন করেছেন। এপার বাংলায় তা শুরু হয়েছে রামমোহন থেকে, তারপর বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, তারপর প্রমথ চৌধুরীতে পৌঁছে নতুন চেতনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকে বিশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ নানা উচ্চাবচ পথ পার হয়ে চলেছে। অবশ্য কখনো কখনো তত্ত্বকথা গুরুভার হয়ে প্রাবন্ধিক ও পাঠক উভয়েরই শিরঃপীড়ার কারণ ঘটাচ্ছে। কোথাও মস্তিষ্কবাসী নানা তত্ত্ব হালকা চালে পাঠকের মন ভোলাতে চাইছে, কোথাও বা সৌখীন তত্ত্ববিলাসীরা টপ্‌পা-ঠুংরীর চালে লেখনী পরিচালনা করেছেন। তারই পাশাপাশি চলেছে 'রম্যরচনা'-র চুট্‌কি তাল। জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধকে যাঁরা নিষ্ফল বলে মনে কবেন, তাঁরা রম্যচনার পুষ্পবিতানে পদচারণায় অধিক উৎসাহী। প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত রচনা — দু বিভাগেই কিছু অতিরেক চলেছে তা অস্বীকার করা যায় না। অসংখ্য পাদটীকা-কণ্টকিত [illegible] গবেষণাগ্রন্থের ধ্রুপদ-ধামারের বোলে সাধারণ পাঠকের মনে শঙ্কা [illegible] লঘু সুপাচ্য রস পাঠকের মানসিক পাকযন্ত্রকে কঠিন খাদ্য পরিপাকে বাধা দিচ্ছে

অস্বীকার করা যায় না। দেশশুদ্ধ লেখক রম্যরচনায় মেতে উঠলে বুদ্ধির ঘরে কুলুপ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না—যেটি জাতির মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। উপযুক্ত গদ্যশিল্পী এই দুয়ের মধ্যে মিলনের সেতু রচনায় সমর্থ হলে বাঙালিমানসের দ্বৈধভাব ঘুচে যাবে বলে অনুমান করি। কিন্তু স্বাধীনতা- উত্তর বাঙালি পাঠক সম্বন্ধে বোধ হয় সে-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। যে উদারনৈতিক শিক্ষা গত দেড়শ বছর ধরে বাঙালিমানসকে লালন করেছে, সম্প্রতি তার 'দশম দশা' সমাগত, অন্তর্জলীযাত্রারও বড়ো বিলম্ব নেই। কিন্তু সেসব তিক্ত প্রসঙ্গ থাক।

৫

সাময়িক পত্রের সঙ্গে প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ব্যক্তিগত রচনার বিশেষ সংযোগ আছে। যাঁরা ইংরেজি রচনাসাহিত্যের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পরিচিত, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে লণ্ডন শহরের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাকে অবলম্বন করে ব্যক্তিগত রচনা শিল্পরূপ লাভ করেছিল। উইলিয়াম্‌স্‌ (দ্র: 'A Book of English Essays'— W.E. Williams) হিসেব দিয়েছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শুধু লণ্ডন শহর থেকেই ৬০ খানি সাময়িক পত্র (দৈনিক ও সাপ্তাহিক) প্রকাশিত হয়েছিল, যার অন্যতম লক্ষণীয় উদ্দেশ্যে ছিল ব্যক্তিগত নিবন্ধের অবারিত প্রকাশ। গ্রেট ব্রিটেনে অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে পর্যন্ত অনেকগুলি সাময়িক পত্রে নানা ধরনের ব্যক্তিগত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকখানি প্রধান পত্রের নাম উল্লেখ করা যাক : Tatlar, Spectator, Guardian, Rambler, Idler, Observer, Monthly Review, Reflector, Edinburgh Review, London Magazine, Gentlemen's Magazine, Quarterly Review, ·Blackwood, Athaeniam, Chamber's Journal, West Minister's Review, Pall Mall Gazette ইত্যাদি। এই পত্র-পত্রিকাগুলি ইংরেজি ব্যক্তিগত রচনাকে সযত্নে লালন করেছিল। এদেশেও—উনিশ শতকের যা-কিছু আন্দোলন— ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষামূলক, রাজনৈতিক— সবই পত্র-পত্রিকায় প্রবল কণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সমাচার দর্পণ থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, তত্ত্ববোধিনী থেকে বঙ্গদর্শন এবং বঙ্গদর্শন থেকে সবুজপত্র—প্রায় শতবর্ষের (১৮১৮-১৯১৪) সাময়িক পত্রে বিভিন্ন প্রাবন্ধিক নানা গুরুতর বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সবই তত্ত্বমূলক, কোথাও-বা প্রবলভাবে বিতর্ক ও দ্বন্দ্বসঙ্কুল। কিন্তু সবগুলিই হচ্ছে প্রবন্ধসাহিত্য, অর্থাৎ তত্ত্বমূলক ও গবেষণাধর্মী। কেবল বঙ্গদর্শনে কিছু ব্যক্তিগত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভারতী, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ও সাধনায় কোনো কোনো নিবন্ধে স্পষ্টত রচনারসের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যাবে। বলাবাহুল্য তার মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নিকট-আত্মীয়দের রচনা।

একথা বোধ হয় অসঙ্কোচে বলা যেতে পারে, বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য বাঙালি মানসের অর্থবহ ও গূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ সূচীপত্র। ধর্ম-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে একদা সারা দেশেই যে প্রবল আলোড়ন-আন্দোলনের ঝড়ঝঞ্ঝা সৃষ্টি হয়েছিল, তার বিবরণ বিবর্ণ সাময়িক পত্রের মর্মর ধ্বনির মধ্যে আজও শুনতে পাওয়া যাবে।

নানা সঙ্কলনে গ্রথিত প্রবন্ধগুলি বাঙালিচেতনার দলিল বলে স্বীকৃতির যোগ্য। আরো রয়েছে মানবিকী বিদ্যার বিচিত্র বিষয়—ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখা, যেমন—রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান—কত না

বিষয়। যদিও এখনও বাংলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ততটা প্রসার লাভ করেনি, কিন্তু সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে বেশ কিছু গবেষণাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, রাধাগোবিন্দ নাথ, বিমানবিহারী মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী, গোপাল হালদার, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ প্রভৃতি পণ্ডিত, গবেষক ও সমালোচকগণ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, শিবনারায়ণ রায়, কাজী আবদুল ওদুদ, আবু সৈয়দ আইয়ুব-- এঁরাও বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ের নতুন মানদণ্ড প্রস্তুত করেছেন। একালের পণ্ডিত, রসিক ও তাত্ত্বিকেরাও পিছিয়ে নেই, তাঁরাও আমেরিকার Chicago Critics ও Neo-Aristotelian-দের মতো সাহিত্য ও শিল্পবিচারের চিরাচরিত পন্থা ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাহিত্যবিচারে প্রস্তুত হয়েছেন। ভাষাবিজ্ঞানও আর সুনীতিকুমার ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহের দর্শিত পথ ধরে চলতে চাইছে না, চম্‌স্কি ও উত্তর-চম্‌স্কির ঢেউ বাংলা ভাষা ও ধ্বনিবিজ্ঞানে আহৃত হয়েছে --এটিও নবীন গবেষকদের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, প্রবন্ধ ও তত্ত্বগ্রন্থ যদি পরিপক্ক মানসিকতার লক্ষণ হয় তা হলে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য বহুপূর্বেই পৌগণ্ড ও যৌবনসীমা অতিক্রম করে প্রবীণতার অচপল সামঞ্জস্যে পৌঁছে গেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মানসপ্রেক্ষিত

১

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি তর্পণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— "যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে।" সে মশালবাহী হয়ে এসেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, সেই মশালের জ্বলন্ত শিখায় বাঙালির মনঃপ্রকৃতি আলোকিত হয়েছিল ; অতীত, বর্তমান ও ভাবীকালের ইতিহাসের পটে বাঙালি চেতনার স্বরূপ আবিষ্কারে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল অতন্দ্র আকর্ষণ। বস্তুত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্যবিত্ত নাগবিক সমাজের ইতিহাসে উনিশ শতকি রেনেসাঁস বলে যে যুগ স্বীকৃতি লাভ করেছে, তার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, বাঙালি-জীবনচেতনার আলোকদীপ্তি অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য কেউ কেউ একে বাঙালির নবজাগরণ না বলে পুরাতনের পুনর্নবীকরণ (revival) বলতে চান। এখানে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য সে প্রসঙ্গ মুলতবি রাখা গেল। এই জাগরণ বা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি, যাই হোক না কেন, তার চালনসূত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র ধারণ করেছিলেন, তা স্বীকার করা যেতে পারে।

বাঙালির সমাজ, সংস্কৃতি ও মানসিকতার অয়নরেখা বিচার করলে দেখা যাবে, ৭ম শতাব্দীতে শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে বাঙালি-স্বাতন্ত্র্যের প্রথম বিকাশ, পালযুগে খ্রীঃ ৮ম থেকে ১১শ শতাব্দী পর্যন্ত তার সামগ্রিক বিকাশ, সেন বংশের শতখানেক বছরের শাসনে বাঙালির পৌরাণিক সংস্কারের উত্থানের চেষ্টা। কিন্তু ইসলামের অভিযানের ফলে দুশ বৎসরের জন্য বাঙালি হিন্দুর ধর্মকর্ম, আচার-আচরণ, স্মার্তসংস্কার শিথিল হয়ে পড়ল। সেই বিধ্বস্ত, উপদ্রুত জীবনের মরা গাঙে নতুন বান ডাকল। ১৬শ- ১৭শ প্রায় দুশ বছর ধরে চৈতন্যভাবধারা প্রবাহিত ছিল। অবশ্য ক্রমে তার বেগ মন্দীভূত হয়ে এল। তা হলেও চৈতন্যাবির্ভাব ও তার প্রতিক্রিয়াকে, বাঙালির ইতিহাসে প্রথম-রেনেসাঁস বা প্রথম জাগরণ বলে গ্রহণ করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন, 'আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির মানসিক উদ্দীপ্তি হইল? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্মবেত্তা কে? শাস্ত্রবেত্তা কে? দর্শনবেত্তা কে? ন্যায়বেত্তা কে?' তিনিই তার উত্তর দিয়েছেন, 'অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয় ; তারপর রূপ-সনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। এ দিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ। স্মৃতিতে রঘুনন্দন এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাংলা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পূর্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্তিনী যে বাঙালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয়, তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়া; সে কোথা হইতে?' তাকেই বলা যেতে পারে রেনেসাঁস। এর ফলে হিন্দুসমাজের আগল টুটে গেল। উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের ভেদরেখাও অনেকাংশে দূর হল। সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, স্মৃতি-সংহিতার এক নতুন স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠল, এবং এই জনজাগরণই শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বন্দী হয়ে রইল না। পুরী-বৃন্দাবনকে স্পর্শ করার জন্য বাংলার ভাবের বন্যা দূরকেও নিকট আত্মীয়ে পরিণত করল। অবশ্য ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বৈষ্ণব আদর্শ উপধর্মের কবলে পড়ে লোকচক্ষুর অগোচরে সঙ্কীর্ণখাতে বইতে লাগল। বিচিত্র যান-উপযানের তত্ত্ব ও আচারপদ্ধতি মূল বৈষ্ণব মতাদর্শকেই আহত করল। সাহিত্যে নব নব সৃষ্টির ধারাও ক্ষীণ হয়ে গেল।

১৮শ শতাব্দীর গোড়ায় (১৭০৭) ঔরঙ্গজেবের দেহান্ত হলে মুঘল সাম্রাজ্যের বিশাল বনস্পতি শাখাপ্রশাখাসহ উৎপাটিত হল। এদিকে হিন্দু ও মুসলমান সমাজেও গ্রহণ লাগল, পারস্পরিক স্বার্থ খাল কেটে কুমীর আনতেও সঙ্কুচিত হল না। কৃষ্ণনাগরিক ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কামকবোষ্ণ লালসার মণিদীপ্তি ভুজঙ্গদৃষ্টির মতো সমাজকে নীলবিষে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সমাজে, নৈতিক জীবনে, চারিত্রিক আদর্শে, মুর্শিদাবাদের ক্ষয়িষ্ণু চন্দ্রে তখন বলয়গ্রাস শুরু হয়েছে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে দ্বিপ্রহরেই অন্ধকার নেমে এল। তারপর প্রায় অর্ধশতাব্দীর ধরে চলল শাঠ্য-ষড়যন্ত্রের গুহাপথে অধঃপতনের অভিসার। সেই সুযোগে ইংরেজ বণিক, বাংলার প্রাণরস শোষণ করে নিল। দেশের কৃষিজাত পণ্য ও শিল্পদ্রব্য কোথাও লুণ্ঠিত, কোথাও সাগর পারে প্রেরিত, কোথাও বিধ্বস্ত হল। বাংলার মসনদ থেকে নবাব-সুবাদারের দ্রুত অপসরণ, ক্লাইভ ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অঙ্গুলি সঙ্কেতে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে পুতুল নবাবের দশ-পঁচিশের খেলা। ১৭৬৫ সালে কোম্পানির দেওয়ানি লাভ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিষ-নিশ্বাসে বাঙালি কৃষকের চূড়ান্ত দুর্দশা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার এক-তৃতীয়াংশ লোক অন্নাভাবে মারা গেল। তারই মধ্যে জন্ম হল রামমোহন রায়ের (১৭৭২ বা ১৭৭৪), প্রকাশিত হল হলহেডের *The Grammar of the Bengal Language (1778)*, অবশ্য বাঙালি পাঠকের জন্য নয়, 'বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং'। প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীরামপুর খ্রীস্টান মিশন (১৮০০), ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০), কলকাতায় রামমোহনের আবির্ভাব (১৮১৩-১৪), কোম্পানির সনদের পুনর্নবীকরণ (১৮১৩), রামমোহনের প্রথম গদ্যগ্রন্থ (বেদান্ত গ্রন্থ-১৮১৫) প্রকাশ, কলকাতা, স্কুলবুক সোসাইটি (১৮১৭), কলকাতা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮), হিন্দু কলেজ (১৮১৭) ও সরকারি সংস্কৃত কলেজের (১৮২৪) প্রতিষ্ঠা, প্রথম বাংলা পত্রিকা প্রকাশ (সাপ্তাহিক সমাচার দর্পণ -১৮১৮) প্রভৃতি আধুনিক ব্যাপার ক্রমে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে ঝড় তুলল। এক-দিকে রামমোহনের আত্মীয় সভা (১৮১৫), ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮), ডিরোজিও-পন্থী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী, অপর দিকে প্রাচীন পন্থী ধর্মসভা (১৮৩০)। ফলে ত্রিবিধ ভাবের টানাপোড়েনে ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা নিয়ে কলকাতায় তুমুল কোলাহল সৃষ্টি হল, নতুন যুগের নতুন জিজ্ঞাসা চিন্তার আকাশে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিল। যুযুধান দলের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, ভূদেবের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ কেটে গেল সলতে পাকানোয়। ইতিমধ্যে ঈশান কোণে বজ্রবিদ্যুতের মাতামাতি শুরু হল, সিপাহি বিদ্রোহের অগ্নিবাহী পতাকা উচ্চে তুলে হিন্দু-মুসলমান সিপাহিরা কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম জোটবদ্ধ হল। কিন্তু আধুনিক যুগের সঙ্গে দ্বৈরথে মধ্যযুগীয় সিপাহিদের শোচনীয় পরাভব হল। তখন ইংরেজি শিক্ষার ফলভোগী মধ্যবিত্ত বাঙালিসমাজ সিপাহিদের বিদ্রোহের মধ্যে কোনো মহত্তর আত্মদানের পরিচয় পায়নি, সিপাহিদের আচরণের মধ্যে শুধু উৎপাতের আশঙ্কা করেছিল। ইংরেজের ছত্রছায়াতলে নিরাপদ নির্ভর জীবনের আশ্বাস পেয়ে তদানীন্তন য়ুরোপের তুলনায় সিপাহি বিদ্রোহকে তাই শঙ্কিতসমাজ কখনো উদার হৃদয়ে গ্রহণ করেনি। তারা তখন শাসকের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করছিল, ইংরেজ-বর্জিত ভারতবর্ষ তাদের কাছে তখন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল। তবু ঝড়ের সঙ্কেত এল: ভারত-মিত্র জর্জ টমসন 'ইয়ং বেঙ্গল'দের সভায় ঘোষণা করেছিলেন, আন্দোলন ভিন্ন শাসকের কাছ থেকে সুবিচার পাওয়া যাবে না। তরুণের দল পুরাতন বন্দরের বন্ধন খুলে নতুন দিগ্‌দেশের আবিষ্কারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তবে সে দিগ্‌দেশ হচ্ছে তাঁদের মনের জগৎ। অবশ্য তখনও বৃহত্তর উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজে

স্থবিরত্বের জড়তা রয়েই গিয়েছিল। ১৮৩৭ সালে স্থাপিত হল ভূম্যধিকারী সমাজ, অর্থাৎ Zamindary Association, যার মূলে ছিলেন রাধাকান্ত দেব, সত্যচরণ ঘোষাল, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, ভবানীচরণ মিত্র, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, মুনসি আমির, তিনজন ইংরেজ—ডিকেনস্, প্রিন্সেপ ও হেয়ার। এঁরা মনে করেছিলেন, ইংরেজের কৃপাদৃষ্টি পাওয়া গেলে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষিত হবে। এই Zamindary Association পরে হল Landholders' Society, তারপর Bengal British India Society, The British Indian Association ইত্যাদি। ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমে অভিজাত সমাজ ও জমিদারদের হাত থেকে ধীরে ধীরে স্খলিত হয়ে পড়ল এবং মধ্যবিত্ত ইংরেজি-শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় নতুন প্রত্যয় নিয়ে দেখা দিল। তার লক্ষণ ফুটে উঠল নবগোপাল মিত্রের চৈত্র মেলা বা হিন্দু মেলায়। বাংলা সাহিত্যে এই প্রত্যয়ের জ্বলন্ত শিখারূপে দেখা দিলেন—ঈশ্বর গুপ্ত; রঙ্গলাল, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম)— সর্বশেষে বঙ্কিম প্রতিভার উদয় হল। ১৮৬৫ সালে তাঁর দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হল, যার সূচনা পাঠান-মুঘলের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায়। শেষ উপখ্যান— সীতারাম (১৮৮৭)। তারও মূলে মুঘলযুগের শেষ পর্ব (সীতারাম ধৃত ও নিহত -১৭১৪ খ্রীঃ অঃ) বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হল ১৮৭২ সালের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ- ১২৭৯)। সঞ্জীবচন্দ্র, জগদীশ নাথ রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামদাস সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই পত্রিকায় যোগ দিলেন। সাহিত্য, সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন ও রাজনীতি সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র শত আয়ুধ ধারণ করে আবির্ভূত হলেন। তেমনি তাঁর শিষ্যমণ্ডলীও সেই অভিযানে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলেন। লণ্ডনের ইংরেজি সাপ্তাহিক 'Spectator' (1828) যেমন সম্পাদক রবার্ট স্টিফেন রিন্টাউলের (Robert Stephen Rintoul) নেতৃত্বে ইংরেজ মধ্যবিত্ত সমাজের আশা-আকাঙক্ষার প্রতিভূরূপে আবির্ভূত হয়েছিল, এই পত্রিকা প্রকাশের ৪৪ বৎসর পরে সেই আদর্শেই বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হল। বঙ্গদর্শন হল বাঙালির আত্মদর্শনের দূরবীণ। এতে ধারাবাহিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, চন্দ্রশেখর, যুগলাঙ্গুরীয়, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী, রাধারানী প্রকাশিত হয়। শুধু সীতারাম তিন বৎসর ধরে 'প্রচারে' (১২৯১-৯৩) প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী, ইংরেজিতে যাকে বলে রোমান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা, সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ। ... বিষবৃক্ষ কাহিনী এসে পৌছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এল, তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে" (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৮) । বঙ্গদর্শনে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরা দিল। শিল্পী বঙ্কিমের স্বরূপ-পরিচয় জানতে হলে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এই উপন্যাসগুলির সহায়তা নিতে হবে । তেমনি ইতিহাসচেতনা, সমাজবোধ, রাষ্ট্রচিন্তা, নীতি ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাপ্রণালীর পথরেখা অনুশীলন করতে হলে এই বঙ্গদর্শনেই তার সূতিকাগৃহ লক্ষ্য করা যাবে । সাম্য (১৮৭৯, সাম্য ও বঙ্গদেশের কৃষক), কৃষ্ণচরিত্র ১ম ভাগ (১৮৮৩) প্রচারে ধারাবাহিকভাবে (১২৯১) প্রকাশিত হয়, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে প্রথম ভাগ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পরেও আরো কিছু অংশ এই প্রচারেই মুদ্রিত হয় । তারপর ১৮৯২ সালে বিবিধ প্রবন্ধের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এই বঙ্গদর্শনে । ধর্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় নবজীবনের প্রথম সংখ্যা ১২৯১ শ্রাবণ (১৮৮৪) মাসে।

১৮৮৮ সালে 'ধর্মতত্ত্ব প্রথম ভাগ অনুশীলন' নামে প্রকাশিত হয় । বিবিধ প্রবন্ধে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত তিনটি প্রবন্ধ— ভারতকলঙ্ক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, ভারতবর্ষের রাজনীতি। দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্গদেশের কৃষক, বাঙ্গালা শাসনের কাল, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার কলঙ্ক, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ— এগুলি ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস-সম্পর্কিত। বলাই বাহুল্য বাংলাদেশের ইতিহাসই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। সকলেই জানেন, ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের কতটা অনুরাগ ও বহুপঠনের অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর বাল্যকালে এদেশে ইতিহাসের চর্চা শুরু হয়েছিল Royal Asiatic Society of Bengal প্রকাশিত 'Asiatik Research'-এ ভারতবর্ষ ও বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই পত্রে গবেষণা শুরু করেন। অবশ্য ভারতের যথার্থ ইতিহাস জানতে গেলে সংস্কৃত পুরাণ, মহাকাব্য, মুদ্রাতত্ত্ব--বিশেষত সংস্কৃত ভাষায় রীতিমতো অধিকার না থাকলে শুধু ভাসা ভাসা জ্ঞানই সম্বল হবে, কখনো বা ভুল তথ্যও সত্যের বেশে আবির্ভূত হবে। এই জন্য পাশ্চাত্য ইন্ডোলজিস্টদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না। উনিশ শতকের তিন-চার দশকেই ইংরেজ শাসক ভারতবর্ষের যথার্থ পরিচয় সন্ধানের জন্য ইতিহাস সন্ধান করেছিলেন। তাই প্রথমযুগে বালক ও তরুণদের পাঠ্যতালিকায় ইতিহাস স্থান পেয়েছিল। কিছু কিছু মৌলিক রচনাও শুরু হয়েছিল। বিদ্যাসাগর ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারেননি। ভূদেবেরও ইতিহাসে বিশেষ আকর্ষণ ছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর পত্রিকায় প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য, লিপিলেখন প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে ভারতের ইতিহাস সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বাংলার ইতিহাস রচনার বিশেষ আগ্রহ বোধ করেছিলেন। তাঁর পূর্বে বাংলার তথ্যভিত্তিক ইতিহাস রচনায় বাঙালি লেখকের সংখ্যা ছিল অতি পরিমিত। এই জন্য মার্শম্যান ও স্টুয়ার্টের ইতিহাসের কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করে (বিদ্যাসাগর ও ভূদেব) প্রথমে বাংলার ইতিহাস রচনার ভিত্তি তৈরি হয়। কিন্তু তাতে মন তৃপ্তি পায় না, তার মধ্য থেকে বিজয়োদ্ধত ব্রিটিশের অহমিকা দূর হয়নি। তাই সম্ভবত বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র--সকলেই বাঙালির প্রকৃত ইতিহাসের জমি জরীপ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজ ও অন্য বিদ্যায়তনে যে সমস্ত ইতিহাস পড়ানো হত, তাতে শাসকের উন্নাসিকতাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। সাহেবদের গ্রন্থে বাঙালির যথার্থ ইতিহাস আছে কি? তাঁর প্রশ্ন, 'বাঙ্গালার ইতিহাস আছে কি? সাহেবেরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্টুয়ার্ট সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে ছুঁড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শম্যান, লেথব্রিজ প্রভৃতি চুট্‌কিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন। কিন্তু এসকলে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কোনো কথা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই...। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়।' তাই তাঁর উপদেশ, 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালি, তাহাকেই লিখিতে হইবে।'

বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, রাষ্ট্র, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা, সভ্যতার স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিচয় পেতে হলে সর্বাগ্রে ইতিহাসের জ্ঞান আবশ্যক— যে জ্ঞান শুধু রাজা-রাজড়াদের সিংহাসন প্রাপ্তির কাহিনী নয়, যুদ্ধ বিগ্রহ সন্ধির তথ্যও নয়, 'বাদশাহ-সুবাদারের জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং 'খিচুড়ী ভোজনের' গল্পকথাও নয়। ইতিহাস আসলে মাটি ও মানুষের কাহিনী, সেই ইতিহাস জানার জন্য স্বদেশপ্রাণ বাঙালির ইতিহাস উদ্ধার করতে হবে। 'বাঙ্গালার ইতিহাস',

'বাঙ্গালার কলঙ্ক', 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা,' এবং 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ'— মোট এই চারটি প্রবন্ধে তিনি ঘরে-পরে নিন্দিত বাঙালির ইতিহাস সন্ধান করেছেন। 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি', 'বাঙ্গালা ভাষা', 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার'--এই কয়টি প্রবন্ধে বাঙালির পরিবার, সমাজ, আর্য-অনার্য, কোল-দ্রাবিড়, বঙ্গে আর্যায়ন প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনা শুধু ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ধারণের জন্য নিস্পৃহ বস্তুগত আলোচনা নয়, বাঙালির ইতিহাস আসলে এ জাতির বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের বিকাশের ইতিহাস— তারও মূলে বাঙালির শ্রেষ্ঠত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা। কাজেই মিল, স্টুয়ার্ট, মার্শম্যান, লেথব্রিজ এবং মুসলমান ঐতিহাসিকদের পদ্ধতি, অনুসন্ধান ও পরিণাম বিচার তাঁর কাছে অনেক সময় অজ্ঞতা, পরজাতিবিদ্বেষ ও বিজিতের প্রতি বিজেতার স্বাভাবিক দম্ভই প্রকাশ পেয়েছে। সেই বিদ্বেষ, অসূয়া, ঘৃণা ও অনুকম্পা থেকে বাঙালিকে রক্ষার জন্য তিনি ইতিহাসের খনিত্র নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাই কখনো তাঁর আলোচনায় বস্তুপ্রমাণের চেয়ে কল্পনা ও স্বপ্নের ঘোর লেগেছে, কখনো কণ্ঠে তিক্ততা সঞ্চারিত হয়েছে। 'সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন। একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে সে কুলাঙ্গার।' বাঙালির গৌরব আবিষ্কারই তাঁর ইতিহাস আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। ফলে যাকে ঐতিহাসিক নিস্পৃহতা বলে, তিনি তার সবটা গ্রহণ করতে পারেননি। বাঙালির স্বাতন্ত্র্যে (অর্থাৎ হিন্দু বাঙালির স্বাতন্ত্র্য) যে বা যারা আঘাত করেছে, সে মুসলমান হোক, খ্রীস্টান হোক, পাঠান-মুঘল বা ইংরেজ হোক তাঁদের প্রতি তাঁর রসনা ও লেখনী খরতর হয়েছে। এই জন্য তিনি 'সএর মুতাক্‌খরীন'- এর লেখকের প্রতি অশিষ্ট কটূক্তি করেছেন, এই জন্য বলেছেন, 'যে বাঙ্গালী ও সকলকে বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়।' বস্তুত তাঁর বাঙ্গালার ইতিহাস শুধু হিন্দু বাংলার ইতিহাস, মুসলমান শাসন সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না তা স্বীকার করতেই হবে। তখন তিনি জানতেন, 'বাঙ্গালার অর্ধেক লোক মুসলমান। ইহারা অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়,... দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকেরা অর্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।' বাংলার লোকসংখ্যার অর্ধেকই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। অল্প কিছু রাজপাদোপজীবী উচ্চবর্ণ লোভের বশে, কখনও বা প্রাণভয়ে রাজধর্ম গ্রহণ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের সংখ্যা যৎসামান্য। ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্যাদি থেকে দেখা যাবে শুধু শাসকশক্তির অত্যাচার ও ধর্মান্তরীকরণের ফলেই যে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা (হাড়ি, কাওরা, ডোম, মুচি, জেলে, কোচ, পলি ইত্যাদি) দলে দলে ইসলাম ভজেছিল তা নয়। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত হিন্দু উচ্চবর্ণদের ঘৃণা বিদ্বেষও এদের ইসলামের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। পীর, ফকির, মুরশিদ ও সূফী-সাধকদের 'কেরামত' ও অধ্যাত্ম সাধনাও এই সমস্ত নিম্নবর্ণকে আকর্ষণ করেছিল। ফলে উনিশ শতকের মধ্যভাগের মধ্যেই নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের সংখ্যা মোট লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কোন্ কারণে হিন্দুর আশ্রয় ছেড়ে এরা ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করল বঙ্কিমচন্দ্র তার বিস্তারিত পরিচয় দেননি। তিনি বাংলার ইতিহাস সন্ধানে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দু প্রসঙ্গ প্রায় বাদ দিয়ে গেছেন। বাঙালি হিন্দুর ইতিহাস ও সংস্কৃতি বলতে তিনি প্রধানত ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থাদি উচ্চবর্ণকেই বুঝিয়েছেন। অবশ্য 'খিচুড়ী ভোজনের' ইতিহাস সত্ত্বেও পাঠানযুগ সম্বন্ধে তাঁর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি স্বীকার করেছেন, 'পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল।' তাঁর দৃঢ়

বিশ্বাস বাঙালির অধঃপতনের প্রধান কারণ মুঘল শাসন। পাঠানেরা ৩৭২ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। মুঘলদের শাসনকাল অনেক কম। তাঁর মতে 'মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র। মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরেজের শাসন পর্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না, দিল্লী বা আগ্রার ব্যয়নির্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল।' তারপর প্রাসঙ্গিকভাবে প্রশ্ন করেছেন, 'এখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদসাগরে ভাসি, তখন কি কোনো বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে-সকল রাজ্যের রক্ত শোষণ করিয়া এই রত্নমন্দির নির্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য?' আসল কথা, কি পাঠান, কি মুঘল, আর কি ইংরেজ,—যারা বাংলাকে শাসন শোষণ করেছে তাদের ইতিহাস আলোচনায় তিনি যে কিছুটা মাত্রা হারিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ তিনি নিছক ঐতিহাসিক নন, প্রত্নতাত্ত্বিক নন, সন তারিখের হিসাব-রক্ষক নন। বাঙালির আত্মা আবিষ্কারের জন্য তিনি ইতিহাসের সন্ধানে দেশ-কালের মাটি খুঁড়তে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সুতরাং নির্ভেজাল ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। আর তা ছাড়া গত শতাব্দীতে বাংলার ইতিহাসের বস্তুগত উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়নি, যতটুকু হাতে পেয়েছিলেন, ততটুকু অবলম্বন করেই বাঙালির ইতিহাস নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।

২

প্রসঙ্গক্রমে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসচেতনা আলোচনা করা যেতে পারে। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে আমি বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছি বলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর তিনটি মূল প্রবন্ধ নিয়ে (ভারত কলঙ্ক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি) যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করব। ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে তিনি প্রধানত হিন্দু-ভারতবর্ষ, অর্থাৎ প্রাগ-ইসলাম পর্বের ইতিহাস নির্দেশ করেছেন, এবং এই আলোচনায় মুসলমান ও ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেননি। মুসলমান অভিযানকারীরা হিন্দুর স্বাধীনতা চূর্ণ করেছিল, হিন্দুর ধর্ম-কর্ম-সমাজ ও শাস্ত্রানুশাসনের প্রতি ইসলাম ধর্মাবলম্বীর স্বাভাবিক ঘৃণা ও অত্যাচারের কথা মুসলমান লেখকের গ্রন্থেই আছে, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেবাও সে তথ্য গ্রহণ করেছেন। সুতরাং প্রাচীন ভারতের বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত-গীতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হিন্দুসমাজের উপর যখন সেমিটিক জাতির তরবারি নেমে এল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিকের সহিষ্ণুতা আর রক্ষা করতে পারলেন না, মুসলমানের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ক্ষুরধার হয়ে উঠল। কিন্তু ইংরাজশাসনের অপকর্ম সত্ত্বেও তিনি তার প্রতি ততটা খড়্গহস্ত হয়ে উঠতে পারেননি। আগন্তুক ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি উনিশ শতকের উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। ইংরেজি বিদ্যালয়ে এবং শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকের কাছে পাঠ গ্রহণ করে তাঁরা মনে করতেন বাংলার মুসলমান শাসন মধ্যযুগের শোচনীয় দৃষ্টান্ত। ইংরেজ শাসন, দোষত্রুটি সত্ত্বেও, বাঙালিকে নবযুগের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রেরও সংশয় ছিল না। শুধু যে সরকারি চাকুরির জোয়াল কাঁধে ছিল বলে ইংরেজ শাসনের গুণগান করেছিলেন তা নয়। তিনি প্রকৃতই বিশ্বাস করতেন ইংরেজশাসন বিধাতার আশীর্বাদ। তাঁর এই মন্তব্যটি একালের স্বদেশপ্রাণ বাঙালিকে প্রতিবাদে মুখর করতে পারে— 'ইংরেজ ভারতবর্ষের পরম উপকারী; ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে, যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে,

বুঝাইতেছে, যে-পথে কখন চলি নাই সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে, সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য।' এর মধ্যে দুটি ব্যাপারকে তিনি ইংরেজ শাসনের প্রধান কাজ বলেছেন— 'স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা।' আর একটু পরিষ্কার করে বলেছেন, ' আমরা পরাধীন জাতি, অনেক কাল পরাধীন থাকিব— সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই।' নেতৃস্থানীয় কোন্ বাঙালি একথায় সায় দেননি? কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ থেকে, বিশেষত সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকে উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত বাঙালির নাগরিক সমাজে নতুন তরঙ্গ প্রবেশ করলে স্বাতন্ত্র্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা জাতি বা nation হিসেবে এই বিশাল মিশ্র সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে অবহিত করেছিল। ভারতবর্ষের অর্থাৎ হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর চারটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে।

১) এ জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নেই।

২) স্বাতন্ত্র্যলাভের ইচ্ছাও নেই। অবশ্য ইংরেজের ইতিহাস পড়ে নবীনসমাজ এই শতাব্দীর ৮ম দশক থেকে নিজের দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নতুনভাবে চিন্তা শুরু করে।

৩) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য-লাভের অনীহার মূল কারণ ভারতবর্ষের জমির উর্বরতা। একটু মাটি আঁচড়ালেই প্রচুর শস্য জন্মে। জলবায়ুর জন্যও এ জাতি কিছু উদ্যমহীন ও উদাসীন। তাই শক, হূণ, পারসিক, সেমিটিক জাতির আক্রমণ বাধা দিতে পারেনি।

৪) হিন্দু সমজের অনৈক্য, জাতিহিতৈষণার অভাব। তার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস বারবার বাইরের শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ও পর্যুদস্ত হয়েছে। সোমনাথ কতবার লুণ্ঠিত হয়েছে, ভারতবাসী তার বিরুদ্ধে কতটুকু বাধা দিতে পেরেছে? গোটা জাতি সমরক্ষেত্রে আত্মহননকেই বীরত্ব বলে মনে করেছিল। এ এক ধরনের পুরুষের জহরব্রত।

বঙ্কিমচন্দ্র আর একটু ধৈর্য ধরে ভারত ইতিহাসের মূল স্বরূপ সন্ধান করলে অনেক আগেই ভারতসভ্যতার চরিত্র আবিষ্কার সম্ভব হত। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধের প্রথমেই লিখেছেন, 'ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে ছেলেয়,' ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল। একদল যদি বা যায়, কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে— পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরেজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তন স্বপ্নদৃশ্য পটের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা যায় না। ভারতবাসী কোথায়, এ সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।' বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতও কতটা তাই। তবে তিনি হিন্দুভারতবর্ষের সন্ধান করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবাসীর ইতিহাসের তাৎপর্য খুঁজেছেন।

৩

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ, দর্শন ও ধর্মচেতনা সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা যাক। তাঁর ইতিহাস -সম্পর্কিত তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে তিনি প্রধানত হিন্দু-ভারতের ইতিহাস নির্দেশ করেছেন। কিন্তু মধ্যযুগ থেকে ইসলাম ও নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্পর্কে, বিশেষত তার সমাজগত স্বরূপ সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করেননি। বাঙালি সমাজের হাসিম শেখ রামা কৈবর্ত সম্বন্ধে তাঁর পূর্বে আর কোনো লেখক বা

সমাজতত্ত্ববিৎ সহৃদয়তার সঙ্গে আলোচনা করেননি, তাও ঠিক। তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' এদিক থেকে ঐতিহাসিক দিক-নির্ণয় গ্রন্থ। এই দীনদরিদ্র হিন্দু-মুসলমান রায়তের শোচনীয় জীবন বর্ণনা করে বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত বাঙালিকে প্রশ্ন করেছেন, 'বল দেখি চশমা নাকে বাবু, ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ?...আমি বলি, অণুমাত্র নয়, কণামাত্রও নয়। তাই যদি না হইল তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ-দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে, আমা হইতে কোন্ কার্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোনো মঙ্গল নাই।' এখানে লক্ষ্য করা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র যেন য়ুরোপের উনিশ শতকি সমাজবাদীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছেন।

বাঙালি তরুণসমাজের অনুকরণ স্পৃহা তিনি নিন্দা করেছেন, ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর ততটা বিশ্বাস ছিল না। তাই 'অনুকরণ' প্রবন্ধে নব্য বাঙালি চরিত্র সম্বন্ধে তীব্র ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন, "শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণ পটুতা এবং গর্দভ হইতে গর্জন—এই সকল একত্র করিয়া দিঙমণ্ডল-উজ্জ্বলকারী ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট মোক্ষমূলারের আদরের স্থল নব্য বাঙালিকে সমাজ মানসে উদিত করিয়াছে। ... ইহারা সংবাদপত্ররূপ ভাণ্ড ভাণ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে, চাকবিলাঙল কাঁধে লইয়া জীবনক্ষেত্র কর্ষণ পূর্বক ইংরেজ চাষার ফসলের যোগাড় করিয়া দিতেছে, বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কলেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া, চিনির বলদের নাম রাখিতেছে, এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থ সর্ষপ পেষণ করিয়া যশের তেল বাহির করিতেছ।" অনুকরণপ্রিয়,পরপদানত, স্বধর্ম ও স্বসমাজে আস্থাহীন নব্য বাঙালিকে এতটা নির্মমভাবে কেউ আঘাত করেনি। অবশ্য একথাও স্বীকার করেছেন যে, অনুকরণ মাত্রই মন্দ নয়, প্রতিভাহীনের অনুকরণই মন্দ। প্রতিভাহীন বাঙালি যুবসমাজ ইংরেজের সদগুণের চেয়ে মন্দ গুণগুলি বেশি চর্চা করছে। 'অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই।' আসল কথা উদ্যম, ঐক্য, সাহস ও অধ্যবসায়ের অভাবে নব্যশিক্ষিতের অনেকে অনুকরণের কল্যাণকর দিকটি দেখতে পাচ্ছেন না। বাঙালি উচ্চবর্ণের শিরায় শিরায় আর্য রক্ত প্রবাহিত (বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস), তারা বানরের মতো নির্বুদ্ধি হয়ে অনুকরণ করবে তা সম্ভব নয়। তাঁর বিশ্বাস ছিল, মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত যুবকেরা বিবেকবান হবে, ভালোমন্দ বিচার করতে শিখবে, এবং সেই বিচারবোধের দ্বারা অনুকরণের কতটা গ্রহণযোগ্য এবং কতটাই বা পরিহর্তব্য তা নির্ধারণ করতে পারবে। ইয়োরোপীয় সমাজবিবর্তনের ইতিহাস তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। কোঁতের পজিটিভিজম্ বা ধ্রুবদর্শন ও প্রত্যক্ষবাদ এবং বেন্থাম মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজম্ বা হিতবাদ ও উপযোগবাদ তাঁকে দীর্ঘ দিন আবিষ্ট করে রেখেছিল। এই মতাদর্শের বলেই 'সাম্য' ও 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচিত হয়। পরে তিনি 'সাম্য' পুনর্মুদ্রিত করেননি, শুধু তার অংশবিশেষ 'বঙ্গদেশের কৃষকে' গ্রহণ করেছিলেন। শেষ জীবনে তিনি স্বীকার করেছেন, 'এক সময়ে মিলের আমার উপরে বড় প্রভাব ছিল, এখন সেসব গিয়াছে.. সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।' ধ্রুববাদ ও হিতবাদ তাঁকে এতটা আবিষ্ট করেছিল যে, 'দেবীচৌধুরানী'র (১৮৮৪) মটো হিসেবে কোঁতের 'Catachism of Positive Religion'

থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। 'ধর্মতত্ত্বে'ও বহু স্থলে কোঁতের তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের প্রতি গভীর আকর্ষণ সূচিত হলে প্রত্যভিজ্ঞামূলক দর্শন (empirical philosophy), হিতবাদ -ধ্রুববাদ প্রভৃতির প্রভাব তাঁর চিন্তা থেকে ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে যায়, এবং হিন্দুর শাস্ত্রসংহিতা ও ভক্তিদর্শন সেই শূন্যস্থান পূরণ করে। কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার্য, তাঁর মননপ্রকৃতি প্রধানত যুক্তিবাদী এবং তিনি নিজে জ্ঞানবিশ্বাসের দিক থেকে বিবেকবান । জীবনকে তিনি বৈরাগ্যের দৃষ্টিতে দেখেননি । সমস্ত মনুষ্যপ্রবৃত্তির সামঞ্জস্যই মানবধর্ম, জীবনের আদর্শ । কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্বে সে কথাই নানা দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন । কৃষ্ণচরিত্র প্রথমে (প্রথম ভাগ১৮৮৬), তারপরে ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সীলির (Sir John Robert Seeley, 1834-95) ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত Ecce Homo ('Behold the Man') গ্রন্থে যিশু খ্রীস্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকৃত হয়েছিল । তিনিই 'Religion of Culture'-এর জনক । "The substance of religion is culture".– তাঁর এই ছত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রকে মনোজীবনের তাৎপর্য বিচারে নতুন দৃষ্টি দিয়েছিল। সে কথাই তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' গুরু-শিষ্যের আলোচনার মারফতে ব্যাখ্যা করেছেন । কৃষ্ণচরিত্র রচনার সময়েও এ তত্ত্ব তাঁর চিন্তায় ছিল, যদিও ধর্মতত্ত্ব তার দু'বছর পরে প্রকাশিত হয় । অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব মূল তত্ত্ব এবং কৃষ্ণচরিত্র তার ফলিত ব্যাখ্যা । কৃষ্ণের অলৌকিক আবরণ খুলে নিয়ে লৌকিক বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে বঙ্কিম তাঁকে সীলি-কথিত Religion of Culture-এর মূর্ত প্রতীক বলে মনে করেছিলেন । এখানে ধর্মসম্বন্ধে কয়েকজন দার্শনিকের মত উদ্ধার করি । কাণ্টের মতে : "Religion is morality." ফিক্‌টে বলেছেন, "Religion is knowledge."হেগেল বলেন, "Religion is or ought to be perfect freedom; for it neither more or less than the divine spirit, becoming consious of himself through the finite spirit." ম্যাকসমুলার বলেছেন, "Religion is a subjective faculty for the apprehension of the Infinite.." মিল যদিও নীতিবাদী এবং কতকাংশো ধর্মবিরোধী, তবু ধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন, "The essence of Religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence and is rightfully paramount over all selfish objects of desire." কোঁতের মতে, "Religion consists in regulating ones's individual nature and forms the rallying point for all separate individuals."

কৃষ্ণচরিত্র পরিকল্পনায় পাশ্চাত্য দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের এই সমস্ত চিন্তাপ্রণালী তাঁর মনে ছিল। ১৮৭৩ সালে বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বর্ষে গ্রন্থ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি কৃষ্ণচরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন, তৃতীয় বৎসরে (১৮৭৫) আর একখানি গ্রন্থালোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণচরিত্রের আভাস তখন তাঁর মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কৃষ্ণচরিত্র বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বাসুদেবকে মহাভারত ও পুরাণ থেকে উদ্ধার করে যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে আলোচনা শুরু করেন, এবং ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে কৃষ্ণচরিত্র 'বিবিধ সমালোচন' প্রবন্ধ সংগ্রহে গৃহীত হয়, আবার পরিত্যক্তও হয়। অবশেষে 'প্রচার' ও 'নবজীবনে' কৃষ্ণবিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। ১২৯১-৯৩ বঙ্গাব্দে 'প্রচারে' প্রকাশিত হয়, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৮৮৬), এটি 'কৃষ্ণচরিত্রে'র প্রথম ভাগ। ১২৯৩ বঙ্গাব্দের প্রচারে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হয়, তার পর ইংরেজি ১৮৯২ সালে 'কৃষ্ণচরিত্র' একখণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ প্রায় আগাগোড়া নতুন রূপ ধরেছে। ১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবনে' তাঁর 'ধর্মজিজ্ঞাসা' প্রকাশিত হয়, এর থেকেই 'ধর্মতত্ত্বে'র উদ্ভব হয়,

এই গ্রন্থ ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত হয় কৃষ্ণচরিত্রের প্রায় দু বছর পরে। এটি কিন্তু প্রথম ভাগ। হয়তো দ্বিতীয় ভাগ লিখবেন বলে ধর্মতত্ত্বের প্রথম সংস্করণে এটিকে প্রথম খণ্ড বলেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড লিখবার আর সময় পাননি। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলেছেন, 'আগে অনুশীলন ধর্ম পুনর্মুদ্রিত তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলে ভাল হইত। কেন না অনুশীলন ধর্মে যাহা তত্ত্বমাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তাহাব পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।' অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব থিয়োরি, কৃষ্ণচরিত্র সেই থিয়োরির বাস্তব ব্যাখ্যা।

ভারতবর্ষের সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে কৃষ্ণচরিত্র নানা ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কখনো রাখালবালক, কখনো বাল্য শৈশবেই অমিত শক্তিধর, কোথাও বল্লবীনাথ, গোপীজনবল্লভ, উত্তরজীবনে ক্ষত্রিয় নৃপতি, মহাভারত যুদ্ধের সূত্রধার। তাঁর উপদেশে পঞ্চ-পাণ্ডব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়ী, অধর্মের স্থলে ধর্মের স্থাপনা। গীতায় তিনিই শ্রীভগবান। তাঁকে কেন্দ্র করে কত কাহিনী, কত ভক্তিরসের উৎসব, কত আদিরসের সারাৎসার। তাই গড়ে উঠেছে অতিরঞ্জন, অলৌকিকতা, অপ্রাসঙ্গিকতা, প্রক্ষেপ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন। তাঁর প্রকৃত চরিতকথা যথার্থ কী ধরনের ছিল, তা একালে বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য। ঐতিহাসিক মহলে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। নারায়ণ, বিষ্ণু, দেবকীপুত্র, বাসুদেব, ঘোর-অঙ্গিরসের শিষ্য কৃষ্ণ, সাত্বত বংশের বাসুদেব—এঁরা কীভাবে এক হলেন তা বিস্ময়ের বিষয়। চালুনি দিয়ে ছেঁকে চাল ও তুষ পৃথক করা যায়। কৃষ্ণচরিত্র বিচারপ্রসঙ্গে তিনি যে চালুনি ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে যুক্তি ও বিবেক। কৃষ্ণচরিত্রের যে বর্ণনা তাঁর কাছে যুক্তিবিরোধী মনে হয়েছে তাকে তিনি অম্লানবদনে পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু সর্বত্র যে সফল হয়েছেন তা মনে হয় না। কৃষ্ণের বাল্য ও গোপীলীলা তিনি প্রথমে বাদ দিয়েছিলেন; ভেবেছিলেন, এ-সব বর্ণনা পুরাণকারদের কারসাজি। বিশেষত বিবাহিতা গোপবধূদের নিয়ে কৃষ্ণের শৃঙ্গার ও রাসলীলা তাঁর মতে অতি দূষ্য। কিন্তু তারপরে তা স্বীকার করেও তার নখদন্ত ভেঙে দিয়েছেন। কোথাও রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন—যেমন কালিয়দমন। রাসলীলা বস্ত্রহরণ ইত্যাদি ঘটনা কৃষ্ণকথাকেন্দ্রিক পুরাণেই আছে, এই পরদারাভিমর্ষণ কীভাবে গলাধঃকরণ করা যাবে? বাধ্য হয়ে তাঁকে এইভাবে সান্ত্বনা পেতে হয়েছে, 'এসকল পুরাণকার কল্পিত উপন্যাস মাত্র। ইহার কিছুমাত্র সত্যতা নাই।' এযুগের পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রের এ অভিমত নাও স্বীকার করতে পারেন। পুরাণে যদি এমন কিছু থাকে যা একালের সমাজ ও নীতিবিরোধী, তা বলে তাকে উপন্যাস বলে পরিত্যাগ করতে হবে একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। তা হলে কুন্তীর কুমারীকালীন গর্ভধারণ, কানীনপুত্র ব্যাসদেব—মাতার আদেশে তিনি ভ্রাতৃবধূদের গর্ভ সঞ্চার করেন। চন্দ্র-তারা-বুধ সংক্রান্ত কাহিনী, রামায়ণে ইন্দ্র-অহল্যা প্রসঙ্গ, তারা চন্দ্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে কিছু প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু অহল্যা স্বেচ্ছায় ইন্দ্রের কাছে আত্মদান করেছিলেন ('দেবরাজ রতিকুতূহলাৎ') তাও উপন্যাস বলে পরিত্যাগ করতে হবে? একালের জ্ঞান-বিশ্বাস ও যুক্তিবুদ্ধিকে একমাত্র মাপকাঠি ধরে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-উপপুরাণ থেকে তুষ দূর করতে হলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। যাই হোক, এখানে সে প্রশ্ন আলোচনার প্রয়োজনা নেই। কৃষ্ণচরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি নিজে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি, সে বিশ্বাস আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্বী করিবার জন্য কোন যত্ন পাই নাই।' তাঁর এ মন্তব্যের অন্তরালে

স্ববিরোধ উঁকি মারছে। একদিকে তিনি কৃষ্ণের মানবচরিত্র প্রতিষ্ঠিত করছেন, অপর দিকে তাঁকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করছেন। অর্থাৎ যুক্তির চেয়ে বিশ্বাস অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি, গোটা উনিশ শতকটাই বাঙালির স্বতঃবিরোধিতায় ভরা। সতীদাহ-প্রথা বিলোপের জন্য যে রামমোহন সারা দেশে বহ্নিদাহ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই তিনি সতীদাহ প্রথা বিরোধীদের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করতে চাননি। নিরীশ্বরবাদী ও বস্তুবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত শেষজীবনে দেবমন্দিরে যেতেন, নব্যতন্ত্রের নেতা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ (বর্ধমানের বিধবা রানীকে বিবাহ করেন) করে কলকাতায় যে সমাজবিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, সেই তিনি শেষজীবনে রক্ষণশীল হিন্দু আচার-আচরণের কোটরে প্রবেশ করেছিলেন । নাস্তিক বা সংশয়বাদী বিদ্যাসাগর জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে কোনো এক মুসলমান বাউলের আধ্যাত্মিক গানে সান্ত্বনা পেতে চাইতেন। এই স্বতঃবিরোধ এযুগের শিক্ষিত সমাজেও লক্ষ্য করা যাবে । এর কারণ— চতুর্বিধ মূল্যবোধের (সংস্কৃত ভাষা-বাহিত পৌরাণিক মানসিকতা, বাঙালির নিজস্ব প্রাগৈতিহাসিক কুলধর্ম, অর্থাৎ অস্ট্রিক সংস্কার, ইসলাম এবং আগন্তুক পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের সংঘাত) যথার্থ মিলন হয়নি। ইসলামকেও বাঙালি হিন্দু আত্মস্থ করতে পারেনি, বরং বহু সংখ্যক অন্তেবাসীকে মুসলমানের কোলে ঠেলে দিয়েছে । সে যাই হোক, ভগবদ্গীতার অনুবাদের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "যাঁহারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় পূর্বপণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।" এখানেই তাঁর চিন্তার মৌলিকতা ।

কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্ব দু'খানি গ্রন্থই বঙ্কিম-মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান তাঁহার ধর্মতত্ত্ব ।" ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন তত্ত্বের (Religion of Culture) ফলিতরূপ হলেও, এবং এর পিছনে সীলির প্রভাব থাকলেও ধর্মতত্ত্বের মূল কথা বা শেষ কথা ঈশ্বরভক্তি । প্রশ্নে যার শুরু, প্রাপ্তিতে তার সমাপ্তি । ধর্মতত্ত্বের গুরু নিজের কথা এইভাবে বলেছেন, "অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত— এ জীবন লইয়া কি করিব, লইয়া কি করিতে হয় ? সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুঁজিয়াছি । উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে।" গুরু সারাজীবন ধরে মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণাম সন্ধান করেছেন, বহু গ্রন্থ পড়েছেন, বহু মানুষের সঙ্গ করেছেন । তাই বলেছেন, "এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই ।" "জীবন লইয়া কি করিব?" "এ প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি ।" এই ঈশ্বরভক্তির কেন্দ্রপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে শুধু এক অঞ্জলি ভক্তি নিবেদন করেই বঙ্কিমচন্দ্র সন্তুষ্ট হতে পারেননি, চিন্তা, যুক্তি, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ঈশ্বর বলেই গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণচরিত্র বিচার প্রসঙ্গে মহাকাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে তিনি একদিকে কৃষ্ণের মধ্যে সর্বগুণান্বিত মানবধর্ম লক্ষ্য করেছেন, অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সাধ্যসাধনে পরিণত হয়েছেন। মিল-বেন্থাম কোঁৎ, ধ্রুববাদ, হিতবাদ—সবই একটি চেতনায় মিশ্রিত হয়েছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণ। এই তত্ত্বকে নব ভক্তিভাবের দিক থেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তার সূচনা হয়েছিল তাঁর শেষ আলোচনা ভগবদ্গীতার টীকা ভাষ্য রচনায়। কিন্তু অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার পরেই প্রয়াত হন। এই ভাষ্যেই তাঁর পরিপক্ক চিন্তা ও তত্ত্ব নতুন দিগ্‌দেশে সম্প্রসারিত হচ্ছিল। তিনি পাশ্চাত্য যুক্তিমার্গ ও ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রে

সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং দুটিরই সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন, গীতাভাষ্য সম্পূর্ণ করতে পারলে পুরাতন কালের আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী, রামানুজ, মধুসূদন সরস্বতী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং আধুনিক কালের তিলক ও শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারা ও ভাষ্যপ্রণালীর তুলনামূলক আলোচনায় গীতারহস্য অনেকাংশে উন্মোচিত হতে পারত। বিদেশের অনেক পণ্ডিত ও তাত্ত্বিক নানাভাবে গীতা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু রাজনীতির বর্ত্মে চলতে অভ্যস্ত U. N. O.-র প্রাক্তন (প্রয়াত) সেক্রেটারী-জেনারেল দ্যাগ হ্যামার শিল্ড গীতা সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে এই ভক্তি ও তত্ত্বদর্শন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষকে কতটা প্রবুদ্ধ ও আশ্বস্ত করতে পারে। তাঁর অভিমতের একাংশ উল্লেখ করি।

"Bhavadgita echoes an experience of all ages and all philosophies when it says— work with anxiety about results is far inferior to work without such anxiety, in calm self-surrender. Those words expressed deep faith and we will be happy if we can make that faith ours in all our efforts."

এই 'self-surrender'-ই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের অন্বিষ্ট। বঙ্কিমপ্রতিভা যে কতটা মৌলিক তা তাঁর কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্ব থেকেই অনুধাবন করা যাবে। তিনি দুটি লেখনী ব্যবহার করেছে, একটি রসের; অপরটি জ্ঞানের। দুটিতেই তিনি স্বচ্ছন্দচারী। একশ বছর হল তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়েছে, শতবর্ষ পরেও দেখছি তিনি এখনও সমভাবে প্রাসঙ্গিক।

'শিক্ষার মিলন' ও 'শিক্ষার বিরোধ'
রবীন্দ্র-শরৎ প্রসঙ্গ

১৮৯৩ সালে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ দিয়া যাহার সূচনা, ১৯৩৭ সালে 'ছাত্রসম্ভাষণে' তাহার পরিসমাপ্তি। প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ তেইশটি প্রবন্ধ, আলোচনা, ভাষণ, অভিভাষণ ও সমালোচনায় শিক্ষার তাত্ত্বিকতা ও প্রয়োগগত সমস্যা লইয়া সুদীর্ঘ, সুশৃঙ্খল ও যুক্তিক্রমানুসারী আলোচনা করিয়াছেন। প্লেটোর 'Republic' হইতে আরম্ভ করিয়া রোমের পণ্ডিতদের অধীনে Trivium অর্থাৎ ত্রিবিদ্যা (ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র) এবং তাহার সীমা বাড়াইয়া Quadrivium অর্থাৎ চতুর্বিদ্যার (জ্যামিতি, গণিত, সংগীত, জ্যোতির্বিদ্যা) প্রচারকগণ যেভাবে শিশু, বালক ও তরুণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা তাহার মতো সংকীর্ণ খাতে বহমান নহে। মধ্যযুগের 'literator' অর্থাৎ স্কুলমাস্টারগণ য়ুরোপীয় বালকদের কতটুকু শিখাইতে পারিত? ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকারের যৎকিঞ্চিৎ, কাব্য, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র এবং গ্রীকভাষা— এই পর্যন্ত তাঁহাদের শিক্ষাব্যবস্থার পরিসর। বোধহয় কুইন্টিলিয়নের (খ্রীঃ ৪০-১০০ অব্দ) ইনস্টিটিউশন অরাটোরিও-তে সর্বপ্রথম শিশুশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বয়স্ক শিক্ষার ক্রম ও প্রণালী ব্যাখ্যাত হইত। রেনেসাঁসের যুগে ইরাসমাস (১৪৬৭-১৫৩৬), মেলাংথন (১৪৯৭-১৫৬০) এবং তাঁহাদের শিষ্যপ্রশিষ্যের দল লাটিন ভাষা শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। ক্রমে য়ুরোপে, বিশেষত ইংল্যাণ্ডে হেলেনিক সংস্কৃতির মূল বাণী অর্থাৎ মানবতন্ত্রবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রসারিত হইল। কোমেনিয়াস (১৫৯১-১৬৭১) শিক্ষাসংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থ লিখিয়া স্কুলমাস্টারদের শিক্ষাপদ্ধতিকে অনেকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে পেস্টালোৎজি (১৭৪৬-১৮২৭) এবং ফ্রোয়বল্ (১৭৮২-১৮৫২) তাঁহার অনেকগুলি রীতিপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশুকে ক্রমে ক্রমে শিক্ষার অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের মধ্য দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে হইলে তাহার মানসিক প্রবণতা সর্বাগ্রে লক্ষ্য করিতে হইবে। বোধ হয় রুশো (১৭১২-১৭৭৮) সর্বপ্রথম তাঁহার *Emile* (১৭৬২) গ্রন্থে শিশুর মানসিক প্রবণতার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়াছিলেন। পেস্টালোৎজি তাঁহার রচনা হইতে শিক্ষার বাস্তব দিকটি উপলব্ধি করিয়া শিশুকে তাহার শিশুত্বের মধ্যে শিক্ষাপ্রকরণ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পেস্টালোৎজির শিক্ষাদর্শই ফ্রোয়বলের নিয়মপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ক্রমপর্যায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁহার মতে, শিশু, বালক ও তরুণ তখনই যথার্থ শিক্ষা লাভ করে, যখন শিক্ষক তাহাদের বয়োধর্ম ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হন। বালক-বালিকাদের যথাযথ পরিবেশে স্থাপন করিতে পারিলে তাহারা সহজেই কাজ ও খেলাকে একসূত্রে মিলাইতে পারিবে। অর্থাৎ শিক্ষাকে তাহারা জুজুর মতো ভয় করিবে না এবং খেলাকেও লঘু মুহূর্তের পলায়নী অবকাশ বলিয়া মনে করিবে না।

মারিয়া মন্টেসোরি (১৮৭০-১৯৫২)১৯০৬ সালের দিকে জড়বুদ্ধি বালক-বালিকার শিক্ষা ও মনঃপ্রকৃতির গঠনের জন্য যে বৈজ্ঞানিক মনোবিদ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ১৯০৯ সালের দিকে শিশুশিক্ষা ও মনের গঠনে তাঁহার পদ্ধতি পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। শুধু

য়ুরোপ-আমেরিকায় নহে, এ দেশেও (মাদ্রাজ, করাচি, সিংহল, পুনা) শিশুশিক্ষার পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিকে নূতনভাবে সঞ্জীবিত করা হয়। তাঁহার মতে শিশু ও বালকের শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য হইবে তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও কল্পনার নির্বাধ বিকাশের সুযোগ দান। একালে তাঁহার পদ্ধতি স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, কোমেনিয়াস, পেস্টালোৎজি, ফ্রোয়বেল্ এবং মন্টেসোরি শিশু ও বালক-বালিকার শিক্ষাসংক্রান্ত যে-সমস্ত রীতিপদ্ধতির কথা বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তৎ-সংক্রান্ত কেতাবি বিদ্যা আয়ত্ত না করিয়াও বালকদের শিক্ষাকে যে-রীতিতে চিন্তা করিয়াছিলেন তাহার সহিত শিশুশিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের অভিমতের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। অথচ তিনি বৃত্তির দিক দিয়া শিক্ষাব্যবসায়ী ছিলেন না।

বাল্যকালে শিশুশিক্ষা নামে যে খাঁচার মধ্যে তিনি কিছুদিন বন্দী-জীবন যাপন করিয়াছিলেন তখন হইতেই এই -সমস্ত শিক্ষাপ্রণালীর অভিশাপ নিদারুণভাবে ভোগ করিয়াছিলেন। তাই দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মচর্য আশ্রম খুলিয়া, বালশিক্ষার নূতন পরিবেশ রচনা করিয়া হাতেকলমে শিক্ষার জীবন্ত রূপটি প্রত্যক্ষ করিবার অভিপ্রায়ে দীর্ঘ দিন ধরিয়া যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন তাহাই প্রায় অর্ধশতাব্দী (১৮৯৩-১৯৩৭) ধরিয়া নানা প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও আলোচনায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিক্ষা যে বৃত্তি শিখাইবার কল নহে, বাঁধা বুলি মুখস্থ করিয়া ইহজগতে সাফল্যলাভের একমাত্র চাবিকাঠি নহে এই কথাটা সমগ্র জীবন ধরিয়া তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেশীয় বাসকের সঙ্গে বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতির জোড়কলম বাঁধিবার হাস্যকর অবস্থাটা তিনি নানাভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। শিক্ষার মান, ভাষা, বিষয় ও পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত, শিক্ষক ও ছাত্রের মানসিক গঠন, প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্কই বা কী, এই সম্পর্কে তিনি শুধু অলস চিন্তায় অবসর যাপন করেন নাই, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে বিশ্বভারতী স্থাপনা পর্যন্ত, শিক্ষার নানা রূপ ও রীতি তিনি হাতেকলমে পরীক্ষা করিয়াছেন। যাঁহারা বাঁধাপথের শিক্ষাবিধি ধরিয়া নিরাপদ জীবনের সৌধ রচনা করিতেন, তাঁহারা মনে করিলেন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা কবিজনোচিত কাল্পনিকতা মাত্র। তিনি যে প্রাচীন ভারতের আশ্রম ও গুরুকুলকে আধুনিক জীবনের ইট-কাঠ-পাথরের মধ্যে আনিতে চাহিতেছেন তাহাও দুরাশা এবং একপ্রকার রোমান্টিক অতীতচারিতা, যাহাতে মেঘডম্বর যতটা আছে, বর্ষণ ততটা নাই। কিন্তু এই-সব সংশয়ীদের চিন্তার দুর্বলতা ও সিদ্ধান্তের ভীরুতা ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে, রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রস্তাব শুধু সমর্থন করেন নাই, কাজেও দেখাইয়াছেন। আরো দেখাইয়াছেন, বিজ্ঞান শুধু পরীক্ষাগারের চারি দেওয়ালের মধ্যে নাই, তাহার স্থান ক্লাসঘরের বাহিরে, হাটে মাঠে, মাটিতে। আমাদিগকে ভারতের নিজস্ব ধাতুপ্রকৃতি অনুসারে আধুনিক জীবনে চলিবার উপযোগী শিক্ষাকে একসূত্রে বাঁধিতে হইবে। ইংরাজি আমাদের মাতৃভাষা নহে, প্রাণপণ চেষ্টা করিলে ইহা কোনোদিনই আমাদের প্রাণের ভাষা হইতে পারিবে না, বড়ো জোর কাজের ভাষা হইবে। কিন্তু পশ্চিম দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া শুধু প্রাচীনভারতের হোমধূমপূত এবং বেদধ্বনিমুখরিত স্বপ্ন দেখিলেই চলিবে না, ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞানভাণ্ডারও আয়ত্ত করিতে হইবে। অন্নং বহু কুর্বীত বলিলেই অন্নের সমস্যা মিটিবে না, তাহাকে বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া ভূরিপরিমাণে ফলাইতে হইবে। তাহার জন্য মাটি, হালবলদ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন য়ুরোপের ভূমি ও কৃষিবিজ্ঞান এবং পরিবেশ-বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এ দেশের জলবায়ু মাটির সহিত সেই লব্ধ বিদ্যাকে মিলাইয়া দিতে হইবে।

শাস্ত্র বলিতেছেন অবিদ্যার সাধনা করিয়া মৃত্যু উত্তীর্ণ হইবে, তার পর বিদ্যার সাধনা--অমৃতের সাধনা। বস্তুবিদ্যা, যন্ত্রবিজ্ঞান, ভিষকশাস্ত্র—আরো নানা বিদ্যা, শাস্ত্র, বিজ্ঞান, যাহা

হয়তো অধ্যাত্মবিদ্যা নহে এবং তদ্দ্বারা অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করাও যায় না। কিন্তু তাহার সাধনা না করিলে পঞ্চভূতাত্মক দেহটাকে কীভাবে রক্ষা করা যাইবে? ব্যাধি. পীড়া, বিপর্যয়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি শীততাপের পীড়ন, জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন, মহামারী—ইহাদের আক্রমণ হইতে দুর্বল দেহযন্ত্রটাকে কীভাবে রক্ষা করা যাইবে? দেহ নিপাত গেলে অধ্যাত্মবিদ্যা দাঁড়াইবে কোথায়? আত্মার যেমন দেহ-আধারের প্রয়োজন, তেমনি দেহকে রক্ষা করিবার জন্য অ-বিদ্যার অনুশীলনও প্রয়োজন। আমরা অধ্যাত্মবাদী বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ইষ্টনাম জপ করিলে মৃত্যু ছাড়িয়া দিবে না। একদা ভারতবর্ষ অবিদ্যারও যথেষ্ট চর্চা করিয়াছিল, নাস্তিক ও সংশয়বাদীদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না; লোকায়তিক, বার্হস্পত্য, চার্বাকপন্থীরা তো কোনো পারমার্থিক-সত্তাকেই মানিত না। বস্তুর বাহিরে সত্য নাই, এমন কথা বলিতেও কেহ কেহ কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ—সবই প্রত্যক্ষ জীবনের ব্যাপার। অধ্যাত্মশাস্ত্রের পার্শ্বেই কামশাস্ত্র বুক ফুলাইয়া বসবাস করিয়াছে। উপনিষদ গীতার সঙ্গে অনঙ্গরঙ্গ ও কুট্টিনীমতম্ টীকা-টিপ্পনীসহ অবিরোধে ঘর বাঁধিয়াছে। শুনা যায় মণ্ডনমিশ্রের বিদুষী পত্নী উভয়ভারতী তর্কে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে আজন্ম ব্রহ্মচারী শঙ্করাচার্যকে কামশাস্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি গূঢ় প্রশ্ন করিলে আচার্য তাহার যথোচিত উত্তর খুঁজিবার জন্য একবৎসর সময় চাহিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হইতেছে সেকালের সমাজে বিদ্যা ও অবিদ্যা, অন্যকথায় পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা ভাই-বোনের মতো পাশাপাশি বাস করিত। সুতরাং জীবনের শিক্ষা পুরা করিতে হইলে বিদ্যা ও অবিদ্যা—দুয়েরই চর্চা করিতে হইবে। গার্হস্থ্য-আশ্রমবাসী ব্যক্তি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সমভাবে প্রত্যেকটির সেবা করিবেন, যিনি কেবল একটিতে (হোক তাহা মোক্ষ) লগ্ন হইয়া থাকেন শাস্ত্র তাঁহাকে জঘন্য বলিয়াছেন। অতএব আধুনিক ভারতবর্ষকে যদি আত্মশক্তিতে জাগ্রত করিতে হয় তাহা হইলে বলা ও অতিবলা দুই মন্ত্রেরই সাধনা প্রয়োজন। একটিতে পার্থিব শক্তি, অপরটিতে আত্মার বিকাশ। দুই পদক্ষেপে মানুষের চলা অব্যাহত থাকে, গতিটি সুষ্ঠু হয়, চলাকে বাদ দিয়া যাহারা স্থাণুত্বের সাধনা করে, তাহারা 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট : ন পূর্ব ন পর'—হইয়া মূঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়। অপর দিকে যাহারা উদ্দাম অনিবার চলাটাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে তাহারা দিনশেষে হিসাব করিলে দেখিবে, তাহারা একস্থানে খাড়া থাকিয়া চলার ভান করিয়াছে। মনে হইতেছে, চলিতেছি, আসলে 'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।' যিনি স্থিতধী, সত্যসন্ধ ও সিসৃক্ষু, তিনিই যথার্থ গতি ও বিরতির সামঞ্জস্য করিতে পারেন। শিক্ষার অর্থ—এই দুই বৈপরীত্যের স্বাঙ্গীকরণ। রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে শিক্ষার মিলন শীর্ষক প্রবন্ধে সুচিন্তিত যুক্তিক্রমের সাহায্যে এই মিলন দেখাইতে গিয়া বিপাকে পড়িয়াছিলেন এবং শরৎচন্দ্রের কলমের খোঁচায় কিছু বিব্রত বোধ করিয়াছিলেন, এইবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

২

রবীন্দ্রনাথ ১৯২০ সালের ১২ মে হইতে ১৯২১সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি—প্রায় চৌদ্দ মাস য়ুরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া ১৬ জুলাই শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিদেশে বাস করিয়া তিনি পশ্চিমের প্রাণবহুল কর্মযজ্ঞ ও শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত নিকট হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভারতে তখন অসহযোগ আন্দোলনের যুগ, খিলাফৎ আন্দোলন চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিলেও তাঁহার কোনো কোনো কর্মপন্থা সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন 'I refuse to waste my manhood in lighting fire of anger and spreading it from house to house.' এই

আগুনের আঁচ যেন শান্তিনিকেতনকে স্পর্শ না করে। 'Santiniketan must be saved from the whirilwind of dusty politics.' মহাত্মা গান্ধী খিলাফৎ লইয়া বিফল আন্দোলন করিতেছেন। তিনি কি ইতিহাসের চাকা উল্টাদিকে ঘুরাইয়া দিতে চাহেন? অ্যাণ্ড্রুজের নিকটে লেখা চিঠিতে তাহা কবুল করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষা দূরদর্শী বলিতে হইবে। তুর্কীরাই কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে ১৯২৪ সালে খলিফা পদ বাতিল করিয়া তুরস্ককে আধুনিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহাই ইতিহাসের নির্দেশ, যাহা রবীন্দ্রনাথ যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। অবশ্য তখন ভারতে যেমন অশান্তির দক্ষযজ্ঞ চলিতেছিল, তেমনি য়ুরোপেও তো শান্তি ছিল না। বুদ্ধিজীবী দানবশক্তির অনলনিশ্বাস এবং অস্ত্রভাণ্ডারের ভয়াবহ ঝন্‌ঝনা য়ুরোপের নিরীহ মানুষকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ য়ুরোপের মতো ম্যামনের পুজা করে না, কুবেরকে হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদনও তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। মহাতাপস শিবই ভারতের প্রতীক, অন্তত হিন্দু ভারতবর্ষের। কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী এবং অন্নপূর্ণা যাঁহার গৃহিণী, শ্মশানেমশানে তাঁহার অধিষ্ঠান, দারিদ্র্যই তাঁহার ভূষণ। আমাদের মধ্যবিত্ত সাধারণ ব্যক্তি মাঝে মাঝে অভাবে অনটনে কাতর হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু অল্পেই সে অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারে, শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্ কেবল কথার কথা নহে। তাহাই ভারতের একমাত্র অন্বেষ্টব্য। কিন্তু পশ্চিমের শিব শান্তও নহেন, অদ্বৈতও নহেন। তাঁহার ঝোলাঝুলি খুঁজিলে ব্যাঙ্কের পাসবহি বাহির হইয়া পড়িতে পারে। অবশ্য ভারতীয় শিব ও পশ্চিমের শিবের একস্থানে মিল আছে। উভয়ের গৃহিণীই গৌরাঙ্গী। কিন্তু পরিহাসের কথা থাক্। ভারত যেখানে সাধকের কৃপা ভিক্ষা করে, পশ্চিম সেখানে 'an efficient accountant' হইয়া হিসাবের খাতা খুলিয়া বসে। উগ্র স্বদেশপ্রেমী ব্যক্তি এবং নিছক নীতিবাগীশ মানুষ মনুষ্যত্বের আধখানাও নহে, কবুল করিতে রবীন্দ্রনাথ সংকুচিত হন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বৈরাগ্যের নামে শূন্য ঝুলিরও সমর্থন করেন নাই। শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা স্বরাজলাভ ভারতের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, ন্যাশনালিজ্‌ম্-এর লূতাতন্তু হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে ভারতবর্ষের ভরাডুবি হইবে- ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। শুধু চরখা ঘুরাইয়া দেশের স্বাধীনতা আসিবে, অর্থনীতির দিক হইতে চরখার সুতা দেশকে অন্নবস্ত্রে স্বয়ম্ভর করিয়া তুলিবে, এরূপ অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিহাসিক, ভোজবাজিতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। মহাত্মা গান্ধীকে তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করিলেও তাঁহার কোনো কোনো অবৈজ্ঞানিক মত মানিতে পারেন নাই, তাহার পরিচয় মিলিবে 'কালান্তরে'। যাহা হউক, তাঁহার দেশে ফিরিবার পূর্বে-এ দেশে অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে উঠিয়াছে, প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্-এর আগমন উপলক্ষে বোম্বাই নগরীতে দাঙ্গা বাধিয়া যায়, তাহাতে পঞ্চাশ জন নিরীহ মানুষ নিহত হইল, আহতের সংখ্যা চারিশতকেও ছাড়াইয়া গেল। যুক্তপ্রদেশের চৌরীচৌরাতে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া থানায় আগুন লাগাইয়া দেয়। ফলে একুশ জন সিপাহি ও চৌকিদার জীবন্ত দগ্ধ হয়। মহাত্মাজী বুঝিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। তিনি আন্দোলন স্থগিত রাখিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিদেশে বসিয়া সব সংবাদই পাইতেছিলেন। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া সেই উদ্‌বেজিত আবহাওয়ায় রচনা করিলেন 'শিক্ষার মিলন'। ১০ আগস্ট তাহা শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীদের শুনাইলেন। যদিও শিক্ষার সমন্বয়ীকরণ তাঁহার মূল বক্তব্য, কিন্তু শ্রোতারা বুঝিলেন সমকালীন রাজনীতির সমালোচনা প্রবন্ধটির প্রথমাংশের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া আছে। ইহার পাঁচদিন পরে ১৫ আগস্ট তিনি ঐ প্রবন্ধটি কলিকাতায় য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভায় পাঠ করিলেন--অগ্নিতে ঘৃতাহুতি

পড়িল। প্রকাশ্যেই তিনি গান্ধীজীর কর্মনীতির সমালোচনা করিলেন। তখন একচক্ষু সাইক্লোপ্‌স্-এর মতো অসহযোগ আন্দোলন একরোখা পথ ধরিয়া চলিয়াছে, উদ্ধত জাতিপ্রেম ফুঁসিয়া উঠিয়াছে। মহাত্মাজীর যে অসহযোগ আত্মিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে গ্রহণ লাগিল। শাসকশক্তিও সময় বুঝিয়া একটা আঘাতের বদলে দশটা আঘাত ফিরাইয়া দিল। অসহযোগ-অহিংসার দিকে পাশব হিংসা অলক্ষ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। শিক্ষার নামে সংকীর্ণ সংস্কার শিক্ষাসত্রের উন্মুক্ত বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিল। যাহা-কিছু য়ুরোপীয়, তাহাই শিক্ষাবিধি হইতে বর্জিত হইল। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের এই সংকটকালে নিজেকে নিরাপদ নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে গুটাইয়া লইলেন না, শিক্ষার সমস্যা আলোচনা করিতে গিয়া দেশের বৃহত্তর সমস্যা ও আদর্শভ্রান্তির দিকটিও ঐ প্রবন্ধে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলেন। মহাত্মাজীর কর্মপন্থার সমালোচনা এবং শিক্ষাকে পূর্ণতা দিবার জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের আনুকূল্য অনেকেই সহিতে পারিলেন না। আঁধির অন্ধকারে যাঁহারা ক্ষণকালের জন্য আবৃতচক্ষু হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন। সেই ক্ষোভ রোষের আকারে শরৎচন্দ্রের লেখনীমূলে আত্মপ্রকাশ করিল। ঐ বৎসরেই 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যা আয়তনে' তিনি 'শিক্ষার বিরোধ' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িলেন, যাহাতে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের কঠোর সমালোচনা করিলেন, ভাষায় ব্যঙ্গের ঝালমসল্লাও মিশাইয়া দিলেন। যদিও যথোচিত বিনয়সহকারে বলিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবল ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমাত্র আঘাত করে বসি'—কিন্তু এতটা সংকোচ ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়াও তিনি গুরুতুল্য পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের অভিমতের সমালোচনা করিতে গিয়া ব্যঙ্গের ছিটেগুলি বর্ষণের ত্রুটি করিলেন না।

৩

এখন দেখা যাক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে প্রধানত কোন্ কোন্ যুক্তির সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহিয়াছিলেন। দীর্ঘ কয়েকমাস ধনকুবের আমেরিকায় বাস করিয়া এবং রাজনৈতিক-বিক্ষোভ-উত্তাল য়ুরোপ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ঐ-সমস্ত দেশের কর্মযজ্ঞ ও শিক্ষাবিধি বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন দিক হইতে চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন। কিন্তু প্রবন্ধটির গোড়ার দিকের অনেকটা অংশেই ছিল মহাত্মাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত, রাজনৈতিক আন্দোলনের সমালোচনা এবং ভারতীয় শিক্ষাসংস্কারের জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার উদার সহায়তা গ্রহণ। পশ্চিম দিকের জানালা বন্ধ করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকর্মাদি হইতে সরিয়া আসিয়া দ্বৈপায়ন একপার্শ্বিকতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের নিকট আত্মঘাতী নীতি বলিয়া মনে হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তা গ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য নীতি যে প্রাচীন এশিয়ার মস্তকের উপর রাজত্ব করিয়া বিশ্বের যাবতীয় সুখ ও আনন্দ ভোগ করিতেছে, ইহার কারণ য়ুরোপ-আমেরিকা বিজ্ঞানবুদ্ধি ও বাস্তববিদ্যার জোরে বিশ্বের কামধেনু দোহন করিতেছে। ইহার একটি মাত্র কারণ, তাহারা কোনো কিছু বাধার নিকট হার মানে নাই, বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকেই মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছে, এবং যজ্ঞদেবতার হাত হইতে যজ্ঞভাগ বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগেও ভারতবর্ষ বুদ্ধির ভীরুতা ও সংস্কারের জড়তা কাটাইয়া উঠিতে পারিল না, আমরা যৌক্তিক বিজ্ঞানসাধনাকে সকলের উপরে স্থান দিতে পারিলাম না। তাঁহার মতে, এই মানসিক 'ইতি-উতি' ভাব এবং বাহিরের ভীরুতাই আমাদিগকে শক্তিহীন নির্জীব করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বনিয়মকে বুদ্ধির নিয়মে আবিষ্কার করা, এবং সেই আবিষ্কারের ফলস্বরূপ

আশমানদারি হইতে দুনিয়াদারিকে রক্ষা করা—পাশ্চাত্য, দেশ এই সিধা পথ ধরিয়া চলিয়াছে। অবশ্য সেই লৌহ পথটা যে সদা-সর্বদা নির্বিঘ্ন হইয়াছে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নাই। তাহাদের সভ্যতার রথ মাঝে মাঝে বিপথেও গিয়াছে, কোথাও ভোগের জাহাজ লোভোদ্ধত সমুদ্রের সফেন তরঙ্গে সলিলসমাধি লাভ করিয়াছে। তবে তাহারা কোনো বিপর্যয়কেই গ্রাহ্য করে নাই, মানুষ বা প্রকৃতি কাহারও নিকট হার মানে নাই। ভারতীয় পুরাকাহিনীতে আছে দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। পুরাতন কাহিনীর তাৎপর্য এই যে, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দেবতাদের জানা ছিল না, মৃতকে বাঁচাইবার গূঢ় বিদ্যা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যই জানিতেন। তাই কচ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ যদি যথার্থ শিক্ষা পুরা করিতে চায়, তাহা হইলে দৈত্যগুরু অর্থাৎ পাশ্চাত্য গুরুর নিকট ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইবে। যাহারা বিলাতি বিদ্যা বলিয়া স্বদেশী বিদ্যামন্দিরে তাহার ঠাঁই করিয়া দিতে চাহে না, তাহাদিগকে তিনি বুদ্ধির দিক হইতে কাপুরুষ বলিয়াছিলেন, 'এইরকম বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে শুক্রাচার্যের ঘরে। সে-ঘর পশ্চিম-দুয়ারি বলে যদি খামকা বলে বসি ও ঘরটা অপবিত্র তাহলে যে বিদ্যা বাইরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোটো করা হবে।' শাস্ত্র বলিয়াছেন, বিদ্যা ও অবিদ্যা, অর্থাৎ যাহা অধ্যাত্মবিদ্যা নহে, যাহা বাস্তব জীবনের বাধা মুক্তির জন্য প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া বাস্তব প্রয়োজনের দিকে চাহিয়া যাহা সৃষ্টি হয়, নির্মিত হয়, তাহাও অনুশীলনের যোগ্য। কিন্তু অবিদ্যাই চূড়ান্ত লক্ষ্য নহে। ইহার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হইবে, এইমাত্র। শোকদুঃখ, আধিব্যাধি, দারিদ্র্য, মহামারী— ইহাদের গ্রাস হইতে পার্থিব সত্তাকে রক্ষা করিতে হইলে অবিদ্যার অনুশীলন প্রয়োজন। সেই বিদ্যায় যাহারা পারঙ্গম সেই আধুনিক শুক্রাচার্যদের আধুনিক যন্ত্রাগার হইতে সেই বিদ্যা আহরণের জন্য সচেষ্ট না হইলে অধ্যাত্মবিদ্যা দাঁড়াইবে কোথায়? 'অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে, তার পরে বিদ্যার তীর্থে অমৃত লাভ হবে। শুক্রাচার্য এই মৃত্যু থেকে বাঁচাবার বিদ্যা নিয়ে আছেন। তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্যে দৈত্যপাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।' অর্থাৎ তাঁহারা মতে জড়বিশ্বে জড়ের প্রতিকূলতা এবং গোলামি হইতে বাঁচিবার জন্য ইহার বাস্তব রহস্য ভেদ করিতে হইবে। অবশ্য এ কথাও ঠিক পশ্চিমবিশ্ব জড়বিশ্বকে করতলগত করিতে গিয়া জড়েরই অধীন হইয়া পড়িতেছে—ইহাও একপ্রকার বিনষ্টির সাধনা : অতিভোগজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পশ্চিমের অপঘাতে মৃত্যু হইবার আশঙ্কা, খাদ্যাভাবজনিত শূন্য জঠরে ভারতবর্ষও মৃত্যুকে ঠেকাইতে পারিবে না। তবে তাহা অপঘাত মৃত্যু নহে, রোগে ভুগিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় শীর্ণ হইয়া ঘৃণ্য অবসান। সুতরাং পূর্ব ও পশ্চিমকে মিলিতে ও মিলাইতে হইবে। দ্বৈপায়ন চেতনার উদ্ধত প্রতীক কিপলিঙের ছড়ার মতো 'পূর্ব পূর্বই, পশ্চিমও পশ্চিম, এই দুইজনে কখনো মিলিবে না' এ কথা রবীন্দ্রনাথ মানিতে পারেন নাই। দুই চেতনার স্বরূপটি তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'পশ্চিম মহাদেশ বাহ্যবিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করছে; সেই সাধনা ক্ষুধাতৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা আর পূর্ব মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব, পূর্বপশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই ব্যর্থ হবে...।' বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যা—উভয়কে মিলাইতে না পারিলে ভারতবর্ষ কী শিক্ষায়, কী রাজনীতিতে, কী

সমাজবোধে, একপায়ে চলিবার চেষ্টা করিবে। ফলে পদে পদে পদস্খলন, পতন এবং অবশেষে মরণং ধ্রুব। রবীন্দ্রনাথের এই যুক্তিক্রম ও'থীসিস' কোনো দিক দিয়াই আপত্তিকর নহে। মহাত্মা গান্ধী, যিনি শুধু মহাত্মা নহেন দেশের আত্মাও বটে, তিনি সমগ্র দেশকে সেই উদার পরিমণ্ডলে আহ্বান করিতে পারিতেন। তাঁহার নিকট রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রত্যাশা। কিন্তু যখন কবি লক্ষ্য করিলেন, পুরাতন সংস্কারের যে জীর্ণ রথটা আধুনিক ভারতের রাজপথের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে, মহাত্মাজী অসহযোগ-অহিংস আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন, চরকা এবং বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবের ঢালাও আয়োজনের দ্বারা তাহাকেই খাড়া করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন; কলকারখানা, বিজ্ঞানের আবিষ্কারকেও ছোটো করিয়া তাহার ধূমনিশ্বাসী অভিশাপটাকেই বড়ো করিয়া দেখিয়া শিক্ষাকেও ম্লেচ্ছসংস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া অসহযোগের দড়াদড়ি কষিয়া বাঁধিবার পরামর্শ দিতেছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ আর কবিত্বের হর্ম্যে নীরবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, এই সংস্কারান্ধ দৃষ্টির সমালোচনা করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, দুর্বুদ্ধিই ন্যাশনালিজ্‌ম্‌-এর ছদ্মবেশে য়ুরোপকে গ্রাস করিতে চলিয়াছে। পূর্বদেশেও সেই দুর্বুদ্ধির নির্বাধ প্রকাশ ঘটিতেছে । য়ুরোপ স্বাজাত্যের অহমিকায় প্রাচ্য বিশ্বে নানাপ্রকার অমানুষিক ব্যাপার ঘটাইতেছে । তাহারা গ্রাস করাকেই ঐক্য বলিয়া জানিয়াছিল, জাতীয় আত্মম্ভরিতাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল । তাই মহাযুদ্ধ দ্বারপ্রান্তে হানা দিল, য়ুরোপের বহু মানুষ কামানের খাদ্য হইয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ দিল। শান্তিপর্বে কিন্তু লক্ষ্য করা গেল, আগামী মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা সন্ধিপত্রের ছত্রে ছত্রে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়া গিয়াছে । ইহার কারণ তাহারা পূর্বকে মানবশিকারের অভয়-অরণ্য বলিয়া মনে করিয়াছিল । এইখানেই তাহাদের পাপবৃত্তি মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান ধর্মের সাধনা, রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের সংস্কারমুক্তি—সবকিছুকেই লেহন করিয়া লইয়াছে । প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকার পর তাহারা শান্তিভিক্ষু হইয়াছে । যখন তাহারা সভয়ে লক্ষ্য করিল, তাহাদের লোভের অজগরটা শুধু পূর্বদেশকে গ্রাস করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহাদেরও জঠরে পুরিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখনই তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইয়া নিজেদের প্রশ্ন করিল, ততঃ কিম্‌ ? তাহারা মঙ্গলকে আঘাত করিয়াছে, তাই তাহাদের এই শাস্তি । আমরাও কি তাহা করি নাই ? এখনো তো যুক্তি, বিবেক, সত্যকে ঝাঁটাইয়া বিদায় দিয়া তামসী পূজার জয়ধ্বনি করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধে নানা দিক হইতেই সমস্ত প্রসঙ্গের পুনর্বিবেচনা করিয়াছেন। য়ুরোপ তাহার ঘরের সমস্যা লইয়া ব্যস্ত ও উদ্‌বিগ্ন। তাহারা পূর্বপশ্চিমে ভেদ করিয়াছিল, অজগরের মতো গ্রাস করাকেই এক করা মনে করিয়াছিল এবং প্রাচ্যবিশ্ব তাহদের ঐক্যনীতি মানিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহাদিগকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া গালি দিয়াছে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিকলাঙ্গ দেহ, ছিন্নভিন্ন মন ও ভাঙাচোরা সমাজনীতি লইয়া তাহারা অন্য পন্থার সন্ধান করিতেছে । বোধ হয় ওদেশে এখনো কিছু সৎ মানুষ অবশিষ্ট আছেন, এখনো তাঁহারা মনে করেন, জাতিবৈর দূর করিয়া ওয়েণ্ডেল উইলকির *One World*-এর মতো এক-ভুবন গড়িতে গেলে ভারতবর্ষকে সঙ্গে লইতে হইবে । কিন্তু যখন তাহারা দেখে, আধুনিক ভারতবর্ষের লোকেরা তাহাদেরই স্কুলে শেখা বিদ্যার অর্ধেকটারও কম অর্জন করিয়া তাহাই উদ্‌গীরণ করিতেছে, তখন তাহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারে, ঘরে তাহারা ব্যর্থ হইয়াছে, বাহিরকেও নষ্ট করিয়াছে । ইহার সদুপায় কোথায়।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার মধ্য দিয়া দুই বিরোধী বোধের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলনের বাতাস দিয়া ভিজা কাঠে আগুন জ্বালাইবার চেষ্টা করিলে শ্বাসরোধী ধূমশিখা জীবনের স্বভাববৈশিষ্ট্যকে ঢাকিয়া ফেলিবে । পশ্চিম বিদ্যার নকলনবিশি

নহে, পশ্চিম হইতে জীবনযুদ্ধের হাতিয়ার সংগ্রহ করিতে হইবে, কিন্তু বিশ্বাস রাখিতে হইবে আত্মশক্তির উপর। 'মোক্ষমূলর বলেছে আর্য, তাই শুনে সব ছেড়েছি কার্য' এ-জাতীয় আত্মপ্রসাদ এক প্রকার হীনমন্য দাসমনোবৃত্তির পরিচায়ক। শুধু আমাদের জন্য নহে, 'অনাগত বিধাতা'দের জন্যও এখনও একটি সমন্বয়মূলক শিক্ষাদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। পশ্চিমের বস্তুদর্শন এবং ভারতের আত্মদর্শন, পশ্চিমের ভোগ এবং ভারতের ভোগবিরতি, পশ্চিমের মোহ এবং ভারতের মুক্তি যতই স্বতঃবিরোধী হোক-না কেন তাহাদের মধ্যেও মিলনসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। যদি ভারতবর্ষ সেই সমন্বয়ী শিক্ষা ও সাধনাকে জাতির মর্মমূলে সঞ্চার করিতে পারে, তাহা হইলে দারিদ্র্যের কলঙ্কচিহ্ন ধারণ করিয়া ভারতবর্ষকে পশ্চিমের দুয়ারে দাঁড়াইতে হইবে না। তাহার বাহ্যিক ঐশ্বর্যের হাঁকডাক না থাকিলেও রহিয়াছে অন্তরের ঐশ্বর্য। য়ুরোপ যেদিন সেই সত্যটা আবিষ্কার করিবে সেইদিন সে অপঘাত হইতে মুক্তি পাইবে, ভারতবর্ষও সেদিন আধ্যাত্মিক তামসিকতা ত্যাগ করিয়া তাহার সনাতন ঋক্‌থ-কে হাতে পাইবে। তখন সেও মৃত্যুসাগর মন্থন করিয়া অমৃতাত্মাকে লাভ করিবে। এই দুয়ের মিলন চাই। আমরা যখন প্রচ্ছন্ন থাকি, তখনই আমাদের আত্মা কলুষিত হয়। তখন আমরা দীন, দয়াপ্রার্থী, ভীরু ভিখারী মাত্র। ভিখারীকে কেহ শ্রদ্ধা করে না। পশ্চিমের কাছে আমাদের ভিক্ষাপাত্রটা মেলিয়া ধরিলে তাহারা কৃপাভরে তাহাতে দুই-চারিটা পাউণ্ড ডলার ফেলিয়া দিবে। কিন্তু ভারতবর্ষ যেদিন বলিতে পারিবে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রাধান্য উভয়েরই লক্ষ্য হওয়া উচিত; দাবাইয়া দলিয়া টিপিয়া পিষিয়া সত্যের কণ্ঠরোধ করা যায় না— তখনই সে আপনাকে পাইবে। পশ্চিম প্রথম মহাযুদ্ধের আগুনে ঝলসাইয়া এই সত্যটা বোধহয় খানিকটা বুঝিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা হইয়াছে কি? হইয়া থাকিলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজন হইত না এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কবরের উপর ঘাস গজাইবার পূর্বেই আবার 'গণকবরে'র ক্ষুধার্ত গহ্বর খুঁড়িবার প্রয়োজন হইত না, বিদায়মুহূর্তে বিষণ্ন রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় তাহার আভাস পাইয়াছিলেন।

৪

শিক্ষার মূল আদর্শ কী? প্রায় অর্ধশতাব্দী রবীন্দ্রনাথ তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিক্ষার মূল আদর্শ, মানুষের প্রকাশকে অব্যাহত রাখা, আত্মাকে প্রচ্ছন্নতা হইতে মুক্তি দেওয়া এবং একের সঙ্গে অপরকে মিলাইয়া দেওয়া। মহাত্মাজী-পরিকল্পিত অসহযোগনীতি প্রায়ই সেই কথাটা ভুলিয়া গিয়া একপার্শ্বিকতাকেই সমগ্রতা বলিয়া ভুল করিয়াছে। এই নির্মম সত্য কথাটা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেই-বা এমন করিয়া বলিতে পারিতেন? শিক্ষার মধ্য দিয়া নবযুগের উদ্‌বোধন করিতে হইবে, তাঁহার 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ না রাখিয়াই বলিলেন, 'সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে ; কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তা হলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব; নবযুগের উদ্‌বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব...।' তাঁহার মন্তব্য ও অভিমত তাঁহার ব্যক্তিগত চিন্তা ও পরীক্ষামূলক শিক্ষাব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও সমকালীন ভারতবর্ষের শিক্ষার খঞ্জত্ব অনেকটা দূর হইতে পারে--যদি আমরা তাঁহার উপদেশ ও প্রস্তাব আংশিক ভাবেও গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু তাঁহার এই সুযুক্তিপূর্ণ অভিমত কাহারও কাহারও কাছে বড়ো বেশি আবেগবহুল ও কবিত্বময় বলিয়া

উপেক্ষিত হইল। এই প্রবন্ধের প্রকাশ্যে এবং পরোক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের প্রশংসা, ভারতীয় চিত্তের জড়তা ও গতানুগতিকতার নিন্দা এবং সে প্রতিবাদ নিতান্ত নিরামিষ ধরনের ছিল না। শরৎচন্দ্র এই দলের বক্তব্যগুলি যুক্তির ক্রমানুসারে সাজাইয়া রবীন্দ্রসমালোচনায় নামিয়া পড়িলেন। আমাদের দেশের সমালোচনার অর্থ ছিদ্রান্বেষণ। শরৎচন্দ্র তাঁহার ব্যতিক্রম নহেন।

রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীর কর্মপন্থার সমস্ত অনুমোদন করিতে পারেন নাই। চরখা, অসহযোগ, বিদেশী বস্ত্রের দাহকর্ম প্রভৃতি ব্যাপার কবিগুরুর কাছে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইয়াছিল। এই আন্দোলনের পক্ষে প্রচুর জনসমর্থন সত্ত্বেও তিনি সমস্ত আয়োজনের পশ্চাতে দুর্বুদ্ধির পদক্ষেপ শুনিতে পাইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন'-এর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় রচনা করিলেন 'শিক্ষার বিরোধ'। রবীন্দ্রনাথের অনেক যুক্তি ও সিদ্ধান্ত তাঁহার মনোমত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার মনেও তিক্ততা ঘনাইয়া আসিয়াছিল—ইহার মূলে ছিল অযৌক্তিক ক্রোধ ও চণ্ডীমণ্ডপে-অনুষ্ঠিত গ্রাম্য দলাদলির ঘোঁটপাকানো কোন্দল। রবীন্দ্রনাথ-উপস্থাপিত শিক্ষার আদর্শের অন্তরে প্রবেশ করিতে অনেকেই বাধা পাইলেন। ফিরিঙ্গী দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক এই ভাবিয়া খুশি হইলেন যে, রবীন্দ্রনাথ এতদিনে বুঝিয়াছেন যে পশ্চিমের শিক্ষা ভিন্ন ভারতের আশা নাই। এই ব্যাপারে শরৎচন্দ্র চটিলেন বটে, কিন্তু তাহার কোনো কারণ ছিল না। কারণ রবীন্দ্রনাথ যে-যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহাকে প্রতিযুক্তির দ্বারা ফিরানো যায় না। পশ্চিম-বিশ্ব প্রাচ্যদেশ অপেক্ষা অনেক আগাইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ কোথায়? তাহারাই তো আমাদের কাঁধের উপর চড়িয়া ছড়ি ঘুরাইতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবাধ অনুশীলন এবং অতিশয় pragmatic বুদ্ধির জোরে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ আনন্দ তাহাদের দখলে চলিয়া গিয়াছে। কামধেনুটি দোহন করিয়া যাবতীয় ক্ষীর সর ননী ভোজনের একমাত্র অধিকার যেন তাহাদেরই। আমাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে ধেনুটির দানাপানি জোগাইবার ভার। ইহার কী কারণ? ইহার কারণ— একদিকে তাহারা পশুবল ও হীন স্বার্থবুদ্ধিতে উদ্ধত, আর-এক দিকে তাহারা অগ্রপশ্চাদবোধযুক্ত অতন্দ্র বাস্তব বুদ্ধির অধিকারী, তাহার সহিত হাত মিলাইয়াছে বিজ্ঞানমনস্কতা ও নব নব সৃষ্টির কলাকৌশল। সুতরাং বৈরাগ্যের কন্থাধারী ভারতবর্ষকেও তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানলব্ধ সত্যগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত কোনো দিক দিয়াই অযৌক্তিক নহে। কিন্তু তাঁহার গান্ধী-প্রতিকূলতা ও স্বরাজ-আন্দোলন সম্বন্ধে সংশয় শরৎচন্দ্রকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল। ক্রোধ অনেক সময়ে আমাদের হিতাহিত জ্ঞান কাড়িয়া লয়, তখন কুযুক্তি-অযুক্তিকেই সুযুক্তি বলিয়া মনে হয়। সদুপদেশ নিম্বতিক্ত স্বাদ সৃষ্টি করে। তাই শরৎচন্দ্র যুক্তিতর্কের ধার না ধারিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

শরৎচন্দ্রের ধারণা, পশ্চিম-বিশ্ব যে সুখ স্বস্তিতে জীবন যাপন করে, অথচ আমরা উপবাসী আছি ইহার সব দায় তাহাদের। তাহারা যে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি করিয়াছে, মানুষকে প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছে, শাসনকার্যে জনবাণীকে ঈশ্বরবাণী ('vox pupuli vox dei') বলিয়া মানিয়াছে তাহা কি শুধু মুনাফা শিকারের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে? শরৎচন্দ্র য়ুরোপের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকিলে দেখিতেন, রেনেসাঁস হইতে রিফর্মেশন পর্যন্ত— তাহারাই মানবমুক্তির পথ খুলিয়া দিয়াছিল। চিত্তের বাধা ও প্রকৃতির প্রতিকূলতা— সব-কিছুই তাহারা জয় করিয়াছিল। তাহাদের বিদ্যাই তাহাদিগকে ভুবনের ঘাটে ঘাটে পণ্যের তরী বাহিয়া লইতে সাহায্য করিয়াছে। অবশ্য সে বিদ্যাকে যখন তাহারা কালা-ধলার ব্যবধান হিসাবে ব্যবহার করিল তখনই তাহাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে

গ্রহণ লাগিল, তাহাদের নিজেদের মধ্যেই রক্তবীজের জন্ম হইয়াছে, তাহার অস্পষ্ট প্রেতচ্ছায়াকে মহাযুদ্ধের কবরখানায় খাদ্য-সন্ধানে ঘুরিতে দেখিয়া উপনিবেশ-শিকারীর দল চমকাইয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা যে বিদ্যা দিয়া বিশ্ব জয় করিয়াছে, তাহা শাস্ত্রমতে পরাবিদ্যা না হইলেও, তাহা তাহাদের নিজস্ব পরিশ্রমলব্ধ বিদ্যা, ধার করা ব্যাপার নহে। এই মোটা কথাটা শরৎচন্দ্র কেন বুঝিতে চাহিলেন না তাহার কারণ স্পষ্ট নহে। রবীন্দ্রনাথের মতের প্রতিবাদ করিতে হইবেই বলিয়া যেন তাঁহাকে কলম ধরিতে হইয়াছে, এবং সেজন্য অযুক্তি-কুযুক্তি ও অযথার্থ কথার সাহায্য লইতে হইয়াছে। তাঁহার মন্তব্য : 'কবি জোর দিয়ে বলেছেন, একথা মানতেই হবে পশ্চিম জয়ী হয়েছে এবং সে শুধু তাঁদের সত্যবিদ্যার অধিকারে। হয়ত মানতেই হবে তাই। কারণ সম্প্রতি সেইরকম দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেছে বলে এই জয়করা বিদ্যাটা সত্য শিক্ষা, অতএব শেখা চাই-ই একথা কোনোমতেই মেনে নেওয়া যায় না।' শরৎচন্দ্রের এ উক্তি কতটা বালকোচিত তাহা নিজে তিনি ধরিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার বন্ধুমহলও কেন তাঁহার মন্তব্যের দুর্বলতা দেখাইয়া দেন নাই তাহাই জিজ্ঞাস্য। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমস্ত কর্মপন্থা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই, তাই কি শরৎচন্দ্রের এই অযৌক্তিক আক্রমণ? খ্রীস্টজন্মের পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষ কেন বার বার পরপদানত হইয়াছে সে কথাটাও শরৎচন্দ্র তলাইয়া দেখিলেন না। পাশ্চাত্য গুরুমহাশয়গণ কালা পড়ুয়াদের কিছুই শিখাইবে না, কারণ তাহা হইলে সে-বিদ্যা কুলত্যাগ করিয়া নেটিভের ঘরে গিয়া সংসার পাতিবে। কিন্তু একালের ভারতীয়গণ কালোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞান কারুবিজ্ঞানের শিক্ষা কাহার কাছে পাইল? মনু-পরাশরের খুঁট ধরিয়া একালের ভোজসভায় ডাক পাওয়া যাইবে কি? বিদ্যার জাতি নাই, অপরের ঘরে উঠিলেও তাহার কুলভঙ্গ হয় না। বরং অপরের ঘরে না উঠিলে তাহার সতীত্বের পরীক্ষা হয় না। কারণ চতুঃষষ্টি-কলাবিদ্যা বহুবল্লভা। ফলিত বিজ্ঞানের সাহায্যে পাশ্চাত্য জাতি জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়াছে— কেবল পূর্ব দুনিয়া লুণ্ঠনের সাহায্যে নহে। আফগান লুঠেরাগণ অশ্বপৃষ্ঠে ও শকট বোঝাই করিয়া ভারতের ধনরত্ন লুঠিয়া লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের এই মানুষগুলি ধর্মীয় কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া কোনো দিন আধুনিক হইতে পারে নাই। একদা প্রচণ্ড শক্তিশালী অটোমান তুর্কী পূর্ব-য়ুরোপকে নতজানু হইতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু মধ্যযুগীয় সংস্কার ত্যাগ না করার জন্য তাহারা সকলের পরিহাসের পাত্র হইয়া রহিল, কামাল আতাতুর্কের প্রচণ্ড প্রতিভার সংস্পর্শে আসিয়াও তাহারা এখনো পুরাপুরি আধুনিক হইতে পারে নাই। কারণ তাহারা এখনো মধ্যযুগীয় সংস্কারের মধ্যে বাস করিতেছে।

পাশ্চাত্য রাজনীতি শোষণের নামান্তর মাত্র, কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সেই শোষণের প্রধান হাতিয়ার নহে। অবশ্য ধুরন্ধর রাজশক্তি বিজ্ঞানকে মানুষ-মারা কল হিসাবে ব্যবহার করিলে সে দায় বিজ্ঞানের নহে। 'তরবারি দিয়ে দাড়ি চাঁচা'-য় তরবারির গৌরব লাঘব হয়, গণ্ডদেশের প্রতিও সুবিচার করা যায় না। পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটাইয়া মরুবালুরাশির অভ্যন্তরে-সুপ্ত ভোগবতীকে টানিয়া বাহির না করিয়া তাহা যদি হিরোশিমা নাগাসাকির নিরপরাধ নরনারীর শির লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা হয়, তবে সে পাতক কাহার উপর বর্তাইবে? বোমাবারুদের সাহায্যে দুর্গম পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া পথ কাটা যায়, বদ্ধ জলধারাকে মুক্তধারা করা যায়। কিন্তু তাহা যদি দরিদ্র কৃষকের ভুট্টাক্ষেত ভাসাইয়া লইয়া যায়, ক্ষুধাতুরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়, বিষবাষ্পে মানুষের গলনালী ঢাকিয়া ফেলে, তাহা হইলে কি বারুদের ফরমুলা আবিষ্কারক ফ্রায়ার রোজার বেকন ও শোয়ার্টজ-এর কঙ্কালকে কবর হইতে তুলিয়া গ্যাসচেম্বারে পুরিতে হইবে? অথবা আরো পিছাইয়া গিয়া বারুদের অজ্ঞাতনামা চীনা

আবিষ্কারককে ইতিহাস ঢুঁড়িয়া বাহির করিয়া তাহার স্মৃতিটাকে রাস্তার নিকটতম আলোকস্তম্ভে ঝুলাইয়া অবমাননা করিতে হইবে? ও-দেশের পণ্ডিতগণ প্রাচ্যকে যে তাহাদের বিদ্যার অংশ দিবে না, সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের কোনো সন্দেহ নাই। অথচ প্রাচ্যদেশের আধুনিক সাজসরঞ্জাম পাশ্চাত্য বিদ্যালয় হইতেই পাওয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্র অবশেষে প্রশ্ন করিয়াছেন, 'কথা উঠতে পারে, মানবকল্যাণকর এমন কি কিছুই এর থেকে আবিষ্কৃত হয় নি? হয়েছে বৈকি, কিন্তু সে, নিতান্তই by-product-এর মত বলা যেতে পারে।' এ মন্তব্যও মহাত্মাজীর আধুনিক যন্ত্রশালা বিরোধিতার মতো। তিনি কলকারখানা ও যন্ত্রতন্ত্রকে মহাপাপ বলিয়াই মনে করিতেন। শরৎচন্দ্রও সেই একই ধরনের অবৈজ্ঞানিক মন্তব্যের সাহায্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। 'সে নিতান্তই by-product' ইহার অর্থ বোধ হয় এই — পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্যে নরহত্যা, অর্থাৎ প্রাচ্যদেশের মানুষ নিকাশ করা, উপকার ছিটেফোঁটা যাহা হইয়াছে, তাহা গৌণফল মাত্র। সুতরাং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ভারতের উপকারের চেয়ে অপরকারই করিবে। ইহাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতবর্ষ যে কোনোদিন মানুষ হইয়া উঠিবে সে সম্ভাবনা বিরল, রবীন্দ্রনাথও তাহা কিয়দংশে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তিনি তাহার উপর আর-একটু বিশ্বাস করিতেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের জাতি নাই, ভারতীয়েরা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে জাতিগঠনের সুফলগুলি আয়ত্ত করিতে পারে। কিন্তু কাহার অপরাধে আমাদের এই দুর্গতি? আমাদের শিক্ষা আশ্রয় পাইতেছে না কেন? ইহা কি পাশ্চাত্য গুরুমহাশয়দের কাবসাজি? অথবা আমাদের বুদ্ধিগত অক্ষমতা? শরৎচন্দ্র তাহার কারণ নির্দেশ করিতে না পারিয়া শেষপর্যন্ত অদৃষ্টের উপর সব অপরাধ চাপাইয়া দিয়াছেন--'আমার মনে হয়, প্রত্যেক মানবজীবনর দুঃখের অধ্যায়েই তার অপরাধ ছাড়াও একটা জিনিস আছে যা তার অদৃষ্ট, যে বস্তু তার দৃষ্টির বাহিরে, এবং যার ওপর তার কোনো হাত নেই...।' অদৃষ্টের উপর একান্ত আশ্রয় অসহায় পরাভূত দীনসত্ত্ব মনের শেষ অবলম্বন। রবীন্দ্রনাথ যদি অদৃষ্টবাদ বাদ দিয়া থাকেন, তবে তাহা ভালোই করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের মন্তব্যটি স্মরণীয়, 'দুঃখ ও হীনতার মূলে আমাদের অদৃষ্ট বস্তুও অনেকটা দায়ী, যার ওপর আমাদের কর্তৃত্ব ছিল না।' এ মন্তব্য নির্জীবের কণ্ঠেই মানায়। শরৎচন্দ্র বলিতেছেন, tradition বাদ দিয়া পাশ্চাত্য গুরুর বাণী শিরোধার্য করিলে তাহা একপ্রকার আত্মহত্যাই হইবে। রবীন্দ্রনাথও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, সব-কিছু দেওয়া-নেওয়াকে নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা তো তিনি সারা জীবন ধরিয়া প্রচার করিয়াছেন। শুধু শরৎচন্দ্র অপেক্ষা আর -একটু আগাইয়া গিয়া বলিয়াছেন, ভারতের ট্রাডিশন অর্থাৎ বহুকালাগত ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক আধুনিক সংস্কার— দুই ধারাকেই আমাদের শিক্ষাবিধানে সংযুক্ত করিতে হইবে। শরৎচন্দ্র প্রধানত কথাকার ও মানবজীবন-শিল্পী। চিন্তা বা বুদ্ধিবাদ তাঁহার প্রধান অবলম্বন নহে। তাই ভাবাবেগে উত্তেজিত হইয়া, কোন্‌টি যুক্তি আর কোন্‌টি অযুক্তি তাহা তাঁহার খেয়াল থাকিত না। ঐ প্রবন্ধেই তিনি উগ্র জাতিপ্রেমের উজানে ভাসিতে ভাসিতে কূল ছাড়িয়া কোথায় ভিড়িয়াছেন, ভাবিলে তাঁহার যুক্তির অসারতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ জাগে না। ট্রামগাড়ি, মোটর, বৈদ্যুতিক পাখা এবং বিদ্যুৎ-বাহিত আলোর মালা ও কলকারখানা— 'ঐ যে বিদেশী সভ্যতার তোড়জোড় বিদেশ থেকে বয়ে এনে জমা করেছি, ওর কোনোটা কি আমাদের যথার্থ সম্পদ?' তাঁহার উত্তর—নিশ্চয় নহে। এগুলি আমাদের চেষ্টায় এদেশে প্রস্তুত করিতে পারিলে শরৎচন্দ্রের নজিরে ইহার উদ্ভাবক বিলাতি বিদ্যাকে গালি দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। তাঁহার বিচিত্র উক্তি আবার উদ্ধার করি, 'ওসকল আমরা সৃষ্টি করিনি, করতেও জানি নে। পরের কাছ থেকে বয়ে আনা আজও ওসকল আমাদের না হলেও নয়, অথচ ওর

কোনোটাই আমাদের যথার্থ প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠেনি।' অথচ দেখা যাইতেছে, তাঁহার সময়েও অনেক ভারতীয় শিক্ষার্থী য়ুরোপ-আমেরিকা-জাপানে গিয়া বিদেশী চিকিৎসাশাস্ত্র, পূর্তবিদ্যা, বিভিন্ন প্রকার কারিগরিবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া দেশে ফিরিয়াছে এবং নানাভাবে দেশকে স্বয়ম্ভর করিতে চেষ্টা করিতেছে। একালে বাস করিয়া রেড়ির তেলের শেজ জালাইয়া, হাতপাখা টানিয়া, কবিরাজী বাকল সংগ্রহ করিয়া, মলিন উত্তরীয়খানি কাঁধে ফেলিয়া চণ্ডীমণ্ডপ উত্তপ্ত করিলে দেশ আগাইবে, না পিছাইয়া পড়িবে, তাহা শরৎচন্দ্র ধীর মস্তিষ্কে ভাবিয়া দেখেন নাই। তাই যে-কোনো বিদেশী বস্তুকে তিনি 'আমাদের যথার্থ সম্পদ নয়— নিছক আবর্জনা' বলিয়া ঘৃণাপূর্ণ কোপকটাক্ষে ফিরাইয়া দিয়াছেন। ভাগ্যে গোটা দেশ তাঁহার মতে মত দেয় নাই এবং তাঁহার ভর্ৎসনাবাক্যে সংকুচিত হইয়া স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার বন্ধ করিয়া দেয় নাই, লেবরেটরি, লাইব্রেরি, যন্ত্রশালায় তালা ঝুলায় নাই। তাহা হইলে সমগ্র দেশ আরো এক শতাব্দী পিছাইয়া যাইত এবং মধ্যপ্রাচ্যের মতো বিশ্বের কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকিত। তবে শরৎচন্দ্র কথাপ্রসঙ্গে ঐ প্রবন্ধের শেষের দিকে এমন একটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন যাহার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথও সে সম্বন্ধে বেশ খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেন নাই। কথাটা কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার মতো।

প্রায় দুইশত বৎসর ইংরাজ শাসনে বাস করিয়া ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেকটা গ্রহণ করিয়াছে, কোথাও কিছু মৌলিক প্রতিভারও পরিচয় দিয়াছে, কোথাও-বা নকলনবিশির ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নাই। তবু পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেকটা আয়ত্ত করিয়া ভারতবর্ষ স্বল্পপরিমাণে ঔপনিবেশিকতার অভিশাপ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিয়াছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা কি আগাগোড়াই 'one way traffic' হয় নাই? শরৎচন্দ্র এই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে' ইহা কি য়ুরোপ -ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাস হইতে প্রমাণ করা যাইবে? আমরা পাশ্চাত্যের নিকট অঞ্জলি ভরিয়া অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছি, জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিদ্যায় তাহাদের পাঠশালার পড়ুয়া হইয়া পাত পাতিয়া বসিয়া গিয়াছি। পশ্চিমের গুরু পূর্বদেশের ছাত্রকে হেলাভরে যাহাই দিন-না কেন, তাহা হইতেও আমরা আধুনিক জগতের বাঁচিবার মতো বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছি। কিন্তু আমরা তো হাত ভরিয়া গ্রহণ করিলাম, তাঁহারাও না হয় ঝুলি ভরিয়া ভিক্ষা দিলেন, কিন্তু ইহার সমস্তটাই কি একপেশে হয় নাই? দুইশত বৎসর ঘর করিয়া তাহারা আমাদের কোনো খোঁজ রাখিল না, টগরের মতো নন্দমিস্ত্রীকে হেঁসেলে ঢুকিতে দিল না, আমাদেরও যে একটা জীবন আছে, আছে তাহার নানা আলোছায়ার লীলা, তাহার সহিত তাহারা পরিচিত হইবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাইল না, শুধু শ্বেতজাতির ভূতের বোঝা বহিয়া মরিল ভাবিয়া আত্মসন্তুষ্টিতে ফুলিয়া উঠিল, এ সংবাদ শাসক ও শাসিত- কাহারও পক্ষেই শুভকর নহে। দুই-চারিজন পুরাতাত্ত্বিক, ইন্ডোলজিস্ট, ভারতপ্রেমিক এবং ক্বচিৎ কদাচিৎ হিন্দু স্টুয়ার্ট, উইলকিন্‌স্, হোরেস হেম্যান উইলসন প্রভৃতি দুই-চারি জন খাঁটি ব্রিটন হয়তো ভারতের সাধনা ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোনো কোনো প্রাচ্যবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও গবেষক ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বড়ো মাপের গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে য়ুরোপ-আমেরিকার দু-চার জন ভারতপ্রেমিকের মুখে রামমোহন, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত শাসককুলের কোনো সম্পর্ক ছিল না। শরৎচন্দ্রের এ মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত: 'আমাদের সংসর্গে তার বহুযুগ কেটে গেল, কিন্তু আমাদের সভ্যতার আঁচটুকু পর্যন্ত সে কখনো তার গায়ে লাগাতে দেয়নি। আপনাকে এমনি সতর্ক, এমনি স্বতন্ত্র, এমনি শুচি করে

রেখেছে যে, কোনোদিন এর ছায়াটুকু মাড়ায়নি।' কথাটা শরৎচন্দ্র যেমন ভাবেই বলুন-না কেন, ইতিহাস ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিবে। বাস্তবিক সুদূর শ্বেতদ্বীপের অধিবাসী নর্ডিক জাতির ধ্বজাবাহী ব্রিটনের নীলচক্ষু ও নীলশিরায় যে আভিজাত্য বহমান, তাহার দম্ভে তাহারা কখনো কালা-আদমিকে 'ভাই-বেরাদর' বলিয়া গ্রহণ করে নাই । এমন-কি, খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করিলেও কালা খৃস্টান ও মেটে খৃস্টান কোনো দিন খাঁটি ইংরাজের বৈঠকখানায় প্রবেশাধিকার পায় নাই, অন্তঃপুর তো দূরস্থান । শ্বেতাঙ্গ ধর্মযাজক ব্রাউন ধর্মযাজ্ককে কখনো সমপর্যায়ভুক্ত মনে করেন নাই, তাই কোনো কোনো বাঙালি খৃস্টান ধর্মযাজক ভারতীয় চার্চের পরিকল্পনা করিয়া শ্বেত প্রভুদের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিলেন । এ কথা অবশ্যই সত্য যে, একজন পিয়ার্সন, একজন অ্যাণ্ডরুজ, একজন লেভি সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির প্রতিভূ নহেন । তাঁহারা যেখানে গিয়াছেন, তা সে জুলু-বাণ্টু-হটেনটট হউক, মাওরি হউক বা ভারতবর্ষের অরণ্যচারী আদিবাসীই হউক, সকলকেই আপন করিয়া লইতে পারিয়াছেন । কিন্তু শাসক ইংরাজ কি কখনো ভারতবর্ষ হইতে কোনো চিত্তসম্পদ, কোনো সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছে ? কোনো কোনো অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারি 'হোমে' ফিরিয়া যাইবার সময়ে কিউরিও শপ, যাদুঘর ও বৈঠকখানার শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য পুরাতন পুঁথিপত্র, মুদ্রা, বিবসনা কালীমূর্তি ও স্ফীতোদর যক্ষকে সমাদরে স্থান দিয়াছে । ঐশ্বর্য ও সংগ্রহের দম্ভই তাহার মূল প্রেরণা, ভারতীয় চেতনা ও হৃদয়ের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই । অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারিতেন যে, শাসক ইংরাজ যতই অমানুষ হউক, তাহাদের মধ্যে এমন দুই-চারিজন ছিলেন যাঁহাদিগকে জাতিগত ক্ষুদ্রতার দম্ভ স্পর্শ করে নাই । তাহা সত্য বটে। কিন্তু সংখ্যায় তাঁহারা কয়জন ? বাদবাকি শাসক ইংরাজ এবং ইংলণ্ডের সাধারণ নাগরিক ভারতবর্ষকে কী চক্ষে দেখিত, এখনো দেখিয়া থাকে, তাহা এমন নির্মমভাবে প্রত্যক্ষ যে, ইতিহাসে তাহার পাঁতি খুঁজিবার প্রয়োজন নাই । সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ এমন একটি পরিমণ্ডল হইতে সমস্ত শিক্ষা-ব্যাপারটাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, কয়েকটি অসামঞ্জস্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই । পর্বতশিখর হইতে সমভূমির সবই একপ্রকার বলিয়া মনে হয়। মাটিতে নামিলে তবে ছোটোবড়োর পার্থক্য বুঝা যায় । সেই দিক হইতে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য অযৌক্তিক নহে ।

শরৎচন্দ্রের তিরোধানের চারি বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথও মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া যান । তারপর প্রায় অর্ধশতাব্দী কাটিয়া গেল, শিক্ষা লইয়া অনেক কমিশন বসিল, বিদেশ হইতে বহু বিশেষজ্ঞ আসিলেন, ভারী ভারী রিপোর্ট ছাপা হইল, তদনুসারে কিছু কাজও শুরু হইল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধে পূর্ব ও পশ্চিমের যে মিলন প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, এখনো কি তাহার পুরা রূপটা ফুটিতে পারিয়াছে ? শরৎচন্দ্র যেজন্য সমালোচনা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ অমূর্ত শিক্ষাকে যেভাবে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে রূপময় করিতে চাহিয়াছিলেন, উপাদান ও আয়োজনকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহার আন্তর সত্তাটিকে ছাত্রদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, একালের আকাশস্পর্শী বিশাল ভবনের মধ্যে হাজার উপকরণ সাজাইয়া যে শিক্ষা-সরস্বতীকে স্থাপন করা হইয়াছে, তাঁহার অঙ্গে বারাণসি শাড়ি, না কৃত্রিম তন্তুজাত বনেট, কোন্‌টি অধিকতর মানানসই হইবে তাহা লইয়া চিন্তার অবধি নাই। তবে যদি শিক্ষা-নিগমের কর্তৃস্থানীয়েরা মাঝে মাঝে শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে হয়তো কোনো দূর-ভবিষ্যতের নবশিক্ষার্থীরা শিক্ষার যথার্থ তাৎপর্য বুঝিবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, মানুষের অন্তর্জীবনে সুপ্ত দেবভাবকে জাগাইয়া তোলাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্যে। এই 'দেবভাবের'

অর্থ— মানুষের বৃহৎ সত্তা, তাহার আদর্শ স্বরূপ— অসীমকে সীমায়িত করিবার জন্য মানসিক বিনয় বা ডিসিপ্লিন। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরিয়া সেই বিষয় বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন, হাতেকলমে কাজ করিয়া শিক্ষাকে জীবনের মধ্যে পুনর্জীবিত করিতে চাহিয়াছেন, আমরা তাহার কতটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, অথবা আদৌ কোনো চেষ্টা করি নাই, তাহা ভবিষ্যৎ বিচার করিবে।

বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য

১

১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শনে' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন :

"রাজকৃষ্ণ মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন ; তাহা না লিখিয়া তিনি বালক শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এবং রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।"

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যে রচিত করাঙ্গুলি-গণনীয় পাঁচখানি পুস্তিকা ('বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,' 'পরিব্রাজক,' 'পত্রাবলীর'র কিছু চিঠি) সম্বন্ধেও সক্ষোভে অনুরূপ মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। স্বামীজী বিশ্ববাসীর কাছে অতন্দ্র কর্মযোগী বলে পরিচিত। বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্মৈষণাকে জড়জীবনের প্রত্যক্ষীভূত প্রত্যয়ে প্রয়োগ করে তিনি আধুনিক বিশ্বের মানবজীবন সম্বন্ধীয় সমস্যাকে বলিষ্ঠ ভৌম সার্থকতার দিকে প্রেরণ করেছেন। আধিমানসিক ও আধিভৌতিক জগৎকে তমোগুণের প্রভাবে পৃথক ভাবে দেখা যায়, আবার রজোগুণের স্পর্শে উভয়ের মধ্যে সৌষম্য ও মৈত্রীযোগ স্থাপন করা যায়। মর্ত্যধরিত্রীর বুকে মানুষের মত বেঁচে থাকাও যে একপ্রকার জীবনসাধনা, কোটি কোটি নরকঙ্কালের পঞ্জরাস্থির মধ্যেও যে অমৃত-নিঃস্যন্দী প্রাণধারা বহমান, — এ সব কথা তিনি উনিশ শতকের শেষভাগে ভারতবাসীর কানে কানে বলেছিলেন— কখনও মৃদু আত্মগত ভাবে, কখনও-বা বজ্রনির্ঘোষে। তাঁকে অজস্র বক্তৃতা দিতে হয়েছিল প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষায়, রচনা করতে হয়েছিল ইংরেজীতে। নিয়মিতভাবে বাংলা অনুশীলনের তাঁর সময় ছিল না; শুধু প্রয়োজনের জন্য শিষ্য-গুরুভ্রাতাদের প্রতি উপদেশ-নির্দেশ, চিঠি পত্রাদি, বিদেশী সভ্যতা সম্পর্কে কিছু আলাপ-আলোচনা, অল্প-স্বল্প ডায়েরি রক্ষা— ইত্যাদি কর্মে তিনি যৎসামান্য বাংলা ভাষার সাহায্য নিয়েছেন। বিবেকানন্দের যে বাংলা গ্রন্থগুলি থেকে বাঙালী জীবনের শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পায়, নতুন আলোক লাভ করে, তার অধিকাংশই ইংরেজী রচনা বা ইংরেজীতে প্রদত্ত বক্তৃতার নির্যাস-অনুবাদ— অবশ্য সে অনুবাদ বহুস্থলে মূলের মত অর্থবহ এবং মূলের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার সূত্রে সম্পৃক্ত। তবে স্বামীজীর বাংলা রচনা পরিমাণে স্বল্প হলেও গুণগত উৎকর্ষে তা' ঋজু, কঠিন ও সংযত এবং প্রসন্ন মনের সহাস্য রসোত্তীর্ণতায় বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটি বিস্ময়।

যাঁরা ধর্মজগতের অধিবাসী এবং কর্মযোগে নিষণ্ণ, তাঁদের মূর্ত ও অমূর্ত চেতনা নিজ নিজ ধ্যানধারণাকে কেন্দ্র করেই রূপকল্প নির্মাণ করে। অর্থাৎ শিল্প-সৌন্দর্য, জ্ঞানভূয়িষ্ঠ মনন, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ— সব কিছুই তাঁদের কাছে একটা বিশেষ অবধারণার সহায়ক ; ইন্দ্রিয়াতীত পরাচেতনাই তাঁদের ইন্দ্রিয়জ অপরাচেতনার নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। এঁরা সঙ্গীতবিদ্যায় উত্তরস্নাতক হতে পারেন, শিল্প ও রূপবিদ্যায় অতিশয় নিপুণ হতে পারেন, ভাষা ও সাহিত্যেও পারঙ্গমত্ব অর্জন করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের ভৌমচেতনালব্ধ শিল্প-প্রত্যয়গুলি যুধিষ্ঠিরের রথের মত ভূমিচারিতার একটু উর্ধ্বলোক দিয়ে গতায়াত করে। কিন্তু বিবেকানন্দের বাংলা রচনা কর্ণের রথের মত মন ও প্রাণের মাটি বিদীর্ণ করে অগ্রসর হয়েছে।

বাঙলাদেশ একাধারে নব্যন্যায়ের দেশ, চৈতন্যপ্রবর্তিত উজ্জ্বল রসসাধনা ও শাক্ত পদকারদের বাৎসল্য রসসাধনার দেশ। আবেগের নির্বাধ উৎসার এবং মননের তীক্ষ্ণ তির্যকতা এ দেশেই সম্ভব হয়েছে। তবে একথা স্বীকার্য যে, মধ্যযুগে আবেগধর্ম ও গণধর্মে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। আবেগের মধ্যেই এলোমেলো জনারণ্যের শাখাবিস্তার লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু আন্বীক্ষিকী বিদ্যা পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের মেলবন্ধনে বদ্ধ বলে একটা বিশেষ শ্রেণীর স্বল্পসংখ্যক মস্তিষ্কজীবী মহলেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিককালে পাশ্চাত্ত্য জীবন, সাধনা ও ইতিহাসের প্রভাবে যেমন একদিকে সমাজ, রাজনীতি ও মানবধর্মী উপযোগবাদের প্রতি শিক্ষিত জন আকৃষ্ট হয়েছেন, আবেগোন্মত্ত কণ্ঠে নব-মেসায়ার পথ চেয়ে ভাবী 'সাহস্রিকী'র নান্দীপাঠ করেছেন— তেমনি পাশ্চাত্ত্য ন্যায় ও যুক্তিবাদের নিরিখে মননের নতুন স্বরূপ নির্ধারণেও তাঁরা প্রস্তুত হয়েছেন। উনিশ শতকী য়ুরোপের কাছ থেকে পাওয়া বুদ্ধিবাদ আমাদের পূর্বসংস্কারকেই যেন খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দিল। রামমোহন থেকে অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম থেকে বিবেকানন্দ— এঁদের হাতে বাংলা গদ্য নিশিত অসিধারে পরিণত হল। গদ্য ভাষা যে কী প্রচণ্ড শক্তি ধরে, জাতির মনের আকার আয়তন বিলকুল পাল্‌টে দিতে পারে, তা উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত বাংলা প্রবন্ধ নিবন্ধের পরিচয় নিলেই মোটামুটি বোধগম্য হবে। যাকে শিল্পলক্ষণ বলে, তখনও হয়তো বাংলা গদ্যে তাব যথার্থ স্বরূপ ধবা পড়েনি, কিন্তু সমাজ ও জীবনের সঙ্গেই যে বাঙ্‌ময় সত্তাব নাড়ীর যোগ, এবং সে বাক্‌পুঞ্জ মূলতঃ গদ্যাশ্রয়ী ও মননধর্মী—উনিশ শতকের শেষভাগে সে সম্বন্ধে আর কারও সন্দেহ রইল না। বস্তুতঃ বাংলা গদ্য অন্ধই হোক, আর খঞ্জই হোক —গত শতকের শেষের দিকে এরই সাহায্যে বাঙালীর চিন্তা ও কর্মপ্রেরণা গতিবেগ লাভ করেছে, মূর্ত হয়েছে।

বিবেকানন্দ উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে কিছু কিছু চিঠিপত্র ও দুচাবটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। অবশ্য তখন বাংলা গদ্যের ব্যবহারিক ও শিল্পরূপ গড়ে উঠেছে, অনেকেই গদ্যে সপ্রশংস শিল্পকর্ম নির্বাহ করতে উৎসুক হয়েছিলেন। কিন্তু সাহিত্য বচনা, শিল্পসৃষ্টি বা নিজের মনোমুকুরতলে প্রতিফলিত নিজেরই মুখচ্ছবির সহস্র প্রতিরূপ দেখবার কোন বাসনাই স্বামীজীর ছিল না। নিষ্কিঞ্চন পরিব্রাজক, সুকঠোর কর্মযোগী, ভাবোন্মাদ আদর্শবাদী, অকৃপণ মানবপ্রেমী বিবেকানন্দ মৃত্তিকার মানুষকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলেন। পুঁথিবন্দী আপ্তবাক্য নয়, জীবন্ত মানুষের কথা এত গভীরভাবে ক'জন মানবপ্রেমী ভেবেছেন জানি না। বিবেকানন্দের গদ্য রচনার সবটুকু এই নরদেবতাকে উৎসর্গীকৃত। এদেশে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর কাম্য। তাঁর বাংলা রচনায় তাই নানা জ্ঞানবিজ্ঞান ইতিহাসের ভূরি সমারোহ যেমন আছে, তেমনি আছে এদেশের মানুষের প্রতি অমেয় ভালবাসা, জীবনের প্রতি একটা সরস নিঃস্পৃহ কৌতূহল। তাঁর রচনারীতি বিশ্লেষণ করলে এই দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২

বাংলা গদ্যরীতি আলোচনা প্রসঙ্গে একথা স্বতঃই মনে জাগে যে, এ রীতি মিশনারী সম্প্রদায়ের দানে গড়ে ওঠেনি, টুলোপণ্ডিতের অনুস্বর-বিসর্গ-বর্জিত দেবভাষার ছত্রছায়াতলে এ গদ্য বিবর্ধিত হয়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ পয়ার-ত্রিপদী বাহনে অগ্রচারী হয়েছে, এই পয়ারজাতীয় ছন্দকেই স্বচ্ছন্দে সাধু গদ্যরীতিতে পরিবর্তিত করা যায়;

তাই পয়ারের দ্বারাই মধ্যযুগের যে-কোন মননকর্ম নির্বাহ হত। পয়ারের মধ্যে একটা বিপুল শোষকশক্তি আছে, যে-কোন অর্থবহ মননপ্রবাহকে চৌদ্দমাত্রার পয়ারপংক্তির মধ্যে পরিস্থাপনা করা যায়—তা সে মঙ্গলকাব্যের গদ্যাত্মক বিবৃতিই হোক, আর কবিরাজ গোস্বামীর দার্শনিক রচনাই হোক। অবশ্য দৈনন্দিন প্রয়োজনে গদ্যরীতির ব্যবহার সে যুগে দুষ্প্রাপ্য ছিল তা নয়। তবে বৃহৎ সাহিত্যকর্মে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতি বড় একটা ব্যবহার করা হত না; কারণ পয়ারের দ্বারাই গদ্যাত্মক কাজ অক্লেশে নির্বাহ হত। উনিশ শতকের বাঙালী বাংলা গদ্যের মধ্যে নিজেকেই আবিষ্কার করেছে; আবিষ্কার করেছে যে, চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজের ভাষাকেই সহজে ও সার্থকভাবে আবেগ ও মননের ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়। এ আবিষ্কার মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর আবিষ্কারের চেয়েও বিপ্লবী। বস্তুতঃ গোটা উনিশ শতকের বাঙালী-মানস যে আধুনিক হয়েছে, জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পেরেছে, এর মূল দায়িত্ব বাংলা গদ্যের।

আকণ্ঠ কর্মমগ্ন স্বামী বিবেকানন্দকেও বাংলা গদ্যে কিছু কিছু রচনা করতে হয়েছিল প্রয়োজনের তাড়নায়। সাহিত্যসৃষ্টি এ রচনার উদ্দেশ্য নয়, শুধু নিজের মনের কথা ও চিন্তাকে শিষ্য ও গুরুভাইদের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি মাত্র চারখানি বাংলা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন— 'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'। এছাড়াও 'পত্রাবলীতে' তাঁর কিছু কিছু বাংলা চিঠি ছাপা হয়েছে। বাংলা চলিতরীতিকে তিনি যে একটা বিপুল বেগ ও বিস্ময়কর প্রাণশক্তি দান করেছিলেন, তা বিশেষজ্ঞগণ জানেন। কিন্তু সাধুরীতিকেও তিনি যে ধ্বনিগম্ভীর চিন্তাঋদ্ধ ক্লাসিক রূপ দিয়েছেন, তা তাঁর 'বর্তমান ভারতে'র ভাষারীতি আলোচনা করলেই দেখা যাবে।

'বর্তমান ভারতে' স্বামীজী ভারতীয় সমাজ ও ঐতিহ্য-জীবনের পূর্বাপর ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বৃহৎ মানবচেতনার জড়ত্বের কারণ এবং তামসিক অনীহার গূঢ় তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন, প্রাচীন ভারতের পুরোহিত-রাজন্য-বৈশ্যশাসিত সমাজের মূক জনারণ্যে মানসপরিক্রমা করেছেন, এবং অধীতবিদ্য সমাজতাত্ত্বিকের নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের মধ্যে সেতু আবিষ্কার করেছেন। ফলে তাঁকে পুনঃ পুনঃ অতীত ভারতের জীবনের অন্তস্তলে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এই প্রাচীন জাতির উত্থান পতন, উদ্গতি ও অধোগতির কারণ বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বিশুদ্ধ সাধুভাষার সাহায্য নিয়েছেন। তিনি যে ক্লাসিক গদ্যরীতি চমৎকার আয়ত্ত করেছিলেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা থেকেই তা বোঝা যাবে।

এর ভাষারীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে. এতে দু'ধরনের বাক্-রীতি অনুসরণ করেছেন। একটি— তৎসম শব্দবহুল, সমাসসন্ধিসমাকীর্ণ. দীর্ঘ বিলম্বিত ছাঁদের বাক্যপরম্পরা; আর একটি— খণ্ড খণ্ড উপবাক্যের সমন্বয়ে গঠিত সহজ হালকা বাক্‌রীতি। দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক:

(ক) সৈন্যসহায়, মহাবীর, শস্ত্রবল অপ্রতিহত বীর্য ও একাধিপত্যের সম্মুখে প্রজাকুল, সিংহের সম্মুখে অজাযূথের ন্যায় নিঃশব্দে আজ্ঞা বহন করে, তাহাও দেখিয়াছে। কিন্তু যে বৈশ্যকুল রাজগণের কথা দূরে থাকুক, রাজকুটুম্বগণের কাহারও সম্মুখে মহাধনশালী হইয়াও সর্বদা বদ্ধহস্ত ও ভয়ত্রস্ত, মুষ্টিমেয় সেই বৈশ্য একত্রিত হইয়া ব্যাপার-অনুরোধে নদী, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে ধীরে ধীরে চির-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মুসলমান রাজগণকে আপনাদের ক্রীড়াপুত্তলিকা করিয়া ফেলিবে, শুধু তাহাই নহে, স্বদেশীয় রাজন্যগণকেও অর্থবলে আপনাদের ভৃত্যত্ব স্বীকার করাইয়া তাঁহাদের শৌর্যবীর্য

ও বিদ্যাবলকে নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়া লইবে...।

(খ) স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক, ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ স্বজাতির কল্যাণ নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্তও অসম্ভব।

'বর্তমান ভারতে'র এ দুটি দৃষ্টান্তই সাধুরীতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু একটির সঙ্গে অপরটির রীতিগত পার্থক্য সহজেই চোখে পড়বে। প্রথমটিতে দীর্ঘবিস্তারী বাক্‌রীতির গুরুভার শব্দসংযোজনা এবং অনেকগুলি উপবাক্যের সন্নিবেশে এ রচনাটি হয়েছে মন্থর। অপরদিকে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের বাক্যসজ্জা লঘু, উপবাক্যের সংখ্যা ন্যূনতম। এর কারণ--- প্রথমটিতে বিরাট ইতিহাসের পটভূমিকায় সমাজবিবর্তনের চিত্র স্থান পেয়েছে। ফলে স্থান-কালের বিশালতা বাক্যগঠনকেও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও জটিল করে তুলেছে। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে বুদ্ধিগ্রাহ্য মন্তব্যগুলি ছোট ছোট বাক্যে এমন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে, চিন্তার মধ্যে সহজ চলমানতা লক্ষ্য করা যাবে। প্রথমটিতে বাক্যধারা যেন অবারিত বেগে এবং দ্বিতীয়টিতে উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে মৃদু উল্লম্ফনে বয়ে চলেছে। প্রথমটিতে স্বামী বিবেকানন্দের বাগ্মিতার প্রকাশ--সম্মুখে সহস্র মানুষের দৃষ্টি। দ্বিতীয়টিতে শিষ্য ও গুরুভাইদের সামনে নরেন্দ্রনাথের মৃদু ভাষণ, যার মূল লক্ষ্য শ্রোতার বুদ্ধিকে দীপিত করা।

কখনও কখনও বীর সন্ন্যাসী প্রচণ্ড আবেগে আবিষ্ট হয়ে মত্ত সিংহগর্জনে বলে উঠেছেন

হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল--আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল-- মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই; তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল--ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই--- ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

এই অগ্নিস্রাবী বাক্‌পুঞ্জ কখনও প্রচণ্ড বিস্ফোরণে স্তনিত হয়, কখনও ঋক্‌মন্ত্রের মতো কানে বাজতে থাকে, কখনও ফরাসী বিপ্লবের অশনিনির্ঘোষ প্রতিছত্রে ধ্বনিত হয়। ভাষা বাঙ্ময় হলেও আসলে তা হৃদ্‌স্পন্দন ছাড়া কিছু নয়, তা স্পষ্ট হয় এটুকু অনুধাবন করলে। এ রচনা একটা দিব্য মুহূর্তের সৃষ্টি, আবিষ্ট মনের আত্মপ্রকাশ, সর্বতন্ময়ীভূত সম্বিতের বিদ্যুৎপ্রবাহ--যা শ্রোতার অন্তরকে শুধু স্পর্শ করে না, সমগ্র মনঃ-প্রকৃতিকেই পরম আশ্বাসে ভরে তোলে। চেতনার আবরণভঙ্গ এর ফলশ্রুতি।

স্বামীজীর সাধুভাষা প্রয়োগপ্রসঙ্গে এ মন্তব্য অযৌক্তিক নয় যে, যে-ক্লাসিক গদ্যরীতি, বাক্যগঠন, শব্দসংযোজন প্রভৃতি বাক্‌পদ্ধতি মননধর্মী রচনাকে বহু মনের চিন্তার বাহন করে তুলতে পারে, তার অনেক দৃষ্টান্ত 'বর্তমান ভারত' ও 'ভাববার কথা'য় পাওয়া যাবে। অতিশয় গুরুগম্ভীর সমাস-সংবদ্ধ অথচ পরিচ্ছন্ন চিন্তার বাহন, তাঁর সাধুভাষায় প্রায়শই এই লক্ষণটি ফুটে উঠেছে। বস্তুতঃ তাঁর সাধুভাষার অনেক জায়গায় চলতি রীতি-ইডিয়মেরও প্রভাব দেখা যায়। কোন কোন সময় তার আবিষ্ট মুহূর্তের রচনায় একটা দুর্লভ ভাগবত মহিমা ফুটে ওঠে :

কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে, কেবল আমরা বলি--'হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান কর ... হে বলস্বরূপ!

আমাদিগকে বলবান কর!

এই কয়ছত্র যেন আরণ্যক যুগের আর্যবাণী, কোন্ অলক্ষ্য থেকে আমাদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে।

৩

স্বামীজী-অবলম্বিত যে রীতিটি বিস্মিত প্রশংসা আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে চলিত ভাষা। এই চলিত ভাষাতেই তাঁর অদ্ভুত দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', কিছু চিঠি এবং 'ভাববার কথা'য় সঙ্কলিত দু'একটা বিচ্ছিন্ন নিবন্ধ— এই কয়টি মাত্র তাঁর চলিত গদ্যরীতির রচনা। কিন্তু সমান্য রচনাতেই তাঁর যথার্থ পরিচয় ফুটে উঠেছে।

বাংলা গদ্যের চলিত রীতি আসলে নাগরিক জীবনের বাণীবাহক। সাধুরীতিটি অধিকতর পুরাতন, তা স্বীকার করতে হবে। তিন-চারশ' বছর আগেকার চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজে সাধুরীতিই ব্যবহৃত হত; অবশ্য কাব্য ও গীতিকায় আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবও দুর্লক্ষ্য ছিল না। যাঁরা মনে করেন যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্‌শির দল আর সপারিষদ কেরী সাহেব বাংলা সাধুভাষা সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা ঠিক কথা বলেন না। সাধুভাষা কৃত্রিম ভাষা নয়, ভুঁইফোঁড়ও নয়। বাঙালীর আঞ্চলিক ভাষাভেদ সত্ত্বেও সাধুভাষাই দীর্ঘকাল ধরে সমগ্র বাঙালী মানসকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটা নাগরিক বৈশ্যসভ্যতার পত্তন হল, বিভিন্ন অঞ্চলের বিদগ্ধ ও উচ্চাশীমণ্ডলী--যাঁরা কলকাতা বা তার চারপাশে ঘোরাফেরা করতেন নানা স্বার্থসন্ধানে, তাঁদের দ্বারা কলকাতার ভদ্রজনের কথিত ভাষা আভিজাত্যকামী গ্রামীণ সম্পন্ন পরিবারে অল্পবিস্তর প্রবেশ করেছিল। যাই হোক উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সাহিত্যে সঙ্কুচিতভাবে কলকাতার চলিত ভাষার সাধ্বস প্রবেশ ঘটল। রঙ্গরস, সাময়িক পত্রে 'আর্যাতর্জা', 'ঠনঠনের হঠাৎ-অবতারগণের' মর্কটলীলা প্রভৃতি বর্ণিত হতে লাগল কলকাতার কক্‌নি ভাষায়। নাটকে ভদ্রেতর ব্যক্তির সংলাপেও কলকাতার বৈঠকী ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছিল, উপন্যাস-রমন্যাসেও কলকাতার ভদ্রসমাজের চলিতভাষার অনুপ্রবেশ ঘটল। ১৮৬২ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা' প্রকাশ করলেন পুরোপুরি উত্তর কলকাতার কক্‌নি বুলিতে, মায় ক্রিয়াপদ সর্বনামগুলিও চলিত রীতির বিকৃত উচ্চারণের মত ছাপা হল। প্যারীচাঁদ মিত্র হালকা চালের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, আঞ্চলিক ভাষার সাহায্য নিয়েছিলেন, কলকাতায় ব্যবহৃত সর্বনাম ক্রিয়াপদও ব্যবহার করেছিলেন— কিন্তু পুরোপুরি চলিতভাষায় তিনি কোন গ্রন্থ লেখেননি, তাঁর রচনার বহু স্থলেই সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের গোলমাল থেকে গেছে। ভাষার এ-ব্যাধিটি উনিশ শতক ধরেই বর্তমান ছিল, রবীন্দ্রনাথের আগে অপরিহার্য বলে সকলেই মেনে নিয়েছিলেন--অনেকটা দুধ ও জলের সংমিশ্রণের মত। মধুসূদন প্যারীচাঁদের ভাষাকে মেছুনীদের ভাষা বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। এর কারণ প্যারীচাঁদ উপন্যাস ও কাহিনীর প্রত্যক্ষ উক্তিতে সাধারণ লোকের মুখের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি চলিত ভাষার সাহায্য নেননি। হুতোম (কালীপ্রসন্ন) রঙ্গব্যঙ্গের জন্যই কলকাতা কক্‌নির সাহায্য নিয়েছিলেন; খুব গভীরতা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন হুতোমি জ্যাঠামি ছেড়ে ক্লাসিক সাধুরীতির শরণ নিয়েছিলেন। তাঁর ভাষার মধ্যে কলকাতার পথচারীদের অমসৃণ উক্তি, এমন কি বিকৃত রুচির অশ্লীল শব্দও স্থান পেয়েছে। এ ভাষায় প্রাক-যৌবনের চাঞ্চল্যই বেশী; কিন্তু সর্বকর্মে চলিত ভাষা প্রয়োগ করতে হবে, একথা বিবেকানন্দের পূর্বে কোনো বাঙালী সাহিত্যিক বলেননি। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি 'Calcutta Review' পত্রে বিশুদ্ধ

চলতি ভাষার পক্ষ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সাধুভাষা, বিশেষতঃ তৎসম শব্দের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতামত উগ্র ছিল বলে সরল ভাষার পক্ষপাতী বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর তৎসম শব্দের প্রতি অযৌক্তিক বীতরাগ সমর্থন করেননি। অবশ্য শ্যামাচরণ বৈয়াকরণ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই সর্বকর্মে তদ্ভব বা দেশজ শব্দের ব্যবহার অনুমোদন করেছিলেন। 'সবুজপত্রে'র পূর্বে রবীন্দ্রনাথও সর্বকর্মে চলিত ভাষা প্রয়োগে উদারহস্ত হতে পারেননি। প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে'র মারফতে চলিত ভাষার পক্ষ অবলম্বন করেন এবং নিজেও কলকাতার চলিত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করেন। ইদানীং কেউ কেউ তাঁকে চলিত ভাষা ব্যবহারের একমাত্র পুরোযায়ী বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহারের গৌরব সর্বাগ্রে বিবেকানন্দের প্রাপ্য।

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় চলিত ভাষার বৈয়াকরণ ও ব্যবহারিক যৌক্তিকতা আলোচনা করেছিলেন, হুতোম ব্যঙ্গবিদ্রূপে রসান চড়াবার জন্য কলকাতার বুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। কিন্তু যে-কোনো চিন্তার ব্যাপার, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, তত্ত্বালোচনা— সমস্তই চলিত ভাষার চলবে, একথা স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, এবং নিজেও চলিতভাষা ব্যবহারে যেমন অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়াছেন, তেমনি নিজস্ব একটা ভাষারীতিও গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর চলিত ভাষার অনেকস্থলে তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হলেও, যে ভাষায় আমরা কথা বলি, আলাপ-আলোচনা করি--সেই ভাষাই মনের ধাত্রী, এরকম একটা স্পষ্ট ধারণা তাঁর ছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর একটি লেখায় তাঁর মনের ভাব চমৎকার ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন—

> চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর ; তবে লেখবার বেলা ও একটা কিম্ভুতকিমাকার উপস্থিত কর?... স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না...। ('ভাববার কথা')

তাই তিনি প্রস্তাব করলেন— 'যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে. তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথাকওয়ার ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করবেন।' একথাটাই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন আরও একদশক পরে।

স্বামীজী বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের হুবহু অনুকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখালেন —

> যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নতুন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচাভাব রাশিকৃত ফুলচন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্‌রে সে কি ধুম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে 'রাজা আসীৎ'। আহা-হা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!— ওসব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হয় তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু'হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই। ('ভাববার কথা')

বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' বিশুদ্ধ মুখের বুলি ব্যবহার করেছেন, এমন কি সংলাপের ধরনধারণ, রীতিনীতি ও মুদ্রাদোষগুলিও তিনি পরিত্যাগ করেননি। তাঁর চলিত রীতি অত্যন্ত জীবন্ত ; প্রাণবান জীবনরসিক নিঃস্পৃহ বৈরাগীর মুখ থেকে নিঃসৃত

হয়েছে বলে তাঁর ভাষা অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব লাভ করেছে। হুতোমের স্ল্যাং বাক্‌রীতি বা পৌগণ্ডোচিত ধৃষ্টতা স্বামীজীর চলিত-রীতিতে নেই, অথচ খোলামেলা বৈঠকী রসিকতার প্রাচুর্য তাঁর গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চলের অন্তরালে অবস্থিত সদাহাস্যময় মনটাকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে। বীরবলের বুদ্ধির মারপ্যাচ ও কৃত্রিম কলাকৌশলও তাঁর ভাষায় স্থান পায়নি—' যদিও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'-এবং 'পরিব্রাজকে' দর্শন-ইতিহাস-সমাজ-সম্বন্ধে বহু মননশীল আলোচনা আছে। যথার্থ বলতে গেলে হুতোম বা বীরবল—কারো ভাষাই প্রকৃত সাহিত্যিক চলিত ভাষা নয়। হুতোমের ভাষা এতটা চলিত, ঘরোয়া ও বে-আব্রু যে, তাঁর ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রসন্ন মন্তব্য খানিকটা স্বীকার করে নিতে হয়। প্রমথ চৌধুরীর ভাষা কৃত্রিম ও ড্রয়িংরুমবিলাসী এবং ইচ্ছাকৃত বৈদগ্ধ্যপূর্ণ। হুতোমের ভাষা একেবারে পথের ভাষা, বীরবলের ভাষা বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্রম্ভালাপের বাঙ্‌ময় পায়চারি। এর কোনটাই যথার্থ চলিত ভাষা নয়, স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে'র গদ্যই চলিত ভাষার আদর্শ। 'পরিব্রাজকে'র ভাষাও চলিত, চিত্তাকর্ষী; তবে চিঠির ভাষা বলে এতে ব্যক্তিগত ঘরোয়া ঢঙটা বেশী ফুটেছে।

বিবেকানন্দের চলিত গদ্যরীতি যে বিচিত্রমুখী— অনেকটা সহস্রমুখী বজ্রমাণিকের মত, তা বোঝা যাবে তাঁর উল্লিখিত দু'খানি পুস্তিকা থেকে। যে ভাষায় আমরা আলাপ করি, চিন্তা করি, সিদ্ধান্তে পৌঁছাই— সেই সহজ প্রত্যক্ষ সর্বজনবোধ্য চলিত গদ্যরীতির পক্ষ সমর্থন করে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, নিজেও পত্র ও অন্যান্য রচনায় সাধ্যমত এই রীতি ব্যবহার করেছেন। এই রীতিটির বৈশিষ্ট্য— শব্দযোজনায় তৎসম শব্দের স্বল্প ব্যবহার, বাক্যগঠন হ্রস্ব, ঢঙটা সংলাপের মত। যেমন :

"আসল কথা হচ্ছে, যে-নদীটা পাহাড় থেকে ১০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্তই করে, ত ইদিক-উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এই মাত্র। সে নদী যেমন করেই হোক, সমুদ্রে যাবেই, দু একদিন আগে বা পরে, দুটো ভালো জায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় দু'একবার আঁস্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশহাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে ত আর ত এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই ত নয়।" ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

এখানে লক্ষ্য করতে হবে, এর ভাষাভঙ্গিমা বাধাহীন স্বচ্ছ, অনাবশ্যক তৎসম শব্দের প্রয়োগ নেই, লেখক চলিত ভাষার মুদ্রাদোষগুলিও ('ইদিক উদিকে') নিয়েছেন ; তাই বলে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত তিনি তৎসম শব্দের প্রতি অকারণে খড়্গহস্ত হননি। এর সঙ্গে বীরবলের রচনার যে-কোন অংশ মিলিয়ে পড়লেই 'কৃষ্ণনাগরিক' প্রমথ চৌধুরীর বৈঠকীভাষার কৃত্রিমতা সহজেই ধরা পড়বে। যখন প্রমথ চৌধুরী বলেন 'প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিম্বা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য নয়— কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম। পুরুষের মন প্রকৃতি-নর্তকীর মুখ দেখবার আয়না নয়।' —তখন এ ভাষার চাকচিক্যে মুগ্ধ হলেও বার বার মনে হয় যে, এ দরবারী ভাষা এবং তা খাস-দরবারের অন্তর্ভুক্ত। 'যাঁর বোধ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্যের দর্শনলাভের জন্য শিবনেত্র হন ; এবং যাঁর মন নেই, তিনিই মনস্বিতালাভের জন্য অন্যমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন'—বীরবলের এ সমস্ত উইটের ফুলঝুরি মার্জিত রুচির তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম— কিন্তু এ ভাষা মোজাইকের মত চিত্রবিচিত্র, ঝরণার মত ঝরঝরে নয়! স্বামীজীর ভাষা মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের জন্য নয়, বারোয়ারিতলায় ইতরভদ্রের জন্যই তাঁর ভাষাপ্রবাহে রয়েছে স্নানপানের উদার আহ্বান।

অতঃপর স্বামীজীর বিবৃতিমূলক পরিচ্ছন্ন গদ্যরীতির আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে:

> এবার ভূমধ্য সাগর। ভারতবর্ষের বাহিরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নেই—এসিয়া আফ্রিকা, প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। একজাতীয় রীতিনীতি খাওয়া-দাওয়া শেষ হল, আর একপ্রকার আকৃতি প্রকৃতি, আহার বিহার, পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, আরম্ভ হল——ইউরোপ এল। শুধু তাই নয়— নানা বর্ণ, জাতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও আচারের বহু শতাব্দীব্যাপী যে মহা-সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্র এইখানে। ('পরিব্রাজক')

এখানে লেখক দুই সভ্যতার মিলনতীর্থকে নিঃস্পৃহ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন, তাই এতে ঘটনাবিবৃতি ছাড়া আর কোন সাহিত্যিক কৌশল নেই। কিন্তু সাদাসিধে বর্ণনাই বিচিত্র রূপময় হয়ে ওঠে যখন আবেগের ছোঁয়া লাগে, তখন সন্ন্যাসী পরিব্রাজকের কণ্ঠে কল্পনার খেলা শুরু হয়ে যায়:

> জাহাজ একবার সাদা জলের একবার কালো জলের উপর উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাভ, সামনে পেছনে আশে-পাশে খালি নীল-নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটী কোটী অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে ছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহাগর্জন বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে।

এ বর্ণনায় তৎসম শব্দঝঙ্কারের প্রয়োজন ছিল। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রোল্লাসের রূপধ্বনিময় চিত্রাঙ্কন শুধু তদ্ভব বা দেশজ শব্দেই সার্থক হতে পারে না; তাই তিনি চলিত ভাষার পক্ষপাতী হয়েও প্রয়োজনস্থলে অনেক আভাঙা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেননি। যেমন ধরা যাক্ এই দৃষ্টান্তটি—'সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিকসমুত্থিত ভাববিকাশমোহিনী সঙ্গীত, মনীষি-মনঃ-সংঘর্ষসমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ, সকলকে দেশকাল ভূলিয়ে মুগ্ধ করে রাখত—তারও শেষ' (পরিব্রাজক)। এখানে শুধু একটি-দুটি অসমাপিকা আর একটি সমাপিকা ক্রিয়া ভিন্ন আর সমস্ত শব্দই তৎসম, কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষণ ও বিশেষ্য মণিকাঞ্চনের মত দৃঢ়নিষণ্ণ, এবং বিশিষ্ট ভাবপ্রকাশের সম্পূর্ণ সহায়ক। আবার তিনি যখন স্নিগ্ধ মধুর বর্ণনায় লেখনী চালনা করেন, তখন এক প্রকার কোমল পেলব পরিচিত ও প্রসন্ন তদ্ভব দেশী শব্দের সাহায্য গ্রহণ করেন। যেমন :

> জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল নারিকেল, খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত সইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ— এতে কি রূপ নাই? সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ, তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলছে, তার নীচে, ফিকে ঘন, ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আম নীচু জাম কাঁটাল— পাতাই পাতা গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশপাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে দুলচে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানি তুর্কিস্তানি গাল্‌চে দুলচে কোথায় হার মেনে যায়, সেই ঘাস, যত দুর যাও, সেই শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক কোরে রেখেছে। ('পরিব্রাজক')

এর মধ্যে বাঙলাদেশের শ্যামারমান অরণ্যানী, পীত রৌদ্রস্নাত ধানক্ষেত আর নীলাম্বরী আকাশ যেন রঙের বাটিটি উপুড় করে দিয়েছে। স্বভাবোক্তির সঙ্গে উৎপ্রেক্ষার, চোখে দেখা রূপের সঙ্গে মনের কথার আশ্চর্য সমন্বয় বাঙলাদেশের কোন্ গদ্যশিল্পীর রচনায় এর চেয়ে

সার্থক, প্রাণবন্ত, বর্ণধ্বনিময় হতে পেরেছে? অথচ এ বর্ণনায় স্বামীজী কৃত্রিম কাব্যকলার মায়াঞ্জন একেবারেই ব্যবহার করেননি। চিঠিতে সমুদ্রের বর্ণনা দেবার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে, কাব্যরসসিক্ত বর্ণনা তাঁর ধাতে সয় না—'ফলকথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন খপ্ করে স্বভাবের সৌন্দর্য কোথা পাই বল?' কিন্তু বর্ণনধর্মী রচনায় স্বভাবোক্তি অনুসরণ করেও তিনি যে নিপুণ শিল্পসৃষ্টি করতে পেরেছেন, তার প্রমাণ এই ছত্রক'টি—যদিও এ বাক্‌রীতি বিলম্বিত, উপবাক্যের সমন্বয়ে একটু দীর্ঘ, তবু এর ভঙ্গিমায় শব্দের টঙ্কার ও ঝঙ্কার মিশে গেছে প্রতিদিনের পরিচিত বিবর্ণদৃশ্য বর্ণনার সঙ্গে, এবং সেটা বেমানান হয়নি, কারণ এতে প্রচ্ছন্নভাবে কৌতুকের সুর মেশানো আছে।

> কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চির নীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গ-তরঙ্গভঙ্গ কল্লোলশালী কত বারিনিধি দেখলুম, ডিঙুলুম, পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম-ঘড়ঘড়ায়িত ধুলিধুসরিত কলকেতার বড় রাস্তার ধারে কিংবা পানের পিক-বিচিত্রিত দেওয়ালে, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো মুখরিত একতালা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে আঁবকাঠের তক্তায় বসে থেলো হুঁকো টানতে টানতে, কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর মরুভূমি প্রভৃতি যে হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত কোরে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন—সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা। ('পরিব্রাজক')

স্বামীজীর বিবৃতিধর্মী চলিত গদ্যে কখনও লক্ষ্য করা যাবে তাত্ত্বিক ও তথ্যগত বিবৃতি (যেমন 'পরিব্রাজকে'র ভ্রমণ বর্ণনা ও ধর্ম-দর্শন আলোচনা), কখনও চলিত ভাষার মধ্যেই তৎসম শব্দের নির্ঘোষ, কখনও তৎসম-তদ্ভব-দেশজ-বিদেশী শব্দের একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে মিলে মিশে থাকার আশ্চর্য দক্ষতা। একই বর্ণনায় তিনি লিখেছেন— 'সেই নির্মল নীলাভ জল, যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোণা যায়' আবার তারই সঙ্গে, 'কর্দমাবিলা হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা সহস্র পোতবক্ষা কলকেতার গঙ্গার' বর্ণনা অবিরোধে স্থান পেয়েছে। কখনও তিনি রূপরঙের নেশায় 'গঙ্গামায়ের শোভা' দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কখনও বা কল্পনা করে শিউরে উঠেছেন—"পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিম্‌নী।"

বিবেকানন্দ বিবৃতি ও বর্ণনাধর্মী চলিত গদ্যরীতির মধ্যে বহুস্থলে সমাসবদ্ধ তৎসময় শব্দ ব্যবহার করছেন, চলিত ভাষাতে এরকম গাঢ় বাক্‌পদ্ধতি সৃষ্টি তাঁর একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। ঘনপিনদ্ধ বা সমাসবদ্ধ দৃঢ়গাঁথুনির বাক্‌পুঞ্জের প্রতি তাঁর কোন অকারণ বিরাগ ছিল না, তিনি চলিত ভাষার অন্বয়ের মধ্যে তৎসম শব্দঝঙ্কারকে এমন চমৎকার ভাবে মিশিয়ে দিতে পারতেন যে, ইদানীন্তন কালের কোন দুঃসাহসী লেখকও অতটা অগ্রসর হতে সঙ্কুচিত হবেন। যেমন স্বামীজীর এই বর্ণনা:

> ত্রিংশকোটি মানবপ্রায় জীব— বহু শতাব্দীযাবৎ স্বজাতি বিজাতি স্বধর্মী বিধর্মীর পদভরে নিপীড়িত-প্রাণ দাসসুলভ পরিশ্রম-সহিষ্ণু দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীতহীন, ভবিষ্যৎবিহীন, যেন তেন প্রকারেণ বর্তমান প্রাণধারণমাত্র প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি অসহিষ্ণু হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচ চাতুরী প্রতারণাসহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের যমস্বরূপ, বলহীন আশাহীনের সমুচিত কদর্য ভীষণ কুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক মেরুদণ্ডহীন, পূতিগন্ধময় মাংসখণ্ডব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারত-শরীরে পরিব্যাপ্ত— ইংরাজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি! ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

একটি মাত্র বাক্য, সমাসবদ্ধ শব্দের শিকল —যা অনিপুণ কারিগরের হাতে পড়লে

জড়ীভূত রোমন্থনে পরিণত হতে পারত, এখানে স্বামীজীর বিচিত্র বয়নকৌশলে সেই ভাষায় ভারতীয়দের বর্তমান জাড্যের প্রতি বলদর্পিত পাশ্চাত্যের ঘৃণা ধিক্কার চমৎকার ফুটেছে। এখানে এর চেয়ে হালকা ছাঁদের শব্দ ব্যবহার করলে যথেষ্ট তীব্র হত না; তাই চলিত ভাষার মধ্যে তিনি অবলীলাক্রমে দেবভাষার সাহায্য নিয়েছেন; আবার পাশ্চাত্যের প্রতি আমাদের অন্তঃ মনোভাব কৌতুকঘৃণামিশ্রিত ভাষায় চমৎকার ফুটেছে :

আমরা দেখি, শৌচ করে না, আচমন করে না, যা-তা খায়, বাছ-বিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ,—এ জাতের মধ্যে কি ভালরে বাপু! ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য')

আমাদের বক্তব্য হল, চলিত রীতিতে তিনি শুধু তদ্ভব ও দেশী শব্দ ব্যবহার করেননি, বহুস্থলে প্রায় মুখের কথার প্রচলিত ঢঙটাকেও নিয়েছিলেন। হুতোম টানা গদ্যরচনায় এই নাটকীয় রীতিটি গ্রহণ করেছিলেন,[১] উত্তর কলকাতার পুরানো বাসিন্দাদের ভাষারীতি, যা হুতোম কলমবন্দী করেছিলেন ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচা দেবার জন্য, বিবেকানন্দ সেই মুখের ভাষাকেই বিবৃতিমূলক বর্ণনায় ব্যবহার করেছেন; অবশ্য কোন কোন স্থানে কৌতুকরসের জন্যই তিনি এই মৌখিক সংলাপের ঢঙটা নিয়েছেন। যেমন— 'খাবার সময়ে শত ছোরার চক্‌চকানি, আর শত কাঁটার ঠক্‌ঠকানি দেখে শুনে তু-ভায়ার ত আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাশে পার্শ্ববর্তী রাঙ্গাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘাঁচ করে ছুরিখানা তাঁর গায়েই বা বসায়। ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা! বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সি-সেকনেস হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি-আল্মীকি কত জান ; আমাদের গোঁসাইজী ত কিছুই বলেন না।' এ ভাষার কৌতুক রসটাকে একেবারে আটপৌরে ভাবে পরিবেশন করেছেন, এ ভাষা এখনও ভদ্রাভদ্র সকলেই ব্যবহার করে থাকি। স্বামীজী প্রতিদিনের প্রচলিত মুখের কথাকে কোনও দিন অসম্মান করেননি, চলিত বাংলার নাগরিক ইডিয়ম তাঁর রচনার যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। দু-চারটির দৃষ্টান্ত—

খ্যাঁদা-বোঁচা ভাইবোন; হাঁকোচ-হাঁকোচ গরুর গাড়ী, দ্যাল (দেয়াল); বে (বিয়ে); ফুঁ-ফাঁ দিয়ে আগুন দিতে হয়; কায়েত-ফায়েতের বাপদাদা করেছে; লাথি ঝাঁটা; হাত চুবড়ে সপাসপ দালভাত খাই; সোঁদোর বন ; যাত্রীরা ন্যাকার করে অস্থির ; আদুড় গা ; জাতের দফা ঘোলা হচ্ছে ; ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পীরিতের কবিতা লেখেন. আর বিরহের জ্বালায় হাসেন হোসেন করেন ; মাগ ; আদাড়ে; মাগী ; বিবি পর্যন্ত বে' করা চলে ; এঁড়েলাগা ছেলে; গো-বেড়ন দিলে ; ছুঁতছাঁতের ন্যাঠা (ল্যাঠা); শোরের মাংসো ; চক্কর ; পা ফেটে চৌচাকলা ; হাতপা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে ; ভুঁড়িনাবা বদহজমের প্রথম চিহ্ন, কলের জলের দুশো বাপান্ত করে।

এখানে খুব বেছে বেছে উদাহরণ তোলা হয়নি, যেমন চোখে পড়েছে তেমনি তাদের সংগ্রহ করা হয়েছে। এ শব্দগুলি অধিকাংশই আমরা ঘরে ব্যবহার করি, বাইরে হয়তো একটু পোষাকী পালিশের সাহায্য নিই। স্বামীজী 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' লঘু-রসের কথায় এরূপ শব্দ প্রচুর ব্যবহার করেছেন— এমন কি গম্ভীর আলোচনাতেও কলমের ডগায়

---

১ কলকাতার চড়ক পার্বণ হুতোমের রঙ্গরসপূর্ণ তীক্ষ্ণ নাটকীয়তা বেশ কৌতুকপূর্ণ হয়েছে—'আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেছেন— আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্ছুগু করবেন।...আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে, আবার ফি বুধবার সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা, না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ. যে বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদভিন্ন অন্যভাষায় তাঁকে ডাকলে তিনি বুঝতে পারবেন না—আড্ডা থেকে না ডাকলে শুনতে পাবেন না?'

নেমে-আসা প্রাকৃত শব্দকে সরিয়ে দেননি। জীবনে তিনি ছুঁতমার্গের ঘোরতর শত্রু ছিলেন, ভাষাতেও ছুঁই-ছুঁই বাতিক তাঁর একেবারেই ছিল না। প্রমথ চৌধুরী এরকম খিড়কী দরজার শব্দকে কখনও সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ঢুকতে দিতেন না। ফরাসী বৈদগ্ধ্যে আযৌবনলালিত বীরবল চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু তাকে 'মে-ফ্লাওয়ারে'র শাসনে সুভব্য করে তুলেছেন।

৪

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ চলিত বাংলা রীতিকে যে রকম চমৎকার রসিকতা ও রঙ্গব্যঙ্গে ব্যবহার করেছেন, সদাগম্ভীর বাঙালী- উচ্চ সমাজে তার জুড়ি মেলা ভার। রসিকতা প্রসন্ন মনের ধর্ম, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ক্ষুব্ধ মনের ধর্ম। মাঝে মাঝে স্বামীজী রসিকতা করতে করতে তীব্র বিদ্রূপের ঝাঁঝালো শব্দ নিক্ষেপ করেছেন বটে, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন জীবনরসিক— যে বৈশিষ্ট্যটি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে ছিল। খুব উদার হিউমার অনেক সময় সাধুভাষাতেই যেন বেশী জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বিবেকানন্দের বাংলা রচনার যত্রতত্র চলিত ভাষার আশ্চর্য পরিহাস ও তির্যক ব্যঙ্গের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যাবে। 'পরিব্রাজকে' সুয়েজখালের হাঙ্গর শিকারের বর্ণনায় হাঙ্গরের প্রতি সম্ভ্রম বাচক সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে সহজ রসিকতাকে তিনি মজলিসী করে তুলেছেন :

> মনে হল উনি বুঝি হাঙরের বাচ্চা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলুম--তা নয়। ওঁর নাম বেনিটো। পূর্বে ওঁর বিষয় পড়া গেছলো বটে, ওঁর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ--তাও শোনা আছে। এখন ওঁর তেজ আর বেগ দেখে খুশী হওয়া গেল।

হাঙর ধরা দেখবার জন্য তাঁরা জাহাজের ডেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন :

> আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারাণ্ডায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে-- শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম, এবং যার জন্য মানুষ ঐ প্রকার ধড়ফড় করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগলো--অর্থাৎ 'সখি, শ্যাম না এলো।'

তারপর কিভাবে হাঙর টোপ গিলে কোনও প্রকারে টোপের বঁড়শি খুলে পালাল, অন্য একটা 'বাঘা' হাঙরের আবির্ভাব হল, শুয়োরের মাংসসমেত বঁড়শি গলাধঃকরণ করল, তারপর 'দে টান, দে টান' করে তাকে জাহাজের ডেকে তোলা হল, স্বামীজী তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। 'সাদা লাল জরদা' রঙের বঁড়শিবিদ্ধ শূয়োরের মাংসের রঙিন উপমাটিও grotesque রসের আশ্চর্য উদারহণ— 'আসল ইংরেজি শুয়ারের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে রঙ-বেরঙ্গের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে—' একেই যথার্থ মজলিসী রসিকতা বলে। তার পর টোপে গাঁথা বিরাট হাঙর ধরা, জাহাজে টেনে তোলা, 'ফৌজিম্যানে'র মুমূর্ষু হাঙরের ওপর দুম্‌দুম্ করে কড়িকাঠ প্রহার করে বীরত্ব প্রকাশ করা এবং সর্বোপরি করুণহৃদয় মহিলাদের শোকার্ত বিলাপ বর্ণনা ('আর মেয়েরা— আহা কি নিষ্ঠুর, মের না, ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগল— অথচ দেখতে ছাড়বে না!') অনাবিল রসিকতার সার্থক দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ এই জাতীয় রসিকতা এমন একটি প্রসন্ন অথচ নিঃস্পৃহ মনের ধর্ম, যা বৈরাগ্য-ব্রতীদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু স্বামীজী তো গিরিদরীবাসী মুমুক্ষু সাধকমাত্র ছিলেন না, জগৎ ও জীবনের অন্তস্তলেই তিনি তাঁর আসন পেতেছিলেন, তাই প্রতিদিনের জীবনের অসঙ্গতি, হাস্যপরিহাস তাঁর বিশালহৃদয়কে সুধারসে সিক্ত করেছিল। তাঁর এই ব্যঙ্গ রঙ্গ ও পরিহাস কি রকম অর্থবহ হয়েছে, তা এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে :

ওহে বাপু, যীশুও আসেননি, জিহোবাও আসেননি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এ দেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন— এদেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড়না কেন? তোমাদের দুচার জনের জন্য দেশশুদ্ধ লোককে হাড় জ্বালাতন করতে হবে বুঝি? ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

এখানে পরিহাস তীব্র রূপ ধরেছে। আর্যামির অভিমান আর সমাজের নিম্ন বর্ণের ঘৃণা, স্বামীজীকে রুদ্ররোষে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে বার বার। উচ্চবর্ণের প্রতি তাঁর ধিক্কারবাণী এখনও অর্ধশতাব্দীর ওপার থেকে ভেসে আসছে— 'আর্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্'* বলে ডম্ফাই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি!' এই অতীতজীবী আভিজাত্যকে বিদ্রূপ করে তিনি ধারালো কণ্ঠে বলেছেন— 'এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরুমরীচিকা, তোমরা— ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূতকাল, লুঙ্ লঙ্ লিট সব একসঙ্গে। বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুস্বপ্ন!' বলতে বলতে তিনি ভারতের হীন অন্ত্যজ মানুষের দিকে চেয়ে দেখলেন— দেখলেন ভারতের মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে' বলে নতুন ভারত বেরিয়ে আসবে। সেই ভাবী ভারতের নবজাগরণ লক্ষ্য করে স্বামীজী যেন দিব্যদৃষ্টির দ্বারা আগামীকালকে প্রত্যক্ষ করলেন :

> তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। ('পরিব্রাজক')

এ যেন স্তোত্র— 'প্রাণায় স্বাহা' বলে পূষণের কাছে হবিঃ দানের দিব্যমুহূর্তে উচ্চারিত উজ্জীবন মন্ত্র।

বিবেকানন্দের গদ্যরীতি সম্বন্ধে তাযাতাত্ত্বিক গবেষণা করা হয়নি; বাংলা গদ্য গঠনে তিনি যে অভূতপূর্ব প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছেন, তৎসম-তদ্ভব দেশজ শব্দ, বাইরের ভব্য ভাষা এবং ঘরের আটপৌরে ভাষার আশ্চর্য মিল ঘটিয়েছেন, তার স্বরূপলক্ষণ নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ আছে। চলিত-ভাষাকে তথাকথিত বিদগ্ধ ভ্যবরূপ না দিয়ে তাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি এনে, তাতে ওজঃ ও রস সঞ্চার করে তিনি চলিত গদ্যকে যে আকার দিতে চেয়েছিলেন, নানা কারণে তার দিকে সে যুগের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি ততটা আকৃষ্ট হয়নি। 'সবুজপত্র' প্রকাশের পর থেকে প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা চলিত গদ্যরীতি যখন যথার্থ সাহিত্যের দরবারের আসনটিকে জবর দখল করে নিলে, তখনও বড় কেউ ভেবে দেখেননি যে, তারও পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ চলিত বাংলা গদ্যের যথার্থ রূপ পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং এর সাহায্যে বাক্‌রীতির নানা বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সর্বনাম আর ক্রিয়াপদের লঘুকরণই যে চলিত রীতির প্রধান লক্ষণ নয়, তা স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' পড়লেই বোঝা যাবে। চলিত রীতির বড় কথা—

* আর্যামির নিন্দা করে তিনি 'পরিব্রাজকের' এক জায়গায় এই 'ডম্‌ম্‌ম্-এর উল্লেখ করে বলেছেন — "একটা ডোম বলত, 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌ম্!"

চলতিজীবনের ইডিয়ম, বাগ্‌বৈশিষ্ট্য, বাক্যগঠনের নূতন রীতি, শব্দবিন্যাসের রূপান্তর। সাধুভাষার ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম ছোট করে ছেঁটে দিলেই কিছু চলতি ভাষা হয় না। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, 'বাঁদরের ল্যাজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়'? এই উক্তিকে একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, সাধুভাষার ক্রিয়াপদ-সর্বনামকে ছোট করলেই কি চলিত ভাষা হয়? সে-কথা বিবেকানন্দ বিশেষভাবে বুঝতেন, এবং বুঝতেন বলেই তাঁর ভাষা যথার্থ মুখের ভাষার সাহিত্যিক রূপ লাভ করেছে, বিদগ্ধ ইষ্টগোষ্ঠীর রসচর্বণায় পর্যবসিত হয়নি।

আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে

১

আদি, মধ্য ও আধুনিক কালে প্রায় সাড়ে ন'শ বছরের (১০ম-১৯৯৫) মধ্যে বহু কবি বাংলা ভাষায় নানা ধরনের কাব্যানুশীলন করে বাংলা কাব্যের মূল বনিয়াদ স্থাপন করেন। এর মধ্যে দশম শতাব্দীর বজ্রযান ও সহজযান সম্প্রদায়ভুক্ত তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদের সাধনগীতিকা ('চর্যাগীতিকোষ') থেকে শুরু করে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যু (১৭৬০) পর্যন্ত ব্যাপ্ত বাংলা কাব্যের প্রাগাধুনিক যুগ— যে-যুগ প্রধানত বিভিন্ন ধর্ম ও উপধর্মসম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত । তার পর ইংরেজ অধিকারের সূচনা, যার ফলে বাঙালির মধ্যযুগীয় সংস্কার অপসৃত হল, পাশ্চাত্য সভ্যতার পাখায় ভর করে এল নবযুগ। রামমোহন উনিশ শতকের তিন দশকের মধ্যেই বাঙালির স্থবির চেতনায় বজ্রাঘাত করলেন । প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু কলেজ (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮), সরকারি সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪) । আবির্ভাব হল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার, শ্রীরামপুর খ্রীস্টান মিশন থেকে মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) । কলকাতাকে কেন্দ্র করে চেতনার সাগরমন্থন শুরু হয়ে গেল । মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ এই সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের দ্বারা আলোড়িত হলেও তখনও বাংলা সাহিত্যে সে উত্তাপ সঞ্চারিত হয়নি, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজ-শিক্ষা-ধর্মান্দোলনের উচ্চকিত কোলাহলের মধ্যে বাগ্‌দেবীর বীণাযন্ত্রটি নীরব হয়েই ছিল । ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮) ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬-১৮৮৭) কাব্য-কবিতা রচনা শুরু করলেও তাঁদের আধুনিক কবি বলা যায় না । রঙ্গলাল তাঁর ইতিহাস-আশ্রয়ী কাব্যে আধুনিকতার কেবল অঞ্চলপ্রান্ত স্পর্শ করতে পেরেছিলেন । ঈশ্বর গুপ্ত রঙ্গের কবি, যাকে বলে 'vers de societe'-র ছড়াকার । মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে এসে কর্ম ও চিন্তায় বিস্ময়কর আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিলেও কবিতা রচনায় তিনি আদিরসের গলিত আদর্শ পরিত্যাগ করতে পারেননি।

আধুনিক ভাব ও মননের ধ্বজপতাকা বহন করে এলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। বাংলা পুরাণাশ্রয়ী আখ্যান-কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব'ই (১৮৬০) বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কাব্য, যাতে বাঙালির মধ্যযুগীয় সংস্কারে এবং কলকাতার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধ চেতনায় ফাটল ধরল । শুরু হল বাংলা কাব্যের আধুনিক যুগের পক্ষতাড়না । সদ্যোজাত মহাগরুড়ের খাদ্য চাই । সেই খাদ্য যোগালেন উনিশ শতকের বাঙালি কবিরা— কেউ মহাকাব্যের অনুষ্ঠানে, কেউ খণ্ডকাব্যে, কেউ-বা গীতিরসসিক্ত ব্যক্তিপ্রাধান্যের নতুন রূপ দিলেন । ক্রমে বাঙালির আসর থেকে কীর্তন-পদাবলী, শাক্ত 'মালসী' গান, সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউল গান, কবিগান, আখড়াই-হাফ-আখড়াই, যাত্রা, পাঁচালী, টপ্পাগান বিদায় নিল—আখড়াই আসরে রেড়ির তেলের ধুমাংকিত শেজপ্রদীপ ম্লান হয়ে এল। এবার কাব্যপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন আধুনিক যুগের নব্য কবিগোষ্ঠী। পুরোদমে মহাকাব্য রচনা চলল, কিন্তু বাঙালির কুলধর্মে গীতিকবিতাই কালজয়ী হল, মহাকাব্য তার সাজপোশাক ও বীররসসহ অদৃশ্য হয়ে গেল। মধুসূদন 'মেঘনাদবদ কাব্যে' (১৮৬১) বাঙালি-সংস্কারের বদ্ধ জলাশয়ে সাগরসংগীত এনেছিলেন, কিন্তু তাও উপযুক্ত সন্ততি না রেখে বিদায় নিল। ক্রমে

কাব্য-কবিতার যাবতীয় শাখা-প্রশাখা গীতিরসের মধ্যে নির্বাণ লাভ করল। গীতিকবিতাই বিচিত্র ঐশ্বর্য নিয়ে সহস্রদল পদ্মের মতো ফুটে উঠল। সেই পদ্মের মৃণাল হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই একথা অসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬০-১৮৬১) থেকে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান (১৯৪১) পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক আশী বছর ধরে বাংলা কাব্যের আধুনিক পর্যায় নানা তরঙ্গ-বিভঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা শাখার মতো কাব্য-শাখাও একালের অন্নবস্ত্রে মানুষ—যার পিছনে আছে পশ্চিম সমুদ্রপারের লবণাক্ত অম্বুবিম্বের স্পর্শ। বস্তুত আধুনিক বাংলা সাহিত্য ইংরেজি ভাষাভাষী পশ্চিমি সাহিত্যের ভাব-ভাষা মনন ও রচনাভঙ্গি স্বীকরণের দ্বারা আত্মস্থ করতে পেরেছিল বলেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্য সীমাবদ্ধতার কূল ছেড়ে বারদরিয়ায় ভেসে যাবার সাহস সঞ্চয় করেছিল। কাজেই আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে য়ুরোপ-আমেরিকার কবি ও কাব্যপ্রসঙ্গ উঠলে তাকে ঔপনিবেশিক দাসত্বের ভীরুতা বলে উপহাস করা উচিত হবে না।

প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যানে দেব-সেনাপতি কার্তিক 'ষণ্মাতুর' নামে পরিচিত। এই সদ্যোজাত শিশুকে কৃত্তিকাদি ছ'জন অপ্সরা স্তন্যদান করেছিলেন। তাই কার্তিক কখনো ষণ্মাতুর কখনো বা ষড়ানন নামে পুরাণে আখ্যাত হয়েছেন। এই পৌরাণিক মিথ অনুসরণ করে আধুনিক বাংলা কাব্যকে 'ত্রৈমাতুর' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। প্রথম ধারা— বাঙালির নিজস্ব প্রাগৈতিহাসিক সংস্কার, নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বে যাকে বলে দক্ষিণ-এশীয় জাতিধারা। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেছেন, বাঙালির নিষাদ-সংস্কার। এটি প্রত্নতত্ত্বের মৃত্তিকা তলে প্রায় অবলুপ্ত হলেও বাঙালির অবয়ব ও ভাষার মধ্যে সে চিহ্ন এখনও কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে। দ্বিতীয় ধারা— উত্তরাপথের বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও মধ্যযুগীয় সন্তসাহিত্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব। এই অর্জিত সংস্কারটি এতই ব্যাপক যে, বাংলা সাহিত্যের পশ্চাদপটে যে কোল্ল-ভীল্ল প্রভৃতি আদিবাসীদেরও প্রভাব আছে তা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। তৃতীয় ধারা— ইংরেজ অধিকারের পরে ইংরেজি ভাষার মারফতে পাশ্চাত্য ভাব-ভাবনার প্রভাবে-মধ্যবিত্ত সমাজের মনোলোকে বৈপ্লবিক আলোড়ন। এই তিনটি জননী উনিশ শতকের সদ্যোজাত বাংলা সাহিত্যকে লালন করেছে, পোষণ করেছে।

২

একটু বাজিয়ে দেখলেই মনে হবে, মধ্যযুগীয় সংস্কারই বাঙালির কুলধর্ম। কিন্তু পশ্চিম দিগন্ত থেকে হঠাৎ-আসা ঝড়ের ঝাপটে বাঙালির সেই সংস্কারের অনেকটাই হারিয়ে গেছে। মধ্যযুগের অবসানের পর মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী, রামায়ণ-মহাভারত ভাগবতের অনুবাদ, বৈষ্ণব, শাক্ত ও সহজিয়া বৈষ্ণবদের মরমিয়া সাধনসংগীত কে আর কণ্ঠস্থ করবে? আধুনিক অট্টালিকার ছায়ায় মধ্যযুগের 'ভেরেণ্ডার খাম' অদৃশ্য হয়ে গেছে। উনিশ শতকের ছয়ের দশক থেকে বিশ শতকের আটের দশক পর্যন্ত ব্যাপ্ত বাংলা কবিতাকে চারটি শাখায় কল্পনা করা যায় : ১. প্রত্ন-আধুনিক পর্ব--মধুসূদন থেকে প্রাক্-রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত প্রসারিত। ২. আধুনিক পর্ব--রবীন্দ্রনাথের জীবিতকাল পর্যন্ত (১৯৪১)। ৩. নব্য আধুনিক পর্ব-- রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও উত্তর-রবীন্দ্র যুগ। ৪. উত্তর-আধুনিক পর্ব-- বিশ শতকের পাঁচের দশক থেকে যার কুণ্ঠিত পদযাত্রা শুরু। অবশ্য এ বিভাজন নিতান্তেই কাজ চালাবার জন্য পরিকল্পিত। সন-তারিখ মিলিয়ে কাব্যযুগপরিকল্পনা সব সময়ে প্রাসঙ্গিক হয় না।

কাব্যে আধুনিকতা কাকে বলে তা নিয়ে পশ্চিমে এবং আমাদের দেশে বহু আলোচনা, তর্কবিতর্ক এবং বিস্তর কলহ-কাজিয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব

হয়নি। কাল নিয়ে কি আধুনিকতা? তাহলে খ্রীস্টপূর্ব শতাব্দীর গ্রীক মহিলা-কবি সাফো এবং খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর চীনা কবি লি-পোর রচনায় আধুনিককালের স্বাদগন্ধ পাওয়া যায় কেন? মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের কবি হপকিন্‌সের (১৮৪৪-১৮৯৯) রচনায় অতি-আধুনিকতার প্রকাশ্য উপস্থিতিই বা কেমন করে ঘটল? তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝবার জন্য বিশ শতকের দুটি দশক পর্যন্ত ইংরেজ কবি ও সমালোচককে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আবার আধুনিক যুগের কোলাহলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েও তো অনেকে কল্পনা-তুরঙ্গের সওয়ার হয়েছেন। যখন রবীন্দ্রকাব্যের শেষপর্বে, ১৯৩০-৩২ সাল থেকে আধুনিক বাংলা' কবিতা প্রবলভাবে আত্মঘোষণা করেছিল, তখনো তো কবিশেখর কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী পুরাতন রোমান্স, প্রেম, প্রকৃতি ও ভক্তির অবাধ উচ্ছ্বাসে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কালের দিকে থেকে তাঁরা আধুনিক, মনের দিক থেকে নন। তাই বলা যেতে পারে যে, কালের মাপকাঠি দিয়ে আধুনিক কবি ও কবিতার সুষ্ঠু বিচার হয় না। এইজন্য পশ্চিমের কাব্যসমালোচকেরা আধুনিক কবিদের দুভাগে ভাগ করেছেন। ১. আধুনিক কবি (মডার্ন পোয়েট) এবং ২. আধুনিকতার কবি (মডার্নিস্ট পোয়েট)। প্রথমটির সঙ্গে ঐতিহাসিক কালের সম্পর্কে, দ্বিতীয়টির সঙ্গে নব্য মানসিকতার সম্পর্ক। এই শেষোক্ত কবিরা আধুনিক যুগজিজ্ঞাসা, চিন্তা-ভাবনা, দ্বিধা-সংশয় ও সংঘাত-সংঘর্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অভিনব বাক্‌রীতি, পংক্তি বিন্যাস, ছন্দের নব নব পরীক্ষা, গদ্যরীতিকে কাব্যের যৌবরাজ্যে অভিষেক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক কল্পনাকে ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধ কল্পবাদের (এজরা পাউন্ড কথিত imagiste) মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ, একালের বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার কর্মশালা, ইতিহাস-ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন গ্রন্থের প্রসঙ্গ এবং নানা ভাষার ক্লাসিক কাব্য থেকে ভেসে-আসা বিচ্ছিন্ন উক্তি নব্য আধুনিক কবিদের হস্তামলকে পরিণত হল। রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও ঈষৎ পরবর্তী বাঙালি কবিরা এই সমস্ত আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই নতুন কাব্য-প্রকৃতির সঙ্গে অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সহমর্মিতা ঘটেনি, যদিও তিনি আধুনিক ইংরেজ-আমেরিকান কবিদের (প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত) রচনা অত্যন্ত মন দিয়ে পড়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটি স্মরণীয় : 'পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা। নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয়, তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।' কিন্তু পরক্ষণেই এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, 'কিন্তু একে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা' (সাহিত্যের পথে)। একালের কাব্যের আধুনিকতার স্বরূপ কী, ওদেশেও তা নিয়ে নানা আলোচনা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়েছে। একথা তর্কাতীত যে, কালপ্রবাহ ও কাব্যপ্রবাহ সব সময়ে একই রেখায় আপতিত হয়ে অগ্রসর হয় না। কখনো কখনো বিশেষ কবি-ব্যক্তিত্ব কাব্যের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং বলা যেতে পারে, কাল ও ব্যক্তি কাব্যের ক্ষেত্রে অন্যোন্যনির্ভর।

রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ ভাবমণ্ডলে বাস করতেন এবং বিশেষ ধরনের কল্পনা ও প্রকাশরীতির সাহায্যে সহজেই স্বপ্নলোকে উধাও হয়ে যেতেন। প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বরভাবনা ও বিশ্বমানবিকতা— প্রধানত এই চারটি তন্ত্রীতে তাঁর বীণাযন্ত্রে সুর বাঁধা হয়েছে। অশুভচেতনা, পাপবোধ ও নেতিবাদ তাঁর কাব্যের ধর্ম নয়। আধুনিক কবিতার বক্রগতির প্রতি তাঁর কোনো কৌতূহল ছিল না। বোধ হয় কিছুটা ব্যঙ্গের ছলে তিনি অমিত রায়ের মুখে এই 'পরিহাস

বিজল্পিতম' মন্তব্য দিয়েছেন। অমিত রায়ের মতে, 'নতুন কবিতা হবে 'কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো। ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো। ন্যুরালজিয়ার ব্যথার মতো। খোঁচা-ওয়ালা, কোণ-ওয়ালা গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়। এমন কি যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিলডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।...এখন থেকে ফেলে দাও মন-ভোলাবার ছলাকলা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে, যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল'। এর পিছনে কিছু প্রগল্‌ভতা থাকলেও রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত কণ্ঠস্বরও যেন শোনা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, নদী যেমন হঠাৎ বাঁক ফেরে তেমনি সাহিত্যও দিক পরিবর্তন করে, সেই বাঁকটাকে বলা যেতে পারে আধুনিক। 'এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।' এর উত্তরে অমিত রায় সহাস্যে বলতে পারত, আধুনিকতা শুধু ভাবের কথা নয়, কালের কথাও। নদীও হঠাৎ বাঁক ফেরে না, তার পিছনে নানা প্রাকৃতিক কারণ থাকে। সাহিত্য কেন, কোনো মানব-সৃষ্টিই সিধে পথে চলে না। দেশ কাল পাত্র মানুষের যে-কোনো সৃষ্টিকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। সময় ও মর্জি—দুই-ই আধুনিক কবিতার নিয়ামক শক্তি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সময়ই মর্জিকে অর্থাৎ কবিচেতনাকে নতুন পথে চলতে প্রেরণা দেয়। যেমন বাংলাদেশের উনিশ শতক—দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও নতুন শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলা সাহিত্যকে জন্মান্তর গ্রহণে উদ্দীপিত করেছে। এই জন্মান্তর না হলে বাংলা সাহিত্যের কী দশা হত, মধ্যযুগীয় সাহিত্য-সংস্কার সহজে নির্মোকমুক্ত ভুজঙ্গের মতো নব কলেবর গ্রহণ করতে পারত কিনা তা নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা চলতে পারে। সে যাই হোক, বাংলা কবিতার আধুনিকতা যে প্রধানত দেশ-কাল-নির্ভর তাতে সন্দেহ নেই, বিশেষত কালনির্ভরতা। মর্জির পরিবর্তনে কালের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

৩

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন আয়ুর প্রসাদ লাভ করেছিলেন, কাব্যজীবনেও তিনি দীর্ঘজীবী। বাল্য-কৈশোর পর্ব থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত তিনি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিচিত্র ফসল ফলিয়ে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর আয়ুর মধ্যে বুওর ও রুশ-জাপান যুদ্ধ, দুটো বিশ্বমহাযুদ্ধ এবং সমকালীন পৃথিবীর নানা ঘটনা- দুর্ঘটনা ঘটেছে। ১৯৩২ সাল ('পুনশ্চ') থেকে তিরোধানের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত ('শেষ লেখা') কাব্য লিখেছেন উনিশখানি। তার মধ্যে হালকা রসের ছড়া বাদ দিলে অন্তত পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), প্রান্তিক (১৯৩৭-৩৮), সেঁজুতি(১৯৩৮), আকাশপ্রদীপ (১৯৩৯), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৩৪), রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১), শেষ লেখা (১৯৪১, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)—এগুলির মধ্যে বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের জীবন-চেতনার এক নতুন রূপ লক্ষ্য করা যাবে। এই সমস্ত কাব্যের কোনো কোনোটিতে কবিত্বের মোহাঞ্জন অনেকটা অপসৃত হয়েছে, বাস্তব পৃথিবী নতুন রূপে তাঁর ছন্দে ও গদ্যকবিতায় ধরা দিয়েছে। এইটি তাঁর শেষ ফসলের বাস্তবতা এবং এর থেকে কেউ কেউ মনে করেন, আধুনিক কবিতার প্রথম পথিকৃৎ স্বয়ং কবিগুরু। কিন্তু সত্যই কি তিনি বাস্তব পৃথিবীর মোহমুক্ত বেদনাময় রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন? মানুষের পাপ-তাপক্লিষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে অবতরণ করেছিলেন? ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে গেলেও ও-পাড়ার কতটা সত্য পরিচয় পেয়েছিলেন? তিনি যতই লিখুন—

আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কান্‌কা,
মরা বেড়ালের ছানা,

ছাই পাঁশ আরো কত কী যে।

তাতে তাঁর আধুনিকতা প্রমাণ হয় না। কেন না তিনি উপলব্ধি করেন, 'এ গলিটা ঘোর মিছে, দুর্বিবহ মাতালের প্রলাপের মতো।' অবশ্য সমকালীন দেশ-সমাজ-মানুষ তাঁকে মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন করত। কিন্তু সে যাই হোক, যখন তাঁর বয়স ষাটে পৌঁছে গেছে তখন এমন কয়েকজন কবির আবির্ভাব হল, যাঁরা রবীন্দ্র-বিরোধী না হয়েও রবীন্দ্র-ভাবানুষঙ্গ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে আর এক ভাবে কাব্যরচনার প্রয়াস করলেন। তাঁরা তিনজন—মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮২-১৯৫২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬)। মোহিতলালের ভোগোন্মুখ বলিষ্ঠ দেহবাদ, যতীন্দ্রনাথের নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতা এবং নজরুল ইসলামের বিপ্লবী বজ্রকণ্ঠ যেন রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে আর এক দিকে পথ খুঁজতে লাগল। তাঁদের সমকালেই এলেন নব্য-আধুনিক পর্বের কবিরা—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে ইত্যাদি— যাঁরা সদম্ভে রবীন্দ্র-বিরোধিতা ঘোষণা করলেন। একদিকে রবীন্দ্রনাথ, তার বিপরীতে নব্য-তন্ত্রের প্রতিবাদী কবিরা। মাঝখানে রইলেন মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলাম—অনেকটা রাজনীতির বাফার স্টেটের মতো। এই কালাপাহাড় কবিরা (প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-সুধীন্দ্র-জীবনানন্দ ইত্যাদি) রবীন্দ্র-বিরোধিতার কেতন উড়িয়ে ঘোষণা করলেন—

পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর—
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগসূর্য ম্লান তার কাছে— মোর পথ আরো দূর।

—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত (কল্লোল, কার্তিক ১৩৩৬)

যুগসূর্য 'রবীন্দ্র ঠাকুর'কে ম্লান করে দেবার প্রচণ্ড ইচ্ছায় তাঁরা স্থবিরের শাসন- নাশন নতুন কাব্যপ্রত্যয় সৃষ্টিতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু যাঁরা রবীন্দ্র-কাব্যরসে আকণ্ঠ মগ্ন ছিলেন, তাঁরা ভাবলেন, এ আবার কী ধরনের কবিতা। যার আদি অন্তের মধ্যে সঙ্গতি নেই, নেই ভাবের সংহতি, ছন্দ কোথাও উচ্ছৃংখল, কোথাও ভাঙাচোরা গদ্যপঙ্ক্তির মধ্যে কাব্যরসের স্বেচ্ছানির্বাসন। বহু শতাব্দী পূর্বে গ্রীক দার্শনিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক লঞ্জাইনাস hupsus অর্থাৎ চেতনার ঊর্ধ্বায়ন বলতে যা নির্দেশ করেছিলেন, এই নব্য কবিতায় তা সদম্ভে উপেক্ষিত হল কেন? ইয়েট্স একদা বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন:

Things fall apart ; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world.
The blood-dimmed tide is loosed, and every where
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

বাংলা সাহিত্যের বাধাবন্ধহারা ও ছন্নছাড়া উদ্ভট খেয়াল নির্বাধ প্রকাশ পেল প্রগতি, কল্লোল, কালি-কলম, সংহতি ইত্যাদি পত্রিকায়। তাঁরা অত্যন্ত প্রকটভাবে রবীন্দ্র-ভাব-ভাবনা ও বাণীবিন্যাস পরিত্যাগ করে জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্সের মতো একেবারে আনকোরা শব্দপ্রতীক ব্যবহার করলেন; ইতিহাস, পুরাণ ও বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে নতুন মিথ তৈরি করার চেষ্টা করলেন, পঙ্ক্তির অন্বয়, অন্ত্যানুপ্রাস, শব্দের সঙ্গে শব্দের আসক্তি ভেঙে দিয়ে পশ্চিমের ইমেজিস্ট গোষ্ঠীর মতো কল্পনা ও রচনাভঙ্গিমাকে বেপরোয়া করে তুললেন,

ফ্রয়েড-এ্যাডলার-য়ুং, মার্কস- এঙ্গেল্‌স—মানুষের মন-বুদ্ধি ও বস্তুগ্রাহ্য এষণাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। কয়েকজনের নাম করি : অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯) লিখলেন 'কুসুমের মাস (১৯৩০), 'পাতালকন্যা' (১৯৩৮), 'নষ্ট চাঁদ' (১৯৪৫), 'পুনর্নবা' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), 'ছায়ার আলপনা' (১৯৫১)। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) নব্যকবিদের গোষ্ঠীপতি হয়ে দেখা দিলেন, 'কবিতা' ত্রৈমাসিক তরুণ কবিদের লালনের ভার নিল। তাঁর 'মর্মবাণী' (১৯২৪, এতে আধুনিক লক্ষণ অস্পষ্ট), 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), 'পৃথিবীর প্রতি' (১৯৩০), 'কঙ্কাবতী', 'দ্রৌপদীর শাড়ী, (১৯৪৮), 'শীতের প্রার্থনা, বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫), 'মরচে পড়া পেরেকের গান' (১৯৬৬) কাব্যগ্রন্থগুলি তরুণগণ লুফে নিলেন। 'প্রথমা' (১৯৩২) কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) বাজি মাত করলেন। পর পর ক্রমে ক্রমে 'সম্রাট' (১৯৪০), 'ফেরারি ফৌজ' (১৯৪৮), 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬), 'হরিণ-চিতা-চিল' (১৯৬০) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলিতে কখনো দূর ইতিহাসে, কখনো অসমর্থের ভিড়ে, কখনো দেশদেশান্তরে, আফ্রিকার ঘন অরণ্যে 'হে-ইডি, হাইডি, হাই' বন্য সংগীতের মধ্যে অরণ্যজীবনের উল্লাস উপলব্ধি করলেন। এ কোন্ জীবন? এ তো শান্তিনিকেতনের বর্ষণমুখর শালবীথি নয়, নয় রক্তিম মাটির ভিজে পথ। কবিতাপাঠার্থী তরুণের দল এই সমস্ত কবিতা থেকে জীবনের নতুন স্বাদ পেলেন। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) তখন কোথায় নির্বাসন যাপন করছিলেন? মফস্বল কলেজের দিনগত পাপক্ষয়ের জীবনে স্বস্তি ছিল, কিন্তু সুখশান্তি ছিল কি? তাঁর 'ঝরা পালকে' তখনও তাঁর কবিব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত পারেনি। ক্রমে ক্রমে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'রূপসী বাংলা' (১৯৫১), কিছু গদ্যরচনা তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলল। যেমন হপকিন্‌সকে চিনতে ইংরেজ পাঠকের রীতিমতো কসরত করতে হত, তেমনি জীবনানন্দের ভালে দুর্বোধ্য কবির টীকা পরিয়ে দেওয়া হল। কোন্ শব্দের রূপনির্মিত কোন্ শব্দের সঙ্গে অম্বিত, বাক্য ও উপবাক্যের লাগামছেঁড়া টানাটানি ইত্যাদি ব্যাপার পাঠককে বিমূঢ় করে তুলল। অনেকে বললেন, তাঁর রচনা থেকে যে কিছুই বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না। অবশ্য বোধ-ই কবিতার প্রথম কথা নয়, শেষ কথাও নয়। তবু তার একটা স্পর্শযোগ্য প্রাসঙ্গিকতা থাকবে তো? স্বয়ং জীবনানন্দই স্বীকার করেছেন 'কবিতা সৃষ্টি ও কাব্যপাঠ—দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমনের ব্যাপার ; কাজেই পাঠক ও সমালোচকের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য।' না হয় এলিয়টের কথা মেনে নেওয়া গেল। 'Poetry is not a substitute for philosophy, or theology or religion' —যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত কথা রাখেননি, অক্লেশে খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্বের কোটরে নিরাপদ আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তাঁর এ কথাটি কি নবীনের দল মেনে নেবেন? কবিতার শেষ ফলশ্রুতি— 'not intellectual, but emotional— এও কি একালে শিরোধার্য করতে হবে? সে যাই হোক, আপনভোলা, প্রায়নীরব, বিষণ্ণ জীবনানন্দ কলকাতার পাষাণপথে রক্তাক্ত পরিণাম বরণ করে নিলেন। যে মৃত্যুচেতনা তাঁকে অদৃশ্য দৈত্যের মতো অনুসরণ করছিল তার কবল থেকে তিনি চিরদিনের জন্য মুক্তি পেলেন।

রবীন্দ্র-সমকালীন এবং ঈষৎ পরবর্তী সুধীন্দ্র দত্ত (১৯০১-১৯৬০) দুর্বোধ্যতম কবি বলে পাঠকের ভীতি উদ্রেক করে থাকেন। তাঁর শব্দটংকারে কে না চমকিত হবেন! সংস্কৃত শব্দশাস্ত্র ও মনিয়ের উইলিয়ম্‌স হাতড়ে হাতড়ে পাঠক তাঁর কবিতার তাৎপর্য আবিষ্কারে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে পড়ে। অবশ্য তাঁর কবিতার গাত্রে দুর্বোধ্যতার লেবেল এঁটে দেওয়ার আগে লকহার্টের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্বন্ধে এই তির্যক উক্তিটি স্মরণ করা যেতে

পারে। সেকালের অনেক পাঠক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মনের নাগাল না পেয়ে তাঁকে দুর্বোধ্য কবি বলেই উপহাস করতেন। সেই প্রসঙ্গে লকহার্ট সেই সমস্ত 'দুর্মেধস্' পাঠক সম্বন্ধে বলেন: "What we cannot understand, it is very common, and indeed a very natural thing, for us to undervalue ; and it may be suspected that some of the merriest witticisms which have been uttered against Mr. Wordsworth, have had their origin in the pettishness and dissatisfaction of mind, unaccustomed and unwilling to make, either to others, or to themselves any confession of incapacity." কথাটা একালেও সমভাবে সত্য।

সুধীন্দ্র দত্তের 'তন্বী' (১৯৩০), 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫), 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তরফাল্গুনী' (১৯৪০), 'সংবর্ত' (১৯৫৬), 'দশমী' (১৯৫৬) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের ক্লাসিক ঘনত্ব, অভিধানমন্থিত শাব্দিক ব্যায়াম এবং ইতিহাস-ভূগোল-পুরাণ-দর্শন-শাস্ত্রসংহিতা থেকে নবনির্মিত মিথ কাব্যরসপিপাসুকে কখনো কখনো বিপন্ন করে তুলবেই। সংস্কৃত আলংকারিক সক্ষোভে বলেছিলেন, কাব্যও যদি পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝতে হয় তা হলে তাতে সুধীজনেরই আনন্দ, দুর্মেধা পাঠকের পক্ষে তা মৃত্যুতুল্য। তবে একথাও ঠিক, শব্দের তিরস্করিণী তুলে ফেলতে পারলে সুধীন্দ্র দত্ত দুর্বোধ্য দুর্গমতার নেপথ্য থেকে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হবেন। বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) তাঁর 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩২), 'চোরাবালি' (১৯৩৮), 'পূর্বলেখ' (১৯৪০), 'সন্দ্বীপের চর' (১৯৪০), 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০), 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫০) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলির দ্বারা মধ্যবিত্ত পোষমানা প্রাণের খাঁচা থেকে জনারণ্যে নেমে এসেছেন। সমর সেনের (১৯১৬-১৯৮৭) 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৪০), 'তিনপুরুষে'ও (১৯৪৪) মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতা ঘুচে গেছে। অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) অনেক পরে কবিতার কলম ধরেছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেওয়াল' (১৯৪২), 'পারাপার' প্রভৃতি রচনায় আবার একটি স্থিতধী অস্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে বলা চলবে—

'স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু ঘূর্ণির মাঝখানে।'

উত্তর-আধুনিক অর্থাৎ উত্তর-রবীন্দ্রপর্বের যে- যুগ শুরু হয়েছে, এবং এখনও নানা পরিবর্তন, শংকা, সংমোহ, বিষণ্ণতা ও নবযুগসূচনার ছাড়পত্র হাতে নিয়ে এই উত্তর-আধুনিক কবিগোষ্ঠী নতুন চেতনার দ্বীপে দ্বীপান্তরে ইউলিসিসের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কতকটা আধুনিক গ্রীক কবি কাজানজাকিসের (১৮৮৫-১৯৫৭) *Odyssey— its Modern Sequel* মহাকাব্যের নায়ক আধুনিক অডিসিয়সের মতো। হয়তো সর্বাধুনিক কবিতার দোদুল্যমান প্রত্যয় অস্তিনাস্তির মধ্যে আন্দোলিত হতে হতে পুরাতন গ্রীক কবি আলেকান্দ্রিয়ান ক্যালিমেকাসের মতো ঝুলকালিমাখা চিমনির চূড়া থেকে কাংস্য-ক্রেংকার কণ্ঠে বলতে পারবেন:

I hate the epic poem,
nor do I like the public highway
I abhor the wandering lover,
I will not drink from the common spring,
and despise everything popular.

পাশ্চাত্য, বিশেষত ইংরেজ ও ফরাসী কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্র-সমকালীন ও উত্তর-রবীন্দ্রপর্বের বাঙালি কবিদের উন্মুখর করেছেন— বোদলেয়র, রিলকে, হুইটম্যান, ইয়েট্স, এলিয়ট, অডেন, স্পেণ্ডারের কবিতার মধ্যে পদচারণা করে তাঁরা স্বস্তি পেয়েছেন, কিন্তু ও দেশের কবিদের জীবনচর্যার মেরুদণ্ড স্পর্শ করতে পেরেছেন কি? আধুনিক বাঙালি কবিরা কবিতায় বনিতা-বিলাস করলেও ফরাসি কবিদের মতো গণিকা-বিলাসে সাহস করেননি। মধ্যবিত্ত

সমাজের পারিবারিক বেড়া ডিঙিয়ে ছন্নছাড়া বোহেমিয়ান হতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। এই উত্তেজক পঙ্ক্তি কয়টি উদ্ধার করি :

Oh sweet delicious lips
From which I fancy all the world's blood drips !
Oh supple waist, pale cheek, and eyes of fire,
Hard little breasts and white gigantic hips,
And blue-black hair with serpent coils that slips
Out of my hand in hours of red desire. (John Barlas)

এই 'red desire', আকাঙ্ক্ষার কামকবোষ্ণ পানপাত্র ক'জন বাঙালি কবি সাহস করে অধরে স্পর্শ করতে পারবেন? সে যাই হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙালি জীবনের উপর দিয়ে দুর্বিপাকের মত্ত ঝঞ্ঝা বয়ে গেল, দেশভাগের পর উদ্বাস্তু সমস্যা কলকাতাকে দুঃস্বপ্নের নগরী করে তুলল। ব্যবসাবাণিজ্য ভেঙে পড়ল, জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি প্রবেশ করল, নৈতিক পবিত্রতা হাসির ব্যাপারে পর্যবসিত হল। এই পটভূমিকায় বাংলা কবিতা চতুর্থ পর্যায়ে পদার্পণ করল, যাকে তরুণ কবি ও সমালোচকরা বলেছেন উত্তর-আধুনিক পর্ব। অবশ্য তখনও কোনো কোনো জ্যেষ্ঠ কবি জীবিত ছিলেন, তাঁদের রচনাকর্মও অব্যাহত ছিল। যেমন— অজিত দত্ত (শেষ দিকের কাব্য সংগ্রহ—১৯৪৭-১৯৬১), বুদ্ধদেব বসু (শেষ কাব্য— ১৯৫১), প্রেমেন্দ্র মিত্র (শেষ কাব্য—১৯৬০), জীবনানন্দ দাশ (শেষ কাব্য— ১৯৫১), সুধীন্দ্র দত্ত (শেষ কাব্য— ১৯৫৬) বিষ্ণু দে (শেষ কাব্য—১৯৫০) ইত্যাদি। তবু ১৯৫০ থেকে ১৯৮৫ তিন দশক ধরে কলকাতা ও মফস্বল থেকে প্রচুর কবিতাপত্র প্রকাশিত হচ্ছে এবং বলাই বাহুল্য, এই নবীন কবিদের সংখ্যা কয়েক সহস্র তো হবেই। এঁরা নানা মত ও পথের কবি, নানা রচনাভঙ্গিমার অংশীদার। এত যে অসংখ্য কবিতা নিত্য প্রকাশিত হচ্ছে, আগামী প্রজন্ম এর কত জনকে মনে রাখবে, কটি কবিতা স্মৃতির দুর্মর ফলকে লেখা থাকবে তা কেউ জানে না। এই শিরঃপীড়া ও-দেশেও দেখা দিয়েছে। এখনই তো শিক্ষিত বুদ্ধি ও রুচির কাছে আধুনিক কবিতা-abracadabra-য় পরিণত হতে চলেছে। এ-কালের 'the strange disease of modern life....this iron time of doubts, disputes, distraction, fears'— এই সন্দেহ-সংশয় ও নেতিবাদ গত শতাব্দীতে ম্যাথু আর্নল্ডকে তিক্ত মানসিকতায় বিষণ্ণ করে তুলেছিল। কোনো কোনো পাঠক একালের কবিতা পড়তে পড়তে কি অনুভব করবেন না, কোথায় যেন জীবনের সঙ্গতি ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে? আধুনিক কবিতা কি তাহলে তান্ত্রিক অভিচারচক্রের মতো গুটিকয়েকের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকবে? পুরাতন না হয় পথের পাশে লোষ্ট্রখণ্ডবৎ পরিত্যক্ত হল। কিন্তু এখনও কি উনিশ শতকের বাষ্পায়মান রোমান্টিকতা পরিত্যাগের সময় আসেনি? মাজাঘষা, মাপাজোখা, বাছাইকরা, যাদুঘরে সাজানো প্রত্নপ্রত্যয়গুলি কি একালের জটিল জীবনচেতনাকে যথাযথভাবে ফোটাতে পারে? তাই একালের সমালোচক একালের কাব্য-কবিতা সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধভাবে এই মন্তব্য করতে পারেন—'We have been accustomed to the idea that certain things are 'not poetical', that a poet can mention a rose, but not a Rolls-Royce, that poetry is a sensititve refugee, and not a mere facing life, the whole of it, and sounding a clarion call to his more speechless and encumbered fellows.' বাংলা সাহিত্যের প্রথাবিরোধী কবিরা কবিতা রচনার সব সংস্কারই ভেঙেছেন, ছাঁচ ও ছাঁদকে অস্বীকার করে কবিতাকে সর্বত্রগামী করবার জন্য বাধ্য হয়ে তাঁদের চোখের মায়াঞ্জন মুছে ফেলতে হয়েছে। উত্তম দাশ ও মৃত্যুঞ্জয় সেন-সম্পাদিত 'আধুনিক প্রজন্মের কবিতা' (১৯৯১), অমিতাভ গুপ্তের 'উত্তর

আধুনিক চেতনার ভূমিকা' (১৯৯২) এবং উত্তম দাশের 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনে' (১৯৮৬) সর্বাধুনিক কবি ও কবিতার বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যাবে। তথাকথিত বুর্জোয়া রুচি ও নীতির শিরে বজ্রাঘাত করে, শ্লীল অশ্লীল, অনুচ্চার্য, দুরুচ্চার্য—যা রসনায় আসে তাকেই কবিতায় স্থান দেওয়া যায় কিনা, তাই নিয়ে গবেষণা চলেছে। কেউ কেউ রুচিবিকারের অপরাধে আদালতে সোপর্দ হচ্ছেন (দ্রঃ ১৯৬২ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত 'হাংরি জেনারেশন'—সম্পাদনা : দেবী রায়, স্রষ্টা : মলয় রায়চৌধুরী, নেতৃত্ব : শক্তি চট্টোপাধ্যায়)। অবশ্য বিচারে মুক্তিও পাচ্ছেন। এই মামলায় নিম্ন আদালতে শাস্তি হলেও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি টি. পি মুখার্জির এজলাসে (২৬ জুলাই ১৯৬৭) এ মামলা খারিজ হয়ে যায়। কেউ কেউ হয়তো বিচারপতির সিদ্ধান্ত জানার জন্য কৌতূহলী হতে পারেন। তাই তাঁর রায়ের উপসংহারটুকু উদ্ধৃত হল :

> 'In view of what I have stated above, I hold first, that the substance of any offence under section 292 I. P. C-could not have been explained to the petitioner in this case and secondly that the finding of the learned Magistrate that the petitioner circulated any obscene matter is not based on any evidence whatsoever. This rule accordingly made absolute.'

আধুনিক বাংলা কবিতার লালনে কবিতাপত্র ও কাব্যসংকলনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজিতেও গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিনদেশে নতুন পত্রিকায় নবভাবের কবিতা পরিবেশিত হয়েছিল, যার ফলে এই ধরনের রচনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটেছিল। দুই-একখানি পত্রের নাম উল্লেখ করি : *'Poetry Review', 'Ripostes', 'Poetry', 'The London Mercury', 'Wheels', 'Criterion', 'Rogue', 'Others', 'Dial'* ইত্যাদি। কলকাতা থেকেও এই ধরনের অনেকগুলি কবিতা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে, যার আনুকূল্য নব্য কবিদের আত্মপ্রকাশের পথ খুলে দিয়েছে। তার মধ্যে কয়েকখানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা', সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও প্রেমেন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত 'নিরুক্ত', শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত 'একক', অরুণ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'উত্তরসূরি', জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কবি ও কবিতা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস', উত্তম দাশ-সম্পাদিত 'মহাদিগন্ত' ইত্যাদি। একালে বাংলা কবিতার নানা ধরনের সংকলন পাঠকের হাতে হাতে ফিরছে। এই সমস্ত সংকলনে সমসাময়িক কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, বাংলা কবিতার ইতিহাসে তা স্মরণীয়।

কবিতা সংকলন আধুনিক কালের ব্যাপার নয়। প্রাচীন যুগে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় একাধিক প্রকীর্ণ শ্লোকসংগ্রহ সেকালের পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত ছিল। যথা— শৃংগারতিলক, গাথাসপ্তশতী, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিতমুক্তাবলী, পদ্যাবলী, থেরীগাথা (বৌদ্ধ সংকলন), আর্যাসপ্তশতী প্রভৃতি। মধ্যযুগের উপান্তভূমিতে বৈষ্ণব আচার্যেরা বৈষ্ণব পদাবলীর ছোট বড়ো সংকলন গ্রন্থিত করেছিলেন (ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র)। পরবর্তীকালের রবীন্দ্রনাথও বৈষ্ণবপদ সংকলন (শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় 'পদরত্নাবলী') সম্পাদনা করেছিলেন। অনেক পরে তিনি বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের ইন্টারমিডিয়েট সমতুল্য পরীক্ষার্থীদের জন্য 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলনের সিদ্ধান্ত করেন, 'গোড়া থেকে শুরু করে সত্যেন দত্তের সমসাময়িক কবিদের কাল পর্যন্ত রচনা বাছবে। প্রেমের কবিতা যতদূর সম্ভব বাদ দেবে',— কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়কে এই নির্দেশ দেন। অতঃপর ১৯৩৮ সালে তাঁর নামে প্রকাশিত হল 'বাংলা কাব্য পরিচয়'। কিন্তু

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মধুচক্রে লোষ্ট্রপাত শুরু হয়ে গেল। নব্য কবিসমাজ এই সংকলনের ঘোরতর প্রতিবাদ করলেন, রবীন্দ্রনাথও সে আক্রমণ থেকে রক্ষা পেলেন না। সংকলনের মূলে নন্দগোপাল সেনগুপ্তের বিশেষ হাত ছিল। হয়তো তাঁর প্রভাবে এই সঙ্কলন থেকে বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কবিতা বাদ পড়েছিল। ফলে আধুনিক কবিরা স্বাভাবিক কারণেই এই সংকলনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামলেন। ইতিপূর্বে অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস রবীন্দ্রনাথকে বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ সম্পাদনে অনুরোধ করেন (Oxford Book of Bengali Verse)। প্রথমে স্থির হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁকে সাহায্য করবেন। প্রাচীন যুগের বাংলা কবিতা অনুবাদের ভার স্বয়ং কবি নিলেন, সুধীন্দ্রনাথ আধুনিককালের কবিতার অনুবাদ করবেন এই সিদ্ধান্ত হয়। পাণ্ডুলিপিও তৈরি হয়েছিল, কিন্তু এ সংকলন প্রকাশিত হয়নি, পাণ্ডুলিপিটির কী গতি হল তাও জানা যায় না। তার পরে ছাত্রপাঠ্য বাংলা কবিতা সংকলনের (প্রাচীন ও আধুনিক) জন্য রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হলেন। কবিতা বাছাইয়ের ভার নিলেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। কিন্তু প্রকাশের পরে এর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠল। যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও সুধীন্দ্র দত্তও প্রতিবাদের গুঞ্জন তুললেন। ফৌজদারি মামলা হবারও আশঙ্কা দেখা দিল। যাই হোক, এ সংকলন বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ বাতিল করলেন। পরে এর মার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু তাও আত্মপ্রকাশ করেনি। এটি সংকলিত হয়েছিল ছাত্রদের পাঠ্য বই হিসেবে। সুতরাং এর থেকে নর-নারীর প্রেমের কবিতা বাদ দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্করণে বুদ্ধদেব বসুর পরামর্শে প্রেমের কবিতাও অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সবই নিষ্ফল হল, দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হল না। অবশ্য তার দু' বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হল 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৯৪০), সম্পাদনা করলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুব। এর পর ক্রমে ক্রমে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৯৫০), মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত 'কাব্য-মঞ্জুষা' (নুতন পূর্ণাঙ্গ ছাত্রপাঠ সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), 'একালের কবিতা' (বিষ্ণু দে সম্পাদিত, ১৯৬৩), 'কালের কবিতা' (শান্তনু দাস সম্পাদিত, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ), 'বারো বছরের বাংলা কবিতা' (অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ), 'একশ কবির কবিতা' (সন্তোষ ঘোষ সম্পাদিত, ১৯৮৫), 'কবিতাগুচ্ছ' (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও প্রণব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৮৫), 'কবিতা ষাট-সত্তর' (উত্তম দাশ, মৃত্যুঞ্জয় সেন, পরেশ মণ্ডল সম্পাদিত, ১৯৮৩), 'সুবর্ণজয়ন্তী কবিতা সংকলন-- দেশ' (সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, ১৯৮৫), 'আজকের কবিতা' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত, ১৯৮৭ বঙ্গাব্দ), 'আধুনিক প্রজন্মের কবিতা' (উত্তম দাশ, মৃত্যুঞ্জয় সেন সম্পাদিত, ১৯৯১), 'উত্তর-আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলন' (অমিতাভ গুপ্ত সম্পাদিত)।

একালের কবিতাসমূহের ভাবানুযায়ী বর্গীকরণ সহজ ব্যাপার নয়। উত্তাপ অনুসারে তাপমান যন্ত্রের পারদস্তম্ভ ওঠানামা করে। অবশ্য আধুনিক ভাবের কবিতা কাকে বলে তা নিয়ে ওদেশে এবং এদেশে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং সম্ভবত দূর ভবিষ্যতেও হবে। এ নিয়ে কত না দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংঘর্ষ। ১৯২১ সালে এলিয়ট আধুনিক কবিতার জটিলতা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, আজ সত্তর বছর পরেও দেখছি বিচিত্র ওঠাপড়া সত্ত্বেও আধুনিক কবিতায় এই লক্ষণগুলি এখনও আমাদের প্রশ্নলক্ষ করে তোলে : 'We can only say that it appears likely that poets in our civilization, as it exists at present, must be difficult. Our civilization comprehends great variety, and this variety and complexity playing upon a refined sensibility, must produce various and complex results. The poet must

become more and more comprehensive, more allusive, more indirect, in order to force, to dislocate if necessary, language into his meaning.' আধুনিক জীবনের এই জটিলতা, যন্ত্রণা, বাদ-প্রতিবাদ আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক বাংলা কবিতায় কতটা ফুটে উঠেছে, তা তরুণ কবিদের রচনা থেকেই বোঝা যাবে। একদিকে ব্যক্তির অস্মিতা, চিত্তগহনের প্রসুপ্ত লিবিডো-ভুজঙ্গিনীর বিষ-নিঃশ্বাস, অন্যদিকে দেশ কাল, অসংখ্য তার সমস্যা—সেগুলি একালের কবিকে কতটা উতলা করেছে তার নিদর্শন পাওয়া যাবে এই সমস্ত কবিতায়। একালের তরুণ কবি ও সমালোচকেরা বলছেন,* যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক কবিতার পথের দিশারী। বুদ্ধদেব বসুও 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র ভূমিকায় (১৯৫৪) এই প্রসঙ্গে আর একটু স্পষ্ট করে বলেছেন, 'এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা সনাক্ত করা যায়।.... একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি।' কিন্তু উত্তর-আধুনিক কবিদের প্রত্যয়ে কতটা বিস্ময়, জীবনের আস্বাদ ও বিশ্ববিধানের প্রতি আস্থাবান চিত্তবৃত্তি উদ্বৃত্ত আছে সে সম্বন্ধে এককথায় উত্তর দেওয়া যায় না। আগামী প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকারা নিজেরাই তার উত্তর খুঁজে নেবেন।

* দ্রষ্টব্য : উত্তম দাশ, মৃত্যুঞ্জয় সেন সম্পাদিত 'আধুনিক প্রজন্মের কবিতা', ১৯৯১

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

'সাহিত্যদর্পণ'-কার বিশ্বনাথ আঠারোটি ভাষায় দক্ষ ছিলেন বলে কিঞ্চিৎ অহমিকার বশে নিজেকে 'অষ্টাদশ ভাষা-বারবিলাসিনী ভুজঙ্গ' অর্থাৎ আঠারো ভাষারূপী নায়িকাদের নায়ক বলে শ্লাঘা বোধ করেছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়মহাশয়কে ক'টি ভাষা-নায়িকার নায়ক বলা যাবে? তারপোরওয়ালা, হরিনাথ দে, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (ঘোষ)— এঁরাও অনেকগুলি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু সুনীতিকুমারের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করা যায় কি? দেশ-বিদেশের বহু ভাষার সঙ্গে নিবিড় অনুষঙ্গ, রচনাকর্ম নির্বাহ, আলোচনা ও কথোপকথনে তাঁর কৃতিত্ব বিচিত্র ও বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভাষাচার্য বলে স্নেহসম্ভাষণ করেছিলেন, 'বাংলা ভাষা পরিচয়' পুস্তকটিও তাঁরই করে সমর্পণ করেছিলেন। শেষের কবিতার অমিত রায় 'পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, লেখকের সঙ্গে মতান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে!' শিলং পাহাড়ের দেওদার ছায়ায় খেয়ালী অমিতের সঙ্গী হয়ে রইলেন সুনীতিকুমার তাঁর বিশাল গ্রন্থ The Origin and Development of the Bengali Language (এই আলোচনায় যাকে সংক্ষেপে বলা হবে ODBL)-এর দুটি খণ্ডের মধ্য দিয়ে। সাহিত্যের অমরাবতীতে নিত্যকালের জন্য তাঁর ঠাঁই মিলল।

কিন্তু ডঃ চট্টোপাধ্যায়কে শুধু ভাষাবিজ্ঞানী বললে তাঁর প্রতিভার ভগ্নাংশেরও পরিচয় পাওয়া যাবে না। ভাষা, উপভাষা, বিভাষা, অপভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান—শিল্পকলার নানা শাখাপ্রশাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা এক বিচিত্র ব্যাপার। কোনো কোনোটি তাঁর জীবনচর্যার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত শ্রেষ্ঠ মানববাদীর মতো তিনি মানুষের সর্ববিধ ক্রিয়াকলাপের প্রতি অপার আকর্ষণ বোধ করতেন, এবং মানবতত্ত্বই তাঁকে ভাষাতত্ত্বের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল—জার্মানির গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় (য়াকব লুডউইগ কারল্ এবং উইলহেল্ম কারল্ গ্রীম) যেমন রূপকথা সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রথমে লোকভাষা, তারপর ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। রোমান নাট্যকার টেরেন্স-এর (পাবলিয়াস টেরেন্টিয়াস আফার, আনুমানিক ১৯০-১৫৯ খ্রীঃ পূঃ) একটি উক্তি তিনি প্রায়ই ব্যবহার করতেন, 'Homi sum humani nil a me alienum puto' (I am a man, nothing human is alien to me)। মানুষ অতি বিচিত্র, তার সৃষ্টিকর্ম আরো বিচিত্র ও বিস্ময়াবৃত। সেই বিচিত্র মানুষের প্রতি আকর্ষণ তাঁকে ভুবনের ঘাটে ঘাটে নিয়ে গেছে, সাত সমুদ্রের তরঙ্গের দোলায় আন্দোলিত করেছে, নিয়ে গেছে কত জনপদে, ঐতিহ্যে, জানা-অজানা ভাষাগোষ্ঠীর বিশাল প্রান্তরে। ভাষাচর্চার মধ্য দিয়েই তিনি সেই বিশ্বমানবিকতায় (l' uomo universale) পৌঁছেছেন, যা দেশ-কাল ভূগোল-ইতিহাসের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।

বোধ হয় ১৯৩৩-৩৪ সালের কথা। তখনও আমরা পৌগণ্ড বয়সের সীমা অতিক্রম করতে পারিনি। সেই সময় কী প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম শুনলাম সেই কথাটি বলি। আমার দাদারা তখন বি. এ. ক্লাসে ক্লাসিকাল বেঙ্গলি অর্থাৎ পরবর্তীকালের ইলেকটিভ বাংলো অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন করে বাংলা সাহিত্যের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন। যেন এ-সাহিত্যের ভালোমন্দের সমস্ত ভার তাঁদের ওপরে ন্যস্ত হয়েছে। একদিন ছুটির দুপুরে বৈঠকখানায় বসে তাঁরা ঈষৎ নিম্নস্বরে খুব চিন্তিতভাবে আলোচনা করছিলেন। বলাই বাহুল্য সাহিত্যসংক্রান্ত ভারী ভারী চিন্তার

ভারে তাঁরা সদাই গম্ভীর হয়ে থাকতেন। একদিন কলেজের ক্লাসে বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস অধ্যাপনার সময় অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (ঘোষ) মহাশয় নাকি সব্যঙ্গে বলেছিলেন, প্রয়াগের পূর্বদিকে কোনো ব্রাহ্মণের শরীরে আর্যরক্ত নেই, যদি থাকেও হোমিওপ্যাথিক ডোজে। হয়তো দু-চারটে আর্য ছোকরা পূর্বপ্রত্যন্ত অঞ্চলের শ্যামাঙ্গিনীদের চঞ্চল আঁখির টানে আর্যাবর্ত ছেড়ে পূর্বদিকের দাস-দস্যুদের মধ্যে ডেরা বেঁধেছিল। সুতরাং তারা অচিরে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মাবর্ত-আর্যাবর্তের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। গৌড়, বঙ্গ, বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল, পুণ্ড্র, রাঢ়া—পূর্ব দিকে যারা বাস করত, তারা তো কোল্ল-ভীল্ল, কিরাত-নিষাদ, রাঢ়-চুয়াড়। দলছুট আর্যযুবকেরা এই আদি কৌমের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে আর্যত্বের নর্ডিক গৌরব বেমালুম হারিয়ে ফেলেছিল। অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ তাঁর ব্রাহ্মণ ছাত্রদের বোধ হয় ব্যঙ্গের ঝোঁকে একটু খোঁচা দিয়েছিলেন। মনু-পরাশর-যাজ্ঞবল্ক্যের দোহাই পেড়েও দাদা এবং তাঁর কোনো কোনো সহপাঠী বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে নরম করতে পারলেন না, আদিশূর, পঞ্চ কায়স্থের প্রসঙ্গেও বিশেষ কাজ হল না। দাদারা বাড়ি ফিরে সিদ্ধান্ত করলেন, পঞ্চ ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বৃত্তান্ত এবং তার জন্য হীনমন্যতা বোধ হয় কায়স্থ বিদ্যাভূষণ ভুলতে পারেননি। বাড়ি ফিরে তাঁরা কোথা থেকে দুখানি চৌকো আকারের বেশ মোটাসোটা ইংরেজি বই সংগ্রহ করে আনলেন। শুনলাম বই দুটি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা ভাষার ইতিহাস। দাদারা সেই ভারী বই দুখানা বহুক্ষণ নাড়াচাড়া করেও দন্তস্ফুট করতে পারলেন না, অধ্যাপক বিদ্যাভূষণের ব্যঙ্গের জুতসই জবাব সংগ্রহ করাও সম্ভব হল না। তাঁদের বিমর্ষভাব দেখে আমরা বালখিল্যের দলও মুষড়িয়ে পড়লাম—সুনীতিকুমারের নামের সঙ্গে সেই আমাদের প্রথম পরিচয়, তখন বয়স তেরো বছর। কে জানত পরবর্তীকালে সেই দুখণ্ড হবে আমাদের পরীক্ষা-বৈতরণী পারের ভেলা। ক্রমে আমরাও লায়েক হয়ে উঠলাম, কলেজে ভর্তি হয়ে বাংলা অনার্স ক্লাসে (তখন বছরখানেক বাংলা অনার্স চালু হয়েছে) ভাষাতত্ত্ব পড়তে গিয়ে ডঃ সুনীতিকুমারের 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' এবং তাঁর ছাত্র ডঃ সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' হাতে পেলাম। কিন্তু কার সাধ্য ভিতরে প্রবেশ করে! দুচার পৃষ্ঠা পড়ে মাঝে মাঝে 'গুপ্তধন' গল্পের হরিহরের মতো বলতে ইচ্ছা করত, 'বাবা, কিছুই তো বুঝলাম না!' তবে অনার্স পরীক্ষার বেড়াও যথাকালে টপকিয়ে গেলাম এবং ১৯৪২ সলের এক বর্ষণমুখরিত এবং ট্রাম-ঘড়ঘড়ায়িত দ্বিপ্রহরে কামনার মোক্ষধাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হলাম। শুনলাম ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব পড়াবেন। বি. এ. ক্লাসে তাঁর চটি বইটির দ্বারা যথেষ্ট কাবু হয়ে পড়েছিলাম, দেখা যাক 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি'। তখন বাংলায় এম. এ. পরীক্ষায় ৫০ নম্বর ভাষাতত্ত্বের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, পালি-প্রাকৃতে আরো ৫০। ভয়মিশ্রিত কৌতূহল সম্বল করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময় তিনি রেজিস্টারখাতা হাতে নিয়ে আশুতোষ বিল্ডিং-এর দশ নম্বর ঘরে দ্রুতবেগে প্রবেশ করলেন। শরীরটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, হিন্দিতে যাকে বলে হাট্টাকাট্টা। মোটা কাচের চশমা, সাদা পাঞ্জাবির হাতা একটু গোটানো, বোধ হয় ধুতিও একটু ওপরের দিকে ওঠানো। ঝড়ের বেগে রোলকল সমাধা করলেন, তারপর চোস্ত ইংরেজিতে ভাষাতত্ত্বের প্রথম পাঠ শুরু করলেন। জাতি, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব-আরো কত কী দুর্বোধ্য ব্যাপার নিয়ে কন্দুক ক্রীড়ায় মেতে উঠলেন যে, মনে হল, 'মটর-কড়াই মিশায়ে কাঁকরে চিবাইল যেন দাঁতে!' আমাদের বিপন্ন মুখ দেখে যেন হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল এ যে বাংলার ক্লাস, ভাষাতত্ত্বের জন্য মাত্র পঞ্চাশটি নম্বর, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আটপত্রের ক্লাস নয়। সুতরাং উচ্চৈঃশ্রবার গতিবেগ কিছু

সংযত করলেন। ভাষাতত্ত্ব মোটেই প্রাণহানিকর ব্যাপার নয়, বরং বড়োই সরেস বস্তু, তা বোঝাবার জন্য ব্ল্যাকবোর্ডে চকখড়ি দিয়ে ঝটিতে একটা বৃহৎ নরমুণ্ড এঁকে ফেললেন (পরে জেনেছি রেখাচিত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল) এবং সেই মুখব্যাদানীকৃত নরমুণ্ডের ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা, তালু, মূর্ধা, কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে যন্ত্রবৎ লিখে চললেন—labiodental, aiveolor, retroflex, alveopalatal, avular, glottal— সেই শব্দটংকারে যে ভয় পেয়েছিলোম তা কবুল করতে লজ্জা নেই। সহপাঠীদের আড়ালে তাঁর উচ্চারণভঙ্গী অনুসরণ করে ওষ্ঠ অধর প্রসারিত করে 'উ' এবং ছুছুন্দরের মতো সংকুচিত করে 'ঈ' উচ্চারণের চেষ্টা করতাম। জিভ বেচারাকে দন্তমূল, তালু, মূর্ধায় উঠিয়ে প্রায় খেচরী মুদ্রার অনুকরণ করতাম। যাই হোক, বাংলা ভাষার ঠিকুজি-কোষ্ঠী খানিকটা রপ্ত করা গেল। কোনোদিন ঝড়ের বেগে ক্লাসে ঢুকে একই বেগে রোল ডেকে বক্তৃতা শুরু করতেন। আস্তিন যথারীতি একটু গোটানো—যেন 'রণং দেহি' ভাব। সামনের বেঞ্চের দিকে চেয়ে (নিরঙ্কুশ ভালো ছেলে সাজতে গিয়ে প্রথম সারিতে বসার বিড়ম্বনা আর কাকে বলে।) দুম করে প্রশ্ন করতেন, 'Where did stop last day ?' তখন আতিপাতি করে জাব্দা খাতার পাতা ওল্টাতাম। কিন্তু সে 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'র মধ্য থেকে মটর-মুসুরি খুঁজে পাওয়া কি সহজ কথা। তিনি আর অপেক্ষা করতে পারতেন না, স্মৃতিসমুদ্রে সামান্য তরঙ্গ তুলে আদেশ করতেন, 'write on' এবং বাধাহীন জলস্রোতের মতো বলে যেতেন, 'By the middle of the 10th century, to which period the earliest extant specimens of Bengali can be referred; the Bengali language may be said to have become distinctive, as the expression of the life and religious aspirations of the people *of Bengal, with the nucleus of a literature uniting the various dialectal* areas' –কিন্তু সে অনর্গল বাক্যস্রোতকে রেখার আখরে বাঁধা কি সোজা ব্যাপার। পদে পদে ব্যাস কুটে হোঁচট খেতে হয়। স্বয়ং গণপতিরও যা অসাধ্য, তা পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের দুর্মেধা পড়ুয়ারা কীভাবে কলমবন্দী করবে! অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী কলম নিয়ে খাতার পাতায় বৃথাই আঁকিজুকি কাটত। আমরা ক'জনে কোনোপ্রকারে সেই 'ধাবমান' নোট (running note) থেকে মিলিয়ে মিশিয়ে ভাষার ইতিহাসের এক তিলোত্তমা-মূর্তি খাড়া করতাম। কিন্তু ব্যাপার ক্রমেই সঙ্গিন হয়ে উঠল। এ গন্ধমাদন থেকে পরীক্ষা পাসের বিশল্যকরণীটি উদ্ধার করা স্বয়ং পবনতনয়েরও অসাধ্য। বাংলা এম. এ. ক্লাসে এটাই ছিল দুর্ভাবনার প্রধান কারণ। চর্যাপদের নৈরাত্মাবধূতিকা, বৈষ্ণব পদাবলীর রাই-কানু এবং মঙ্গলকাব্যের মনসা ও চণ্ডীঠাকুরাণীকে খানিকটা বশ করতে পারলেও ভাষাতত্ত্ব আমাদের 'নয়ানক নীদ' এবং 'বয়ানক হাস' কেড়ে নিল। ODBL ইতিমধ্যে সংগ্রহের সুযোগ ঘটে গেল। আঁদুলের করীম উদ্দীনের কলেজ স্ট্রীটে পুরাতন বইয়ের দোকান ছিল। একই জেলায় বাড়ি বলে তার সঙ্গে কিছু হৃদ্যতাও ছিল। সে-ই মুশকিল আসান হয়ে দেখা দিল। তার কাছ থেকে দু'খণ্ড পুরাতন ODBL নগদ ৫০ টাকায় খরিদ করে খুলে দেখলাম এই মহাগ্রন্থ ইতিপূর্বে দুবার হাত বদল করেছে। কিন্তু কী সৌভাগ্য, আমার পূর্বসূরীদের কেউ কেউ মার্জিনে যে মূল্যবান নোট টুকে রেখেছেন, তা ফাউ হিসেবে পেয়ে গেলাম। এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে, যাকে উপনিষদে বলা হয়েছে 'অভীঃ' কতকটা সেইভাবে সাহসের সঙ্গে প্রথম সারিতেই বসে পড়লাম। অবশ্য তার জন্য রাত জেগে যথেষ্ট মানসিক যোগব্যায়াম করতে হয়েছে। অতঃপর তরী ঘাটে ভিড়ল। স্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে ১৯৪২-৪৪ সালের দুবছর কবে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু আমাদের অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। মনে পড়ে ভাষাতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে তাঁর বিশ্বপরিক্রমা। তাঁর স্মৃতি ছিল দুর্মর, যা আমাদের কাছে

মাঝে মাঝে দুঃসহ বোধ হত। সবই যদি তাঁর মস্তিষ্ক-কোটরে বন্দী থাকে এবং ডাক দিলেই সার বেঁধে হাজির হয়, তা হলে বেচারা দুর্মেধা ছাত্রদের অবস্থা কতটা সঙ্গিন হয়ে পড়ে তা ভুক্তভোগীরা মনে করতে পারবেন। বিদেশের অনেক মনীষী ভাষাতাত্ত্বিকের কথা শুনেছি, কিন্তু ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন-সমাজ-বিজ্ঞান-শিল্পকলায় স্বচ্ছন্দ পদচারণা আর কারো পক্ষে এতটা অবলীলাক্রমে সম্ভব হয়েছে কিনা জানি না। আড়ালে তাই কিছু কৌতুকের অভিপ্রায়ে তাঁকে 'বাইপেড এনসাইক্লোপিডিয়া' বলতাম। তারপর নানা প্রসঙ্গে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি, কিন্তু প্রায় অর্ধশতাব্দীর পূর্বেকার ছাত্রজীবনের কথা ভুলতে পারি না। চাই-ও না।

২

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দু-একখানি ছোটখাটো জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্যের ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান পুস্তিকা, জিজ্ঞাসা প্রকাশিত 'Suniti Kumar Chatterjee—the Scholar and the Man,' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'বাংলা সাহিত্যে পত্রিকা'র সুনীতিকুমার স্মরণসংখ্যা, চতুষ্কোণ, কথাসাহিত্য, পরিচয় প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে, কোথাও-বা তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতি সম্বন্ধে মৃদু সমালোচনাও হয়েছে, যাঁরা এ-পথের পথিক তাঁরা তার সংবাদ রাখেন। সে যাই হোক, এখানে তাঁর জীবনকথার পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। অসচ্ছল ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে অর্থের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও অধ্যয়নজীবনে তিনি ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছেন, পরীক্ষায় কৃতিত্বের জয়মুকুট শিরে ধারণ করেছেন, বহু দেশ পরিক্রমা করেছেন, দেশ বিদেশ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে বিদ্বজ্জনসভায় ভাষা ও সংস্কৃতিসংক্রান্ত অসংখ্য ভাষণ দিয়েছেন, আলাপ করেছেন, বহু উপাধি বিরুদ লাভ করেছেন--খ্যাতি সম্মান যেন তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে। দুই গোলার্ধ ভ্রমণ করে ভাষা - সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা শাখাপ্রশাখা সম্বন্ধে ভূরিপরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন, নানা রচনায় তা দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। মানুষের যে কোন সৃষ্টিকর্মকে সাগ্রহে স্বীকৃতি দিতে পারতেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে করতেই কেল্টিক, ইটালিক, জরমানিক, বাল্‌তিক, স্লাব, আর্মানি, হিট্টী, চীনা, জাপানি, ভোট-মোঙ্গল-বর্মি, ভারতের কোল-ভীল কিরাত, উত্তর ভারতের আর্য এবং দক্ষিণ ভারতের দ্রবিড় ভাষা ও সভ্যতা, আফ্রিকার জুলু-বান্টু-হটেন্‌টট্‌, মেক্সিকোর আজটেক মায়া প্রভৃতি বিচিত্র জন, তাদের ভাষা ও সমাজ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কৌতূহলী হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়বার সময়েই অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের কাছে গ্রীক ভাষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। এম. এ. পরীক্ষায় (ইংরেজি ভাষা—বি-গ্রুপ) প্রাচীন ও মধ্য ইংরেজি, জরমানিক ইংরেজি ভাষাতত্ত্ব নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন (১৯১৩) এবং গভর্নমেন্ট সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশন থেকে বৈদিক ভাষা সংক্রান্ত দুটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ফলে বেদের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন। এই সময়ে 'An Essay towards an Historical and Comparative Grammar of the Bengali Language' (The Sounds of Modem Bengali) শীর্ষক গবেষণাপত্র পেশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (পি. আর-এস) ও 'Comparative Philology with special reference to Bengali Dialects' রচনা করে 'জুবিলি রিসার্চ প্রাইজ' লাভ করেন। পি. আর. এস. গবেষণাপত্রের পরীক্ষক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই সন্দর্ভটি বিস্তারিত আকারে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ডি-এল. বার্নেটের নিয়ন্ত্রণে ডি. লিট. উপাধি লাভ করে (১৯২১) এবং বর্ধিতায়ন হয়ে ১৯২৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়, সুবিখ্যাত 'The Origin and Dvelopment of

the Bengali Language'.

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. ডিগ্রি লাভের পর ১৯২১-২২ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সোরবোর্ন কলেজ ও Eclo des Languages Vivantes Orientales-এ ইন্দো-আরিয়ান, স্লাব, ইন্দো-য়ুরোপীয় এবং অস্ট্রো-এশীয় ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁর অধ্যাপক ছিলেন সুবিখ্যাত ঝ্যুল ব্লক, আঁতোয়েন মেইএ, জাঁ পস্লুস্কি এবং পল পোলিও। এরই সঙ্গে অনুশীলন চলছিল সোগডীয়, প্রাচীন খোটানীয় এবং গ্রীক ও লাটিন ভাষা ও সাহিত্যের। অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরেছেন সারা ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রীস ও জরমানি। ১৯২২ সালে ভারতে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। অবশ্য বিলাত যাত্রার পূর্বে তিনি কিছুদিন বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজি অধ্যাপনা করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট ইংরেজি বিভাগে সহকারী অধ্যাপকরূপে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। অতঃপর ভারত সরকারের বৃত্তি লাভ করে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্বনিবিজ্ঞানে ডানিয়েল জোন্‌স এবং বার্নেটের কাছে এবং 'Indo-Aryan Linguistics--Origin and Development of the Bengali Language' শীর্ষক গবেষণা করে ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন, যেটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে (ODBL) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে তিনি অধ্যাপক তারপোরওয়ালার কাছে আবেস্তার পাঠ নিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ভাষাতাত্ত্বিকরূপে বিশ্বে শ্রদ্ধার আসন লাভ করলেন। দেশে এবং বিদেশে তাঁর এত ছাত্র তৈরি হল যে য়ুরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা যাস্ক, পাণিনি ও সুনীতিকুমারের নাম একসূত্রে গ্রন্থন করলেন। ভাষাতাত্ত্বিক মিচেল একবার য়ুরোপের বিদ্বজ্জনসভায় বলেছিলেন যে, যে-ভারতবর্ষে যাস্ক পাণিনির উদ্ভব, এবং এখনও যেখানে সুনীতিকুমারের মতো অসাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক আছেন, সেই ভারতবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা কেন যে বিদেশে ভাষাতত্ত্ব পড়তে আসে তিনি তার কারণ খুঁজে পাননি (দ্রঃ ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রণীত এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়')।

এখানে ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস ও ভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখাটি মনে পড়ছে। ১৪শ-১৮শ শতাব্দীর মধ্যে সর্বপ্রথম ইতালিতে গ্রীক ও লাটিন ভাষাতত্ত্বের চর্চা বিকাশ লাভ করে। ক্রমে হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জরমানি, স্পেন এবং ইংল্যাণ্ডে ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় ভাষাবিজ্ঞানীদের কৌতূহল আকৃষ্ট হয়। অবশ্য দেড়শ বছর আগেও ভাষাতত্ত্ব প্রাথমিক স্তরেই ছিল। ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে য়ুরোপের পণ্ডিতসমাজ ভারতের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যৎকিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হলেন। জেসুইট কোর্দু (jesuit Coeurdoux) ১৭৬৭ সালে এবং উইলিয়ম জোন্‌স ১৭৮৬ সালে সর্বপ্রথম সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রীক-লাটিন এবং অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষার নিকট-সম্পর্ক বুঝতে পারলেন। জোন্‌সের পরে তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বে সংস্কৃত ভাষাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এবং জর্মান পণ্ডিতেরাই (যেমন শ্লেগেল, ব্রুসমান, ফ্রানজ বপ্ ইত্যাদি) মানদণ্ড ধারণ করেন। কাল্ডওয়েল দ্রাবিড় গোষ্ঠীর চারটি ভাষা (তামিল, তেলুগু মালয়ালম, কন্নড়) আলোচনার পথ দেখিয়ে দিলে অন-আর্য দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত ভাষা সম্বন্ধেও য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। হর্নলি, গ্রীয়ার্সন, ঝ্যুল ব্লক, জন বীমস—এঁরাও ভারতীয় আর্যভাষার তত্ত্বগত দিক এবং তুলনামূলক ব্যাকরণ সম্বন্ধে নব নব দিক নির্দেশ করলেন। ব্লকের Formation de la Langue Maratha (Formation of the Maratha Language) গ্রন্থের পদ্ধতি অনুসারে সুনীতিকুমার তাঁর গ্রন্থের কাঠামো প্রস্তুত করেন। অবশ্য সেজন্য তাঁর মৌলিকতার ওপর কটাক্ষপাত করা উচিত নয়। কিন্তু

এদেশে সবই সম্ভব। তাঁর চিতাধূম নির্বাপিত হতে না হতেই কোনো কোনো নবীন বাঙালি গবেষক উচ্চকণ্ঠে প্রচার করলেন, যেহেতু সুনীতিকুমার চমস্কি প্রভৃতি প্রবর্তিত নব্য ভাষাবিজ্ঞানতত্ত্বের অনুকূল নন, সেই হেতু তাঁর যাবতীয় ভাষাতত্ত্বরীতিকে 'ব্যর্থ' ও 'অপূর্ণ' বলে সিদ্ধান্ত করা হল। কেউ বলেছেন, যেহেতু জ্যুল ব্লকের মারাঠী ব্যাকরণের রীতি অনুসরণ করেছেন, সেই হেতু তাঁর মৌলিকতা যথেষ্ট গভীর ও ব্যাপক নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কাল্ডওয়েলের দ্রাবিড় ভাষায় তুলনামূলক ব্যাকরণের আদর্শে জন বীম্‌স্‌ 'Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India' রচনা করেন। আর. এল. টার্নার 'A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages'- এর প্রেরণা পান মেইয়ে লুবক্‌-এর 'Romanisches Etymologisches Worterbuch' থেকে। এতে বীম্‌স্‌ ও টার্নারের যদি মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ না হয়ে থাকে, তা হলে ব্লকের মারাঠী ভাষার ব্যাকরণের রীতি অনুসরণ করে সুনীতিকুমার এমন কোনো 'Original sin' করে ফেলেননি।

তাঁর ODBL-এর ভূমিকায় গ্রীয়ার্সন লিখেছিলেন, "Endowed with a thorough familiarity with Bengali,—his mother-tongue, he has been able to bring together an amount of material which no European could ever have hoped to collect......"। এই বিশাল গ্রন্থের দুখণ্ড প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভূমিকা (অর্থাৎ আর্য জনতত্ত্ব ও আর্যজাতির পূর্ব ভারতে বিস্তার) এবং ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা—৬৪৮, এবং রূপতত্ত্ব (Morphology) নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা --৫২৮। এই একখানি গ্রন্থ রচনায় যে-কোনো ভাষাতাত্ত্বিকের সারাজীবন কেটে যায়। অথচ সুনীতিকুমার নানা চিন্তাঋদ্ধ কর্মে ব্যস্ত থেকেছেন, দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু গ্রন্থ রচনায় গুণগত উৎকর্ষে এবং ওজনে অসাধ্য সাধন করেছেন। গবেষকেরা সন্ধান করে দেখেছেন : ইংরেজি পুস্তক পুস্তিকা—৩০, সম্পাদনা—৩, প্রবন্ধ—২০৯, বিবিধ—১২৬, পুস্তক সমালোচনা —১৩০, ভূমিকা ইত্যাদি —২৬। বাংলা পুস্তক—১১, বাংলা ব্যাকরণ—৫, ভাষা প্রভৃতি সম্পর্কিত প্রবন্ধ—১৬১, বিবিধ—১১৮, ভূমিকা মুখবন্ধ—৩৭, পুস্তক সমালোচনা—২৭। হিন্দি গ্রন্থ—৭, নিবন্ধ—৪২, ভূমিকা ও মুখবন্ধ—১১। সংস্কৃতেও কিছু শ্লোক, প্রবন্ধ ও ভাষণ রচনা করেছিলেন। এক জীবনে এক ব্যক্তির পক্ষে এত বিশাল কর্মকাণ্ড প্রায় অবিশ্বাস্য। অবশ্য এর ফলে তাঁর প্রধান কাজ কিছু ব্যাহত হয়েছে। প্রকাশকদের তাগিদে ছোটদের জন্য text book সম্পাদনা করতে হয়েছে, স্কুলের পাঠার্থীদের জন্য অনেকগুলি ব্যাকরণও লিখেছেন— অবশ্য অন্যের সহযোগিতায়। সাময়িক পত্রের তাড়নায় অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন, বন্ধুদের উপরোধে প্রচুর পরিমাণে ভূমিকা লিখেছেন। স্বাস্থ্য ভালো ছিল, তাই এত পরিশ্রম করতে পেরেছেন। শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি না ঘটলে তাঁকে আরো কত অনুরোধ উপরোধ রক্ষা করতে হত কে জানে! ফলে তাঁর মূল্যবান সময় বৃথা কাজে অপব্যয়িত হয়ে গেছে। ছোটদের ব্যাকরণ লিখবার জন্য আরো লেখক ছিলেন, কিন্তু এ কাজে তাঁকে নিযুক্ত থাকতে হয়েছিল— বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের দুর্ভাগ্য। শালগ্রাম শিলা দিয়ে বাটনা বাটা চলতে পারে, কিন্তু তাতে শালগ্রামের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয়।

তাঁর বহু ছাত্র-শিষ্য নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে আছেন, ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় নব নব পন্থা অনুসরণ করে চলেছেন। তাঁর ODBL নানা ভাষা ও অঞ্চলের গবেষকদের ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। ডঃ বাণীকান্ত কাকতী ('Assamese, its formation and Development'), ডঃ উদয়নারায়ণ তেওয়ারী ('The Origine and Development

of Bhojpuri'), ডঃ বাবুরাম সক্‌সেনা, ডঃ সুভদ্র ঝা ('Evolution of Awadhi'), ডঃ কোরডা মহাদেব শাস্ত্রী ('Historical Grammar of Telugu as in the Early Inscriptions')— সুনীতিকুমারের ODBL আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ নিজ ভাষার ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

একটি সীমাবদ্ধ আলোচনায় তাঁর প্রতিভা, প্রত্যয় ও কৃতির যথার্থ পরিচয় দেওয়া যায় না। ভাষার ইতিহাস, ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও রূপতত্ত্ব, তুলনামূলক ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান, ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য, নিষাদ ও কিরাত জাতির সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে একালে আর কোন্ ভারতীয়কে তাঁর সমপর্যায়ে তুলে ধরা যাবে? ভারতের নানা আঞ্চলিক ভাষা, সাহিত্য ও জনপ্রবাহ সম্বন্ধে তিনি নানা প্রসঙ্গে ভাষণ দিয়েছেন, সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখেছেন। এখানে তার যৎসামান্য উল্লেখ করা গেল। ১. Place of Assam in the History and Civilisation of India— ১৯৫৪ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২. The People, Language and Culture of Orissa— ১৯৬৪ সালে ভুবনেশ্বরে প্রদত্ত বক্তৃতা; ৩. Dravidian— ১৯৬৩ সালে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতা ; ৪. Balts and Aryans in their Indo-European Background— সিমলা ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব অ্যাডভানস্‌ড্‌ স্টাডি,১৯৫৬; ৫. India and Ithiopia; from the 7th century B. C.—যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ওরিয়েন্টালিসে পঠিত প্রবন্ধের বর্ধিতায়তন, ১৯৬৩। তাঁর মনের বিশাল পটে দেশ-কাল ও জনপ্রবাহ যে চিন্তা ও মানসিকতার গভীর ছাপ ফেলেছিল তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে—Indo-Aryan and Hindi পুস্তকে (গুজরাট বিদ্যাসভার স্নাতকোত্তর গবেষণাবিভাগে প্রদত্ত বক্তৃতা), Kirata-Janakriti; The Indo-Mongoloids—their Contribution to History and Culture of India পুস্তিকাটি আসাম জোড়হাটে প্রদত্ত বক্তৃতার বর্ধিতায়তন রূপ, ১৯৪৭। Africanism: the African Presonality (১৯৬০) রাধাকৃষ্ণণের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। Indianism and Indian Synthesis—কলকাতা বিশ্বদ্যিালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতামালা এবং বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত বক্তৃতার সমাহার (১৯৫৯, ১৯৬২)। কত বিচিত্র বিষয় না তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দু-একটির উল্লেখ করি : Language and Linguistic Problems, The National Flag, Languages and Literatures of Modern India, Religious and Cultural Interpretation of India. Guru Gobind Singh, World Literarure and Tagore । রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য তাঁকে বিচিত্র রস ও সৌন্দর্যবোধে উদ্দীপিত করেছিল, তার চিহ্ন রয়ে গেছে Rabindranath নামে তিনটি বক্তৃতায় (মারাঠাওয়াদা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত, ১৯৬৩)। তাঁকে ব্যাকরণ, উচ্চারণতত্ত্ব সম্পর্কে ইংরেজি ও বাংলাতে একাধিক পুস্তিকা লিখতে হয়েছে, অনেকটা প্রয়োজনের অনুরোধে, কখনো-বা কর্তব্যের তাগিদে। যথা Bengali Self-taught (1927), A Bengali Phonetic Reader (1928), Phonetics in the Study of Classical Languages in the East (1967), On the Development of Middle Indo-Aryan (1983)। ইংরেজিতেও সম্পাদনা করেছেন একাধিক গ্রন্থ। ইংরেজিতে লেখা অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ, আলোচনা, সমালোচনা, অন্যের রচিত গ্রন্থের ভূমিকা ও মুখবন্ধ—যার সংখ্যা গণনাও দুঃসাধ্য। ১৯২১ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ইংরেজিতে ২০০-র বেশী প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার মধ্যে আছে আর্য, দ্রাবিড় ও কোলগোষ্ঠীর ভাষা, কিরাতজাতির জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব, শিল্পকলা ও ভাস্কর্য। যথা—The Pala Arts of Gauda and Magadha; Tansen as a poet; Pictures of life in Calcutta—a

hundred years ago; Sculptures as town decorations and some Calcutta sculptures; Two hundred years ago—Life in an Indian City; Abanindranath Tagore: Master Artist and Renovator; West African Negro Art—আরো কত বিচিত্র বিষয় যা প্রত্যক্ষভাবে ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত নয়। এ ছাড়াও তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ—যবদ্বীপ, বলি, নিগ্রো সংস্কৃতি-ভাষা-শিল্পকলা, আরবি-ফারসি, ভারত-চীনের সম্পর্ক, ভারত ও পলিনেসিয়া, ভারত, ইরান ও সূফীবাদ, তুরস্ক জাতি ও ভারতবর্ষ, আরমানিয়া, মংগোলিয়া, ফ্রান্স, মেক্সিকো, কায়রো, ইন্দোনেশিয়া, ট্রিপলি, ঘানা, চেকোস্লোভাকিয়া—প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে লেখা নানা প্রবন্ধ ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।

বাংলাতে লেখা ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বসংক্রান্ত এই বইগুলি শিক্ষার্থীদের দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান— বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা ও ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ (স্কুলের জন্য লেখা এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)। বাংলা ব্যাকরণের যথার্থ বৈজ্ঞানিক মূর্তি তিনিই প্রথম রচনা করেন। প্রকাশকদের অনুরোধ তাঁকে এইসব বালপাঠ্য ব্যাকরণ লিখতে হয়েছে—ছাত্রবোধ ব্যাকরণ, বাঙ্গালা রচনা প্রবেশ, মধ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ, প্রথম বাংলা ব্যাকরণ, আশুবোধ ব্যাকরণ, Primary English Grammar in Bengali, লঘু বাংলা ব্যাকরণ এবং স্কুলপাঠ্য সংকলন—সাহিত্যপরিচয়, পাঠমালা, বাঙ্গালা পাঠমালা, সাহিত্য সংগ্রহ, সাহিত্যশিক্ষা। এইসব রচনা ও সংকলনে তাঁকে বেশ কিছু সময় দিতে হয়েছে। কিন্তু তার কি কোনো প্রয়োজন ছিল? অবশ্য তাঁর সম্পাদিত পাদ্রি মানোএল দা-আস্‌সুম্প্‌সাম রচিত বাংলা ব্যাকরণ ('Vocabulario em Idioma Bengalla E Portuguez), হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখামালা, চণ্ডীদাস পদাবলী, বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, হরপ্রসাদ রচনাবলী, রামেন্দ্র রচনাসংগ্রহ—তাঁর খানিকটা সময় অধিকার করেছিল। অবশ্য গুরুত্বের জন্য এটুকু সময়ের অপব্যয় সহ্য করা যায়। কিন্তু তাঁকে ইংরেজি, বাংলা, হিন্দীতে এত প্রবন্ধ, সমালোচনা ও ভূমিকা লিখতে হয়েছে যে তাঁর মূল দান— বাংলা ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনা কিছুটা যে ব্যাহত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। একথা অবশ্যই সত্য যে, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন, তার দ্বারা তাঁর মানবিকী বিদ্যাচর্চা জাতির কল্যাণকরই হয়েছে। কিন্তু তার জন্য ভাষাবিজ্ঞান-চর্চা ও ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্ত উন্মোচন বাধা পেয়েছে একথা বেদনার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে। দীর্ঘদিন তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ODBL এর সংস্কার করবার সময় পাননি, তাঁর লেখনী এই মাপের আর কোনো গ্রন্থও প্রসব করতে পারল না। চমস্কি, ফ্রান্‌জ্ বোয়াজ, এডোয়ার্ড সাপির, গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় অবশ্য শুধু ভাষাবিজ্ঞানী ছিলেন না। গণিত-শাস্ত্র, নৃতত্ত্ব, সঙ্গীত ও শিল্পকলায় তাঁদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তাঁরা এই সমস্ত বিষয়ে প্রবন্ধাদিও (সাপিরের বহু প্রবন্ধ সঙ্গীত ও শিল্পবিষয়ক) লিখেছিলেন, কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানই ছিল তাঁদের 'পট্টমহাদেবী'।

অপরদিকে সুনীতিকুমার ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও মানবতাবাদের আকর্ষণে সমগ্র বিশ্বকে আলিঙ্গন করেছেন। ধর্ম-উপধর্ম, ভক্তিবাদ, মরমিয়া সাধনা, শিল্পকলায় ছিল তাঁর নিবিড় অনুরাগ। বাল্য-কৈশোরকাল থেকেই তিনি বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন (দ্রঃ তাঁর ডায়েরির অংশ 'জীবনকথা')। দ্বীপময় ভারত ভ্রমণকালে রবীন্দ্রসান্নিধ্য তাঁকে ঊর্ধ্বতর সত্তায় নিয়ে গেছে। সর্বোপরি তিনি হিন্দু। হিন্দুধর্ম, সমাজ, আচরণবিধি ও মানসিক চর্যা সম্বন্ধে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু ইসলাম, খ্রীষ্টান ইহুদী, প্রাচীন পারসিক, চীনের নৈতিক ধর্ম, আফ্রিকার আরণ্যক ঐতিহ্য, কোল-ভীল-সাঁওতাল, কিরাত

প্রভৃতি অনাগরিক জীবনচর্যাও তাঁকে আকর্ষণ করেছে। অবশ্য ধর্মানুশীলন নিয়ে নানা আলোচনা করলেও জ্ঞানবিশ্বাসে ছিলেন কঠোর যুক্তিবাদী । তাঁর প্রখর অপ্রমত্ত বুদ্ধির কাছে মানব-চেতনার বিরোধ ধরা পড়েছিল। যা যুক্তিসঙ্গত মনে করতেন তা স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হতেন না। রামায়ণ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ও সিদ্ধান্ত অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি, কিন্তু তিনি যুক্তিকেই সার জেনেছিলেন, প্রয়োজন হলে প্রথা ও সংস্কারকে সমূলে বিসর্জন দিতে পারতেন। এই সজীব বুদ্ধি বার্ধক্যেও তাঁকে পরিত্যাগ করেনি।

৩

কয়েক বৎসর পূর্বে সাহিত্য অকাদেমি ও হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ববিভাগের যৌথ উদ্যোগে সুনীতিকুমার শতবার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেখানে একটি পরিচ্ছন্ন পাঠচক্র ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল, তিন দিন ধরে সাধারণভাবে ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা সমস্যা এবং বিশেষভাবে সুনীতিকুমারের ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে কর্মকৃতি আলোচিত হয়েছিল। একদিনের অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক গঙ্গাধর গ্যাডগিল এক বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে আমাকে প্রশ্ন করেন, সুনীতিকুমার কত বড় ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু সাহিতচর্চা, বিশেষত বাংলা সাহিত্যচর্চায় তাঁর বিশেষ কোনো অবদান (সুনীতিকুমার কিন্তু অবদান শব্দটিকে এই অর্থে পছন্দ করতেন না) আছে কিনা। ব্যাপারটি খুবই প্রাসঙ্গিক। সেই সেমিনারে ভারতের নানা অঞ্চল থেকে সুনীতিকুমারের প্রাক্তন ছাত্র ও ভাষাতাত্ত্বিকেরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে বুঝলাম, তাঁরাও তা জানবার জন্য বিশেষ উৎসুক। বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না। তাই একটু বিস্তারিত আকারে তাঁর বাংলা গ্রন্থের পরিচয় দিলে এবং তাঁর ভাষাভঙ্গিমার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলে আলোচক ও শ্রোতারা চমৎকৃত হলেন। তাঁর মতো ভাষাবিজ্ঞানী বাংলা সাহিত্যের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিচরণ করেছেন, রবীন্দ্রসান্নিধ্যে এসে তাঁর বাংলা-সাহিত্য-প্রীতি ক্রমে শিল্প-সৌন্দর্যে ভরে উঠছে—এ সমস্ত তথ্য শ্রোতাদের অনেকেরই জানা ছিল না। সেই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে সুনীতিকুমারের বাংলা সাহিত্য পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

একথা অবশ্যই সত্য যে, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অন্তর্লোকে বিজ্ঞানচেতনার সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্পরসের ধারা বহমান ছিল। তা না হলে তিনি ৯-১০ খানি বাংলা গ্রন্থ লিখতে উৎসাহিত হবেন কেন, যার মূল প্রেরণা ছিল সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি। তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ ('কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাংলা উচ্চারণতত্ত্ব') সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৩২৩ বঙ্গাব্দ), যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি অধ্যাপনা করছিলেন (১৯১৪-১৯১৯)। ভাষা-তত্ত্ববিষয়ক প্রথম প্রবন্ধসংগ্রহ ('বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' ১৯২৯) প্রকাশনার পর সাময়িকপত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখলেও অনেকদিন তাঁর ভাষাতত্ত্ব ছাড়া আর কোনো বই প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু ১৯৩৫ সাল থেকে তিনি আবার সাহিত্যে ফিরে এলেন। এই সময়কার য়ুরোপ ভ্রমণের বিবরণ 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষে' মুদ্রিত হয়েছিল, পরে 'পশ্চিমের যাত্রী' নামে ১৩৪৫ সনে (১৯৩৮) প্রকাশিত হয়। এই একই বৎসরে, প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম প্রবন্ধসংগ্রহ 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য'। পরে এটির অধিকাংশ প্রবন্ধ 'ভারত-সংস্কৃতি'র (১৯৪৪) অন্তর্ভুক্ত হলে এটির প্রচার রহিত হয়। ১৯২৭ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়ে মালয়, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ ও শ্যামদেশ ভ্রমণ করেন, ১৩৪৭ সনে সেই ভ্রমণকাহিনী 'দ্বীপময় ভারত' নামে প্রকাশিত হয়, অবশ্য গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বেই এটি ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হয়। 'বিশ্বভারতী পত্রিকায়' সাত সংখ্যা ধরে শ্যামদেশ ভ্রমণের যে বিবরণ মুদ্রিত হয়

সেটি 'দ্বীপময় ভারত'-এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে প্রকাশিত হয় 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' (২য় সংস্করণ-১৩৭১ বঙ্গাব্দ)। ১৯৩৮ সালের য়ুরোপের ভ্রমণকাহিনী 'ইউরোপ--১৯৩৮' নাম নিয়ে দু'খণ্ডে (১৯৪৪ ও ১৯৪৫) আত্মপ্রকাশ করে। এর বেশকিছু পরে 'সাংস্কৃতিকী' (১ম খণ্ড—১৯৬২, ২য় —১৯৬৪)। ছাত্র ও অনুরাগীদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে শেষজীবনে 'জীবন-কথা' দিনলিপির ঢঙে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। ১৯৭৬ সালের ২ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মোট ৩১ দিনে ছাড়াছাড়াভাবে জীবনের স্মৃতিকথা লেখেন। পূর্বেই এর দু'-একটি প্রসঙ্গ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু স্মৃতিচারণা অসমাপ্ত রেখেই ১৯৭৭ সালের ২৯ মে লোকান্তরের যাত্রী হন। তাঁর ৯০তম জন্ম দিনে সেই অসমাপ্ত রচনাই 'জীবন-কথা' নামে (২০ নভেম্বর, ১৯৭৯) প্রকাশিত হয়। জন্ম থেকে শুরু করে স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্রজীবন বর্ণনাতেই এই 'জীবন-কথা' থেমে গেছে। ১৯৭৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির পর খাতার পাতা শূন্য। বার্ধক্যে পৌঁছেও জীবনের অম্লান স্মৃতি কিছুমাত্র অস্পষ্ট হয়নি। জীবনের ও পরিবারের কত কথাই না ধরা পড়েছে, মনের পটে এসেছে কত ঘটনা, কত চরিত্র। জীবনের শেষ পরিচ্ছেদে পৌঁছে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি নেমে আসছিল, হয়তো 'ওপারের আলো'র আভাস-ইঙ্গিত পাচ্ছিলেন, তখনই বিদায় নিতে হল।

তাঁর ভ্রমণকাহিনীগুলি যুগপৎ ভ্রমণতথ্য ও রসসাহিত্যের সমন্বয়। দেশ-বিদেশ ভ্রমণের সময় তিনি শুধু চোখ মেলে অজানা দেশ ও অজ্ঞাতপরিচয় মানুষকে দেখেননি, মনটিকেও খোলা রেখেছিলেন। সেই মনের ফলকে কত তথ্য ও তত্ত্ব ভিড় করেছে, কোনো কোনোটি বিচারবুদ্ধি ও চিন্তার ফসলে পরিণত হয়েছে। ভাষা কোথাও গুরুগম্ভীর ব্যাখ্যামূলক, কোথাও-বা সহজ চলতি জীবনের পটভূমিকায় মুখর। সাধুভাষার একটু দৃষ্টান্ত : 'গুডরুন সিগুর্ডের মৃতদেহের পার্শ্বে পাষাণমূর্তির মতো বসিয়া রহিল। অন্য স্ত্রীলোকের মতো বিলাপ করিল না, কিন্তু তাহার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতেছিল।... শেষে একজন স্ত্রীলোক সিগুর্ডের মুখ-ঢাকা চাদরখানা খুলিয়া দিল। গুডরুন চাহিয়া দেখিল--তাহার বীর স্বামীর সোনালী রঙের সুদীর্ঘ কেশপাশে রক্ত লাগিয়া জট পাকাইয়া গিয়াছে, তাহার উজ্জ্বল চক্ষু ঘোলা হইয়া গিয়াছে, বুকে তরবারি বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে' ('বৈদেশিকী'—১ম খণ্ড)। সাধুভাষার ঠাটে এটি রচিত হলেও কোথাও জড়তা নেই, দুঃখের চিত্রকে তিনি ভাবাবেগের রসে আর্দ্র করার চেষ্টা করেন নি। আবার যখন চলতি ভাষায় লিখেছেন, তখন তা মুখের ভাষার কাছাকাছি গেলেও হুতোমের মতো কলকাতা ককনি-তে পরিণত হয়নি। যেমন-- 'পেরার রাজবাড়ির অবস্থানটি অতি চমৎকার। বাড়ির পিছন দিয়ে দুই কূল ছাপিয়ে ছোট্ট Kinta কিন্তা নদীটি ব'য়ে যাচ্ছে। ও-পারে কাছে পাহাড়, দুরেও পাহাড়। নদীর ধারে সুন্দর ঘাসের মাঠ, একটি ঘাট, কতকগুলি বড়ো-বড়ো গাছ, আর ফুল বাগান। দুপুরে নদীর ধারে একটি চেয়ার নিয়ে গাছের তলায় বসে বই পড়া আরামের' ('রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ')। এখানে যেন ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ উঁকি দিচ্ছেন। কবিগুরুর সঙ্গে মালয় যবদ্বীপ শ্যামদেশ ভ্রমণের সময় তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল ওই দেশগুলির বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের ছবিগুলি মনের ফটোগ্রাফে ধরে রাখা। বর্ণনা প্রসঙ্গে অসংখ্য বস্তু-উপাদান এসে গেছে, কিন্তু তথ্য ও তত্ত্ব গুরুভার হয়ে ভ্রমণের আনন্দ ক্ষুণ্ণ করেনি। কোথাও কোথাও সরস কৌতুককণাও ছিটকে পড়েছে। একটু উল্লেখ করি। মালয়গামী জাহাজের ডেকে মার্কিন মুল্লুকের কয়েকটি 'মোটাসোটা, থপথপে unromantic শ্রীছাঁদবিহীন পুরুষের সঙ্গে (এদের কারো কারো বত্রিশ পাটী দাঁতের মধ্যে

ষোলো পাটিই সোনা-বাঁধানো। কবি বলছেন,— বহুমূল্য এদের হাসি, সোনার হাসি কিনা।) উদ্দাম নৃত্য জুড়ে দিয়েছেন কুমারী আর অবীরা, প্রৌঢ়া, তরুণী আর অজ্ঞেয়-বয়স্কা, পীনা, তন্বঙ্গী আর স্থূলোর্ধ্বমধ্যঙ্গী ও ক্ষীণ-নিম্নাঙ্গী রমণীও। এই বিকট জ্যাজ ঠাটের গান ও উল্লম্ফ নৃত্য রাস্তাপেটা রোলার-ইঞ্জিনের আর্তনাদ স্মরণ করিয়ে দেয়। রাত বারোটায়, ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথ কেবিনে ঘুমুচ্ছিলেন। এ-সব সঙ্গীতসাধনার প্রবল জগঝম্প বোধ হয় তাঁর কর্ণগোচর হল না।' সুনীতিকুমারের এ বর্ণনা মজলিসি ও কৌতুকরসে ভরপুর। আর একটি বর্ণনার উল্লেখ করি। সেটি 'লণ্ডনে আমাদের দুর্গোৎসব' (পথ-চলতি-১ম খণ্ড) নামে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন লণ্ডনপ্রবাসী গুটিকয়েক ছাত্র গিয়ে সুনীতিকুমারকে পাকড়াও করলেন— 'এবার জনকতক বাঙালিতে মিলে লণ্ডনে পুজো করলে হয় না?' কিন্তু তিন চারদিন ধরে দুর্গাপুজো লণ্ডনের মতো কেজো শহরে সম্ভব হবে না। সুতরাং শুধু অষ্টমী তিথিটি পালন করা যাক। সহৃদয় ল্যাণ্ডলেডির সম্মতি মিলল। যোগাড়যন্ত্র মন্দ হল না। চারজন বাঙালি, একজন মদ্রদেশীয় আর একজন বিহারি ভাই-বেরাদর। আর বাইরে থেকে ডেকে- আনা জনা কয়েক ভক্তের সমাবেশ হল। সুনীতিবাবু বললেন, 'কানু, তুমি তো পাকা রসুইয়ে হে, আর রঞ্জনবাবু আপনি তো দশকর্মান্বিত ব্যক্তি, রান্নাটাও নিশ্চয়ই আপনার আসে—দু'জনে মিলে তোমাদের ল্যাণ্ডলেডিটির অনুমতি নিয়ে তার রান্নাঘরে খিচুড়ী আর পায়েস ভোগ তৈরি করো তার সঙ্গে একটু গানটান হবে— লণ্ডনে এই আমাদের দুর্গোৎসব হবে।' অগ্নিকুণ্ডের mantlepicce-এর উপর কলকাতা থেকে কেনা তিন-আনা দামের পট অধিষ্ঠিত হল, একরাশ ফুল আর ধূপ। বটুর অনুরোধে সুনীতিকুমার ঋগ্বেদের দেবীসূক্তটি নকল করে পকেটে পুরে এনেছিলেন। জুতো খুলে পেন্টুলন সমেত একটা কোচে বাবু হয়ে বসে (যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ) সেটি আউড়ে গেলেন, তার ব্যাখ্যাও করলেন, শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে ছাড়লেন না। ল্যাণ্ডলেডিটি ভালো, কৌতূহলের সঙ্গে সব কিছু লক্ষ্য করতে লাগলেন। পুজোর পর ভোগরাগ। মাখন-গলানো ঘি দিয়ে তোফা মুসুর ডালের খিচুড়ি, টাটকা হ্যাডক মাছ-ভাজা, জলপাইয়ের তেলে পাঁপরভাজা, টোমাটো বা গুড়-বেগুনের চাটনি, তার সঙ্গে ল্যাণ্ডলেডির রান্না ভেড়ার মাংসের কারী এবং আবদুল্লার হোটেল থেকে আনানো মিঠাই- -দেবীর ভোগ বৈষ্ণব ও শাক্ত মতে ভালোই জমল। তারপর পিয়ানোর ধারে বসে টুংটাং বাজনা এবং কালোপযোগী শ্যামাসঙ্গীত—"শ্মশান ভালোবাসিস বলে মা শ্যামা" এবং তার সঙ্গে গজল-ঠুমরীও বাদ গেল না। সুনীতিকুমার রঘুবংশ আর মেঘদূত থেকে আবৃত্তি করলেন। বিজয়া দশমীর দিনে মিষ্টি চকোলেট, আর নারকেলের ছাবা, ওখানে বলে Cokenuut Kornel। শুধু একটু খুঁত রয়ে গেল, সিদ্ধির ব্যবস্থা করা গেল না। 'বিলেতে আমাদের দুর্গোৎসব এই ভাবেই হ'ল।' পাঁচুগোপালের আবৃত্তির পরে (একটি ইংরেজি Twinkle, twinkle, little star এবং একটি বাংলা- 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল') বিজয়াসম্মেলন শেষ হল। তাঁর মতো নানা বিদ্যায় নিষ্ণাত পণ্ডিতের মনটি কিছু সময়ের জন্য আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল, এখানে তা লক্ষ্য করা যাবে। এ বর্ণনার ভাষাভঙ্গি যা ঘরোয়া পরিবেশকে হুবহু অনুসরণ করেছে।

তাঁর শেষ রচনা ('জীবন-কথা') এখানে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো । এটি তাঁর স্মৃতিকথা, আত্মোক্তি, রোজনামচা। তাঁর অন্য গদ্য রচনায় চিন্তা ও জ্ঞানের বিচিত্র সমারোহ, ক্বচিৎ কদাচিৎ দু-একটি রচনায় তাঁর-ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন হয়েছে। যেমন দুটি নিবন্ধ 'আমার ছেলেবেলার কথা', শৈশবস্মৃতি-বিস্মৃতির পটে স্থাপন করে নিজের হারানো কালকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর 'জীবনকথায়' অন্তর্জীবনের যথার্থ স্বরূপ ধরা

পড়েছে। বরাবর তিনি যুক্তিবাদী। যুক্তির নিরিখে সব কিছু তৌল করা তাঁর মনের প্রকৃতি। ফলে পারমার্থিক সত্তা সম্বন্ধে তাঁর মনে স্বাভাবিক ভাবেই সংশয় জমে উঠছিল—অবশ্য সংশয় থেকেই সিদ্ধান্তের উৎপত্তি। 'Doubting Thomas' -এর দল মাঝে মাঝে আমাদের স্থাণু বিশ্বাসকে নাড়াচাড়া দিয়ে চঞ্চল ও সন্দেহবাদী করে তোলেন। ফলে আমরা মনের দিক থেকে সুস্থ ও স্বস্থ হয়ে উঠি। সুনীতিকুমার জীবনাবসানের কিছু আগে জীবনের তাৎপর্য খুঁজেছিলেন। তাঁর ঐ পুস্তিকা থেকে জানা যাবে, তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, যুক্তি-বুদ্ধি -প্রমাণের অতীত কোনো পরমসত্তা আছে কি? যদি থাকে, তবে তার সঙ্গে মানুষ ও ভৌমজগতের কী সম্পর্ক? এই প্রশ্ন নিয়ে কয়েক হাজার বছর ধরে নানা দেশের নানা ভাষায় হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে, কিন্তু কোনো তমোহর দিব্যজ্যোতি মানুষের অন্ধ নয়নে নিরঞ্জন বোধির অনির্বাণ দীপ জ্বালতে পেরেছে কি? সুনীতিকুমার তাঁর শেষকথায় সেই প্রশ্ন তুলেছেন। কৈশোরকাল থেকেই তিনি বিবেকানন্দের বেদান্ততত্ত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু পুরোপুরি অদ্বৈততত্ত্বে অবস্থান করতে পারলেন কি? তাই স্বীকার করেছেন, 'এখনও এই বৃদ্ধ বয়সে এই অনির্বচনীয়তার গণ্ডী বা জাল কাটিয়ে উঠতে পারলুম না। এক ধরনের মানসিক যুক্তি-নিষ্ঠ, অজ্ঞেয়বাদিতা মনে আসে— কিছুই তো জানতে পারলুম না, তবুও এ অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞেয়ের টান এতটা অনুভব করি, কিন্তু নিজের কাছেও উত্তর আসে--আমি কী জানি? কিছুই জানি না। তবুও রবীন্দ্রনাথের মতোই 'আমি কী জানি!' বলার সঙ্গে সঙ্গে এক অব্যক্ত ক্রন্দন আসে, সমস্ত অস্তিত্বকে আলো-করা দূরাপনা বায়ুর মতো অজ্ঞেয় উর্বশীর জন্য, মনের গভীরতম আকাঙক্ষা আর প্রার্থনা জাগে। এই জীবনে তাকে বুঝি বা না বুঝি, জানি বা না জানি, কেবল রসানন্দেও 'প্রাণ উঠে যেন পুলকি'।' এটাই বিস্ময় যে, তাঁর মতো নিশ্ছিদ্র যুক্তিবাদী পণ্ডিতব্যক্তি কোনো নামপরিচয়হীন সত্তার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে উঠবেন কেন, কেন একটা অনির্বচনীয় ক্রন্দন হৃদয়ের দু'কূল ছাপিয়ে উঠবে? তাঁর শেষ কথা, "বাধা না মেনে চোখে জল নেমে আসে। এরকম অজ্ঞাত অব্যক্তের উদ্দেশে এই অন্ধভাবে হাতড়ানো, নিরুপায় ক্রন্দন...। কান্না আসে, অনুযোগ আসে, আরএক ধরনের শান্তিও আসে— এই নিয়েই, আর দেহ-রক্ষার পরে যা ভবিতব্য তাই আমাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে এই বিশ্বাস নিয়েই, আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ব'লে একটা আবছা কৌতূহল-মিশ্র আশা নিয়েই বাকি কটা দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। এই অবস্থার জন্য দুঃখ বা ক্ষোভ বা অনপনেয় অস্বস্তি আর এখন নেই। 'তৎসৎ'—যা আছে, তারই জয়। 'কো অদ্ধা বেদ?' কে-ই বা নিশ্চিতভাবে এই অনাগতকে জানে?' সুনীতিকুমার জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই অনাগতকে জানতে চেয়েছিলেন। তারপর 'ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।'

সুকুমার সেন

ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় সম্বন্ধে দুই চারি কথা লিখিতে বসিয়া আমার নিজের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়িয়া গেল। পাঠক-পাঠিকার কাছে তাহার জন্য মাপ চাহিয়া লইতেছি। বোধ হয় ১৯৪০ সালের কথা। আই. এ. পরীক্ষা দিয়া দুই মাস দম লইতেছি আর দিন গণিতেছি কবে 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর' উপস্থিত হইবে। আমাদের হাওড়ার বাসাবাড়ীর নিকটেই ভূনাথ মুখোপাধ্যায় নামে একজন পাশকরা চারুশিল্পী স্টুডিও খুলিয়া খরিদ্দারের আশায় বসিয়া থাকিতেন, পরবর্তীকালে তিনি আর্ট কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। আমি কোনো কোনো দিন তাঁহার স্টুডিওতে গিয়া ছবি দেখিতাম এবং মনে মনে সেই ছবি মক্‌স করিতাম। কিঞ্চিৎ পূর্ব-অভিজ্ঞতাও ছিল, স্কুলে ত্রিকোণাকৃতি পরোটার সাইজে ভারতবর্ষের ম্যাপ আঁকিয়া আগেভাগে বেশ খানিকটা হাত পাকাইয়া রাখিয়াছিলাম। সাহস বাড়িলে উক্ত শিল্পীর দেখাদেখি আমিও দুটি-একটি স্কেচ শুরু করিলাম। গো-মহিষাদি প্রাণী ছাড়িয়া তখনো মনুষ্যলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই এবং যথারীতি পিতৃদেবের কাছে এই অপকর্মের জন্য ধরা পড়িয়া গেলাম। কিন্তু তিনি চটিলেন না, পুত্রের এতাদৃশ শিল্পকর্মে বোধ হয় মনে মনে খুশিই হইলেন। আই. এ. পাশ করিতে পারিলে আমাকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করিয়া দিবেন, এমন একটা আভাসও দিলেন। তাঁহার ধারণা চাকুরীর বাজারে 'হুনুরী' কর্মের কিছু ভবিষ্যৎ আছে, শুধু কেরানিগিরি করিয়া কী হইবে। পরীক্ষার ফল বাহির হইল, নিতান্ত মন্দ হইল না। বিশেষতঃ বাংলায়। সুতরাং বাংলায় অনার্স লইতে আর কোন বাধা রহিল না। পিতৃদেব অগত্যা সম্মত হইলেন, যদিও বুঝিলেন বাংলায় দিগ্‌গজ হইলেও চল্লিশ টাকা বেতনের স্কুলের চাকরি ভিন্ন ভদ্রগোছের আর কিছু জুটিবে না। তবু বাংলায় অনার্স লইয়া বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি করিয়া দিতে আপত্তি করিলেন না। কপালগুণে একটা মধ্যম রকমের বৃত্তিও জুটিয়া গেল। বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হইবার কারণ, আমাদের আগের বারে, বাংলা অনার্সের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজ হইতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিলেন। আমিও সেই কলেজে ভর্তি হইলাম, কোন্ আশায় বলিয়া কাজ নাই।

যদিও বাংলা অনার্সের দ্বিতীয় ব্যাচ বলিয়া গর্বে বেশ ফুলিয়া উঠিতেছি, তবু ইংরেজি ও অর্থনীতির অর্নাস-পড়ুয়া সহপাঠী বন্ধুদের পাশে যেন কিঞ্চিৎ মলিন হইয়া গেলাম, এখনো বোধ হয় সেই রেওয়াজ আছে। যাহা হউক, ক্লাসে পড়িতে গিয়া সর্বপ্রথমে ডঃ সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' হাতে পাইলাম, তাহার সঙ্গে আর একখানি বহি ফাউ হিসাবে জুটিল, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।' বলা বাহুল্য, দুটি গ্রন্থই, স্বল্পায়তন সত্ত্বেও, অতিশয় ভীতিপ্রদ, বিশেষত প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে। বি. এ. ক্লাসে আর কতটুকুই বা ভাষাতত্ত্ব পড়িতে হইত, কিন্তু তাহাতেই যথেষ্ট বেকায়দায় পড়িয়া গেলাম। কিন্তু পিছু হটিলে চলিবে না, অনেক ফরিয়াদ করিয়া বাংলা অনার্স লইবার অনুমতি পাইয়াছিলাম। সুতরাং উক্ত গ্রন্থদুটি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠের মতো পড়া শুরু করিলাম এবং কিছু আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু আরো আছে, এত সহজে ডঃ সুকুমার সেন আমাকে রেহাই দিলেন না। সেই সময়ে ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড) নামক ভীমকান্ত গ্রন্থটি চৌকা অভিধানের আকারে হরিদ্রাভ মলাটসহ বাহির হইয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্ন ও দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থ লইয়া কোনও প্রকারে কলেজযাত্রা নির্বাহ করিতেছিলাম, হায় একী দুর্দৈব। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যে এতটা

হৃৎকম্পের ব্যাপার তাহা তো পূর্বে জানিতাম না। ইতিপূর্বে তাঁহার আর একখানি ঈষৎ শীর্ণকায় গ্রন্থ ('বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা') খানিকটা বশে আনিয়াছিলাম। কিন্তু এই পৃথুলকলেবর ইতিহাস। ইহা আরম্ভ করিতে হইলে পবননন্দন অথবা মধ্যমপাণ্ডব হইতে হইবে। তখনো ডঃ সেনকে চর্মচক্ষে দেখি নাই, শুনিয়াছি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। তাহা হইলে সে তত্ত্ববস্তুটি কি প্রকার ভাবিতেই শিহরণ পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের 'ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' নাড়া চাড়া করিতে গিয়া ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' মনে পড়িয়া গিয়াছিল, সেইরূপ বি. এ. অনার্স ক্লাসে ডঃ সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' পড়িতে গিয়া তাজ্জব বনিয়া গিয়াছিলাম। পুরাতন বাংলা সাহিত্য বলিতে যে এমন একটা পুঁথিঠাসা রুদ্ধশ্বাস ব্যাপার বুঝায়, তাহা কখনোই অনুমান করিতে পারি নাই। এত কবি, এত পুঁথি তুলোট কাগজে শেষশয্যা পাতিয়া খেরোর কাঁথা মুড়ি দিয়া মরণঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহাদের লইয়া কী করিব? আমাদের মতো সুকুমারমতি নবকিশোরদের কচি-কাঁচা মস্তকে তিনি এ কী মুষল নিক্ষেপ করিলেন! তবে একটা কথা, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগাসন করিবার ফলে ঐ ভয়াবহ গ্রন্থটিও একপ্রকার কব্জা করিলাম। ক্রমে বি. এ. পরীক্ষায় তো 'অনার গ্রাজুয়েট' (শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল' দ্রষ্টব্য) হইয়া বাহির হইলাম। যাহা হউক পরীক্ষায় তাঁহার মান রাখিলাম।

যথাসময়ে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হইলাম। সেখানে আর এক ব্যাপারের মুমূর্ষুবৎ হইয়া পড়িলাম। ভাষাতত্ত্বের ক্লাসে খোদ আচার্য সুনীতিকুমার 'রণংদেহি' রূপে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার ODBL তখনই বাজারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছিল। প্রায় তিনগুণ দাম দিয়া উক্ত গ্রন্থের পুরাতন কপি সংগ্রহ করিলাম। গুরু ও শিষ্যের গ্রন্থ ভাগাভাগি করিয়া পড়িয়া এবং ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের বৈশাখী ঝড়ের-মতো বক্তৃতাপ্রবাহে আন্দোলিত হইতে হইতে এম. এ.-র বেষ্টনী পার হইয়া গেলাম। খবরের কাগজে মুণ্ড ছাপা হইল, যদিও তাহা চিনিবার উপায় নাই। তাহা আমার মস্তকও হইতে পারে, কণ্ডু দাবানলের কৌটার বিজ্ঞাপনও হইতে পারে।

এম. এ. ক্লাসে পড়িবার সময়ে আমার এক সহপাঠী দূর হইতে দেখাইলেন ঐ যে সুকুমার সেন মহাশয়। কিন্তু কাছে যাইতে সাহস সঞ্চয় করিতে পারিলাম না। কি জানি মনে হইল, এখনই হয়তো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবেন এবং উত্তর দিতে না পারিলে বলিবেন, বাড়ি যাইবার পথে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ খানি কিনিয়া লইয়া আর একবার বানানগুলা ঝালাইয়া লওয়া প্রয়োজন। আচার্য সুনীতিকুমার ভাষাতত্ত্ব পড়াইতেন। তবে তাহাকে ভাষাতত্ত্ব না বলিয়া বিশ্বতত্ত্ব বলা যাইতে পারে। আমরা মূলতঃ বাংলার ছাত্র, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ছাত্র নহি, সে কথা ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের সব সময় মনে পড়িত না। তিনি অবিরাম ভাষাতত্ত্বের কামান দাগিয়া যাইতেন, এবং আমরাও মাথা নীচু করিয়া তাহা পার করিয়া দিতাম, সুতরাং প্রাণহানির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ক্লাসের পর নোটখাতা খুলিয়া পরীক্ষা পাশের বিশল্যকরণী গুটিকা প্রস্তুত করিয়া লইতাম, একালের পড়ুয়াদের মতো সাজেসনের জন্য হন্যে হইয়া তামাম কলিকাতা চষিয়া বেড়াইতাম না। বলা বাহুল্য তখনো 'ভাষার ইতিবৃত্ত' জপমালার মতো ধরিয়া রাখিয়াছি। এম. এ. পড়িতে পড়িতে দেখিলাম ডঃ সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইল, আমাদের শিরে আবার একটি থান ইঁট পড়িল। তবে আশ্বাসের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড কিছু হ্রস্ব আকারের। পড়িয়া বুঝিয়াছি এ গ্রন্থ পরীক্ষাবৈতরণী পারের একমাত্র ভেলা। সুতরাং আমরা, যাহারা পারগামী, তাহারা নির্ভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলাম। ডঃ সেনের আদর্শেই মাদৃশ ক্ষুদ্রজনও বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনার অভিপ্রায়ে পুঁথিপত্র লইয়া বসিয়া গেল। ভাগ্যে পূজনীয় অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু বকিয়া-ঝকিয়া

পুঁথিপড়া শিখাইয়াছিলেন। আখেরে সে বিদ্যা কাজে লাগিল। ডঃ সেনের গ্রন্থ হইতেই আমরা উৎসাহ পাইয়াছি, নূতন পথে চলিবার জন্য সাহস সঞ্চয় করিয়াছি। তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া যাহা আমাদের দান করিয়াছেন আমরা তাহা মূলধন করিয়া সাহিত্যের বাজারে কোনপ্রকারে কারবার চালাইয়া যাইতেছি।

ছাত্রজীবনে দূর হইতে এবং কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি। কিন্তু আই. এ. পরীক্ষার খাতা পরীক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিলাম। সে আমার দুলর্ভ সৌভাগ্য। আমাদের যুগে অধ্যাপক যতই হীরার ধার হউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত না থাকিলে ঠিক যেন পুরা সম্মান আদায় করিতে পারিতেন না। সেবার অকস্মাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে প্রমোশন পাইয়া ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করিবার জন্য আহূত হইলাম। শুনিলাম, ডঃ সুকুমার সেন প্রধান পরীক্ষক, আমাদের মতো অর্বাচীন পরীক্ষকদের কীভাবে দেখিবেন কে জানে। দুই-চারিখানি খাতা পরীক্ষা করিয়া তাহার স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক হইয়াছে কিনা দেখাইবার জন্য অনেক ইতস্তত করিয়া তাঁহার গোয়াবাগানের বাসাবাটিতে হাজির হইলাম। এত নিকট হইতে তাঁহাকে কোনদিন দেখি নাই। আলাপ করিয়া ক্রমে ভয় ভাঙিল। তিনি তাঁহার গুরুর মতো অর্বাচীন ছোকরা অধ্যাপককে 'আপনি' বলিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, আমার অস্বস্তির সীমা রহিল না। যাহা হউক, তিনি আমাকে পরীক্ষিত উত্তরপত্র স্ক্রুটিনি করিতে বলিলে আমি আশাতীত সৌভাগ্যে কৃতার্থ হইলাম। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরীক্ষক, তদুপরি আবার স্ক্রুটিনি করিবার অতিশয় স্বাদু আহ্বান । সে কাজেও লাগিয়া গেলাম। তাঁহার বৈঠকখানায় ঢালা শতরঞ্জি পাতা, তাহার উপর খাতার বোঝা লাইয়া চোখমুখে গাম্ভীর্য ফুটাইয়া স্ক্রুটিনি করিতে লাগিলাম। প্রথম দিনেই দেখি বন্ধুবর দেবীপদ ভট্টাচার্য, হরিপদ চক্রবর্তী ও পঞ্চানন চক্রবর্তী খাতা কোলে করিয়া বসিয়া গিয়াছেন। আমরা শতরঞ্জির উপরে ধ্যানাসনে বসিয়া নূতন ধরনের যোগব্যায়াম করিতেছি। ডঃ সেন চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর ঈষৎ ঝুঁকিয়া নিজের মনে কাজ করিয়া চলিয়াছেন। সময় চলিয়া যায়, কাজ করিতে করিতে মেরুদণ্ড টন্‌টন্‌ করিয়া উঠে, পোকাবাছাই কাজে বিরক্তি ধরিয়া যায়। কিন্তু নীরস কর্তব্যও সরস হইয়া উঠিত যখন দেখিতাম সম্মুখে ধূমায়িত চা, এক থালা ফুলকো লুচি এবং তৎসহ অন্যান্য অনুপান। দিনে একবার নহে একাধিকবার আহারের বিচিত্র আয়োজন। তাহাতে শাক্ত ও বৈষ্ণব দুইপ্রস্থ আইটেম থাকিত। তাহার সঙ্গে কখনো কখনো ছোট একটি গ্রামোফোনে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নবদ্বীপ হালদারের কমিক--অপূর্ব কম্বিনেশন। মাঝে মাঝে ডঃ সেনও হাসিয়া উঠিতেন। অদূরে শ্রীমান বাবুসাহের (অর্থাৎ ডঃ শ্রীমান সুভদ্র সেন) দুয়ারের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া রস গ্রহণের চেষ্টা করিত, কিন্তু পিতার দৃষ্টি পড়িলেই চকিতে মিলাইয়া যাইত। কোন কোন দিন— রাত বাড়িতেছে, বেশ জাঁকাইয়া বৃষ্টি হইতেছে, একটু পরেই গোয়াবাগান বিডন স্ট্রীটে বান ডাকিবে। উঠি উঠি করিতেছি। ডঃ সেন ভূতের গল্প ফাঁদিলেন, তখন অশরীরী জীবগুলা যেন কায়া ধরিয়া সম্মুখে খাড়া হইল। আমাকে আবার হাওড়ায় ফিরিতে হইবে। হয়তো এই দুর্যোগে অন্ধকারে পথঘাট ডুবিয়া যাইবে, যোগমায়া দেবী লেনের একমেবমদ্বিতীয়ম ল্যাম্প পোস্টটি ঝড়ো বাতাসে হয়তো চক্ষু বুজিয়া থাকিবে, 'আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে'—অন্ধকার গলিপথ দিয়া একাই চলিতে হইবে, অবশ্য শ্রীরাধার অভিসারের ঢঙে নহে। ডঃ সেনের গল্পের ছায়ামূর্তিগুলি যদি সঙ্গ লয়? স্বতোনাসিক্যীভবনের ধ্বনিতাত্ত্বিক রীত্যনুযায়ী যদি সম্বোধন করিয়া বসে? তাহা হইলে কোন্ ভাষায় উত্তর দিব? পৈশাচী প্রাকৃতে, না অন্য কোনো 'প্রেতভাষায়'? অবশ্য দুয়েতেই সমান অভিজ্ঞতা।

একদিন বিকালের দিকে জোর কদমে স্ক্রুটিনি চলিতেছে, আমরা অতিশয় ব্যস্ত, মাথা তুলিবার অবকাশ নাই, শেষ কিস্তি পরের দিন ট্যাবুলেটরের নিকট যাইবে। সামনের প্লেটে ফুলকো লুচি মাংসের ঘুগনি ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, আর একটি ছোট প্লেটে আরও গুটিকয়েক 'পুরুষ্টু' মিষ্টান্ন পড়িয়া রহিয়াছে— সে দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর নাই। ডঃ সেনের এক পরিচিত ভদ্রলোক ঘরে উঁকি মারিলেন, এবং সম্মুখে শায়িত রজতকান্তি লুচি ও স্বর্ণকান্তি মাংসের ঘুগনি অনাদরে পড়িয়া আছে দেখিয়া বলিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা করিতেছে দু-এক প্লেট টানিয়া লইয়া বসিয়া যান। ডঃ সেন স্বভাবসিদ্ধ মৃদুস্বরে বলিলেন, আপনিও ঐরকম হাড়ভাঙা পরিশ্রম করুন, তবে তো গরম লুচি। আগে গোবর্ধন ধারণ, তারপর রাসলীলা। ভদ্রলেক সম্ভবত গোবর্ধন ধারণে সমর্থ ছিলেন না। সুতরাং রাসলীলা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

সেই সব দুর্লভ লঘু মুহূর্তের কথা মনে পড়িতেছে। মনে পড়িতেছে, নীরস কর্মের ফাঁকে ফাঁকে ডঃ সেনের মৃদু পরিহাস ও মজাদার গল্প জমাইবার অদ্ভুত বাক্‌কৌশল। একদিন, ঘনঘোর বর্ষার সন্ধ্যায়, যখন আমরা সারাদিন খাটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তখন তিনি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যাঠামহাশয়ের রহস্যময় অন্তর্ধানের কাহিনী বলিলেন--সেদিন সুনীতিকুমারের জ্যাঠতুতো ভগিনীর বিবাহ, মণ্ডপসজ্জা প্রস্তুত, অনেক আগেই নিমন্ত্রণপর্ব সারা হইয়াছে। জ্যাঠামহাশয় প্রতিদিনের মতো সুকিয়া স্ট্রীট হইতে বাহির হইয়া খুব ভোরেই গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন, কিন্তু আর ফিরিলেন না, অনেক সন্ধান করা হইল, গঙ্গার জল প্রায় মন্থন করা হইল, কিন্তু কোথাও কোন সূত্র পাওয়া গেল না। সিদ্ধান্ত করা হইল, তিনি জলে ডুবিয়া কোথায় তলাইয়া গিয়াছেন। কী নিদারুণ সংবাদ। তারপর দুই-তিন দিন পরেই কোনো এক অজ্ঞাত স্থান হইতে দুই ছত্রে লেখা তাঁহার পোস্টকার্ড আসিল, বুঝা গেল তিনি জীবিত আছেন কিন্তু কোন ঠিকানা দেন নাই। চিঠিতে লিখিয়াছেন, তাঁহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া যেন অবিলম্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়। পরে লিখিয়াছেন, তাঁহার আর ফিরিবার সম্ভাবনা নাই, যে তাঁহার সামনে বসিয়া আছে, সে তাঁহাকে ফিরিতে দিবে না। এই মর্মে আরও দু-একটি পোস্টকার্ড আসিল, চিঠির বয়ান একই প্রকার। সুনীতিকুমার তখনই ভারতবর্ষের বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত, অনুসন্ধানের কোনো ত্রুটি রাখিলেন না, কিন্তু কোন হদিশ পাওয়া গেল না। কাহিনীর উপসংহার ভালো মনে নাই, বোধহয় বাংলার বাহিরে সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল। ডঃ সেন অতি মৃদুস্বরে এই গল্প বলিয়া গেলেন, শুনিয়া আমরা বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলাম। পৃথিবীতে কয়টা কেনর জবাব মিলে? এ কাহিনী ভৌতিক, না নিশিগ্রস্ত ব্যক্তির মনোবিকার প্রসূত হ্যালুসিনেশন? এইরূপ কত বিচিত্র গল্পই না তাঁহার কাছে শুনিয়াছি, যাহা যুক্তিব্যাখ্যার অতীত। পাণ্ডিত্যের খনি ডঃ সুকুমার সেনের নাম বিশেষজ্ঞমহলে সুপরিচিত। সে বিষয়ে আমাদের মতো ক্ষুদ্রব্যক্তির সার্টিফিকেট তাঁহার না হইলেও চলিবে। যদিও তাঁহার সঙ্গে আমাদের সব দিক দিয়াই পার্থক্য, তবু একদা তাঁহার পাণ্ডিত্যের বর্ম ভেদ করিয়া সহাস্য মানুষটিকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলাম তাহা সানন্দে স্বীকার করি।

একালে বাঙালীর জীবন-জাহ্নবীতে চড়া পড়িতে শুরু করিয়াছে, ভাঁটার টান দেখা দিয়াছে। কবে কত বৎসর পরে আবার জোয়ার আসিবে বলা শক্ত। এখনও যে আমাদের লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে দু-একটি আকবরি মোহর অবশিষ্ট আছে তাহাই একমাত্র সম্বল। ডঃ সেনের ন্যায় দু-একটি রত্ন অঙ্গুরীয় ভাঙাইয়া খ্যাতির বাজারে কিনিকিনি চালাইয়া যাইতেছি। তাহার পর কিং ভবিষ্যতি?

(ডঃ সুকুমার সেনের সংবর্ধনা উপলক্ষে লিখিত)

মোহিতলাল মজুমদার

১

১৯৪২ সালে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হইবার পর মোহিতলালের যাবতীয় কাব্যগ্রন্থ এবং সমালোচনা-সংক্রান্ত পুস্তকগুলি পড়িয়া ফেলিলাম। অবশ্য তাহার পূর্বেই বি. এ. ক্লাসে ছাত্রাবস্থায় আমার অগ্রজতুল্য এক মহদাশয় ব্যক্তির কথা মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল। তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন! যদি সাহিত্য সম্পর্কে মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাইতে চাও, তাহা হইলে মোহিতলাল পড়ো। মোহিতলালের সমালোচনা গ্রন্থ, আহার ও ঔষধ, দুই বিষয়েই লাগিবে। পরীক্ষাজলধি অক্লেশে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে, আবার তাহার সহিত ফাউ জুটিবে সাহিত্যবোধ ও শিল্প-বিশ্লেষণ শক্তি। তাঁহারই উপদেশে মোহিতলালের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিলাম, তাহার সহিত ম্যাথু-আর্নল্ড পড়া চলিতে লাগিল। প্রথমে হাতে আসিল 'সাহিত্যকথা'। পড়িয়া তাজ্জব বনিয়া গেলাম। এ গ্রন্থের অনেক কথাই বেশ দুষ্পাচ্য বোধ হইল, এবং যাহা বোধে ধরা দিল, তাহাও কেমন এক নূতন ধরনের কথা, ইতিপূর্বে যাহার স্বাদগন্ধ পাই নাই।

সংবাদ পাইলাম ঢাকা হইতে প্রকাশিত তাঁহার 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে'র দু-একখানি পুরাতন কপি তখনও বাজারে ছিল। কলিকাতায় মিলিল না, ঢাকা হইতে ডাকযোগে আনাইয়া লইলাম। এই গ্রন্থ হইতেই আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের আসমান-জমিনের যথার্থ পরিচয় পাইলাম। ক্রমে ক্রমে তাঁহার কাব্যগুলি সংগ্রহ করিলাম। পরে কলিকাতা হইতে তাঁহার 'বিচিত্র কথা' ও 'বিবিধ কথা' বাহির হইল। শেষে একদিন মরিয়া হইয়া তাঁহার ঢাকার রমনাস্থিত নীলক্ষেতের বাসার ঠিকানায় একখানি পত্র দিলাম, এবং দুরু দুরু বক্ষে তাহার উত্তর আশা করিতে লাগিলাম। বলাই বাহুল্য, সে চিঠিতে পৌগণ্ড-উত্তীর্ণ কাঁচা বয়সের ধূম্র-সলিল-মরুৎপূর্ণ আবেগের একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল, অচিরে তাঁহার একখানি পোস্টকার্ড পাইলাম। তিনি দূর হইতে এক পড়ুয়া ছাত্রের আবেগোত্তপ্ত চিঠি পাইয়া বোধ হয় মনে মনে হাসিয়াছিলেন। পত্রে জানাইলেন, বিদ্যাসাগর কলেজের কক্ষে সাহিত্য সেবক সমিতির সভায় তাঁহার যোগদানের সম্ভাবনা আছে। যথানির্দিষ্টদিনে হাজির হইলাম। ক্ষেত্রপাল দাসঘোষ (কে. ডি. ঘোষ), অধ্যাপক সুশীলকুমার দে এবং আরও অনেক কবি ও সাহিত্যিক সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেইদিন প্রথম মোহিতলালকে দর্শন করিলাম। বেশ কৃষ্ণবর্ণ, ছাঁটা বাটারফ্লাই গুম্ফ, ভারী ভরাট মুখ, একমাথা সুচিক্কণ কেশদাম। সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আসনে বসাইয়া দিলেন। কবিতা পাঠ ও ছোটখাট বক্তৃতার শেষে ঘোষিত হইল, কবি-সমালোচক মোহিতলাল গল্প পাঠ করিবেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের 'কঙ্কাল' গল্পটি স্রেফ পড়িয়া গেলেন। দুই শতেরও অধিক শ্রোতায় পূর্ণ সে সভাগৃহ নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দূরে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ট্রাম-বাসের কিঞ্চিৎ কলরব। রবিবার, সুতরাং কলেজে ছাত্রদের গুঞ্জনও বন্ধ। পড়া চলিল। কোথা দিয়া আধঘন্টা কাটিয়া গেল বুঝতে পারি নাই। গদ্য পাঠও যে এমন অপূর্ব রসরূপ ধরিতে পারে, গল্পও যে গীতিকবিতার মতো রমণীয় মনে হইতে পারে, তাহা সেদিন তাঁহার পাঠ হইতে বুঝিয়াছিলাম। তারপর তাঁহার নিজের কণ্ঠে এবং কলিকাতা বেতারে তাঁহার কত আবৃত্তি শুনিয়াছি। কিন্তু প্রথম দিনে সেই পাঠের

স্মৃতি এখনও মনে গাঁথা রহিয়াছে। সভান্তে নিজ পরিচয় দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি মিনিটখানেক আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর বলিলেন যে, আমাকে যেন স্কুলের ছাত্র বলিয়া মনে হইতেছে। ইহা নিন্দা কি প্রশংসা বুঝিতে পারিলাম না। দুই -চারি কথার পর যাহা বলিলেন তাহাও অল্প মারাত্মক নহে। বলিলেন যে, বি. এ. পাস করিয়া আমি যেন ঢাকায় এম. এ. পড়িতে যাই। কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপকগণ ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পূজ্যপাদ অধ্যাপক সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা একমাত্র তাঁহার মুখেই শোভা পাইত, অন্য কেহ তাঁহাদের সম্বন্ধে অপ্রিয় মন্তব্য করিলে আমিও তাহার ঝাঁঝালো জবাব দিতাম। কিন্তু তাঁহার নির্মম নীরস তিক্ত মন্তব্য মাথা নীচু করিয়া হজম করিলাম। তিনি ঢাকায় ফিরিয়া গেলে মাঝে মাঝে পত্রালাপ চলিতে লাগিল, আমি পাঁচখানি লিখিলে তিনি একখানিতে উত্তর দিতেন। পোস্টকার্ডের দুই পিঠে ঘেঁষাঘেঁষি পংক্তির কালো মুক্তার সারির মতো সাজানো লেখা। তারপর ভাগীরথী ও বুড়ীগঙ্গা দিয়া অনেক জল বহিয়া গেল --ঘোলা জল, কখনো রক্তে রাঙা। অবসর লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন। কিছুদিন বাগনানের কুলগাছিয়া, তারপর বেহালায় সখের বাজারের নিকট বাস করিয়াছিলেন। তখন কলিকাতা কলেজে চাকুরি লইয়া সাহিত্যের ছাত্রদের মস্তক যাঁতাকলে ফেলিয়া মহানন্দে চূর্ণ করিতেছি। ছুটি-ছাটার দিনে বাস যোগে সখের বাজারে পৌঁছাইয়া রিকশা ভাড়া করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় হাজিরা দিতাম। মাঝে মাঝে বন্ধুবর তারাচরণ বসু অন্যতম শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকিতেন এবং পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় দর্শন হইতে কোট করিয়া মোহিতলালের কবিতার কোন কোন পংক্তির সহিত সেই সমস্ত ভাবের সাদৃশ্য দেখাইতেন। তাহাতে তিনি যে বেশ খুশি হইতেন তাহা বুঝিতে পারিতাম। ক্রমে নানা আলোচনা, ধর্ম দর্শন সাহিত্যের নানা কথা জমিয়া উঠিত। আমরা মুগ্ধ ভক্তের ন্যায় বসিয়া থাকিতাম, তাঁহার সব কথাই একতরফা হইত। কথা কহিতে সাহসে কুলাইত না। সেই আশ্চর্য সুরেলা মৃদুকণ্ঠ, চোখে যেন স্বপ্নের অঞ্জন--তিনি বলিয়া চলিয়াছেন। বসওয়েলের মতো তাঁহার সমস্ত কথা লিখিয়া লইলে পরে এক ভীমকান্ত গবেষণাগ্রন্থ ফাঁদিতে পারিতাম। তন্ত্র সম্বন্ধে কথা উঠিলে তিনি যেন অন্য জগতে চলিয়া যাইতেন। বাঙালীর আর্যেতর সংস্কার বা অন্য কোন গূঢ় কারণে তাহার জীবনে তন্ত্রের ভুক্তিমুক্তি তত্ত্ব সঞ্জীবনী সুধার ন্যায় বড়োই কাজে লাগিয়াছে। দেশকালপরিব্যাপ্ত নারীশক্তির প্রবল আকর্ষণ চর্যাগীতি হইতে জয়দেব ও বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যদিয়া ভারতচন্দ্র পর্যন্ত— তারপর মাইকেল-রবীন্দ্রনাথে তাহার বিচিত্র প্রকাশ। একদিকে অন্তঃপুরচারিণী কল্যাণী জায়া ও জননী মূর্তি, আর একদিকে কামে-প্রেমে একাকার প্রেয়সী মূর্তির বিচিত্র আকর্ষণ-বিকর্ষণে পদার্থ-তত্ত্বের কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ শক্তির টানাপোড়েনে বাঙালীর সারস্বত প্রতিভার বয়নকার্য চলিয়াছে। আরও কত কথা বলিতেন, ভালো মনে নাই, তখনো সে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা ধারণ করিবার মতো আধার প্রস্তুত হয় নাই।

একদিন দ্বিপ্রহর, কী যেন তিনি আলোচনা করিতেছেন। মাঝে মাঝে ব্যঙ্গের তির্যক হাস্য। সেইদিন দৈনিক পত্রিকায় আমাদের 'সুবর্ণচন্দ্র' অ্যামব্যাসাডরের কীর্তিকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল । ইন্দ্রনাথের নতুন দাদার মতো এ-ধরনের জীব আজও ভারত সরকারের বৈদেশিক কেন্দ্র আলোকিত করিয়া শোভা পাইতেছেন । সেই সম্বন্ধে সরস আলোচনা চলিতেছিল। অ্যামবাসাডরকে 'অম্বাসোদর' সম্বোধন করিয়া তিনি বাঁকাভাবে হাসিতেছিল । ইতিমধ্যে গুটিকয়েক ছাত্র তাঁহার ঠিকানা সন্ধান করিয়া হাজির হইল, তাহারা হওড়া শহরের সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোন এক কলেজে অধ্যয়ন করে । তাহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, কলেজের সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠানে তাঁহাকে যাইতে হইবে । আমরা প্রমাদ গণিলাম । এইবার বজ্রাঘাত নামিবে, আর শিশুপাল বধ হইবে । এ-সব ব্যাপারে তিনি প্রবলভাবে চটিয়া গিয়া অগ্নিমূর্তি ধারণ করিতেন। কিন্তু সেদিন একটু আগে আমাদের এক পূজনীয় অধ্যাপকের গ্রন্থ তছনছ করিয়া একটু স্বস্তি বোধ করিতেছিলেন, মেজাজটাও বেশ প্রসন্ন হইয়া আসিতেছিল । হঠাৎ এই বিভ্রাট । কিন্তু তিনি রাগিয়া উঠিলেন না । তাহাদের মধ্যে যে ছেলেটি মাথায় অনেক উচ্চ, তাহার বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন । সত্যই বয়স অনুপাতে ছেলেটি বেশ দীর্ঘ, বাঙালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না । ছেলেটি লম্বা এবং কিছু শীর্ণ, এবং শীর্ণ বলিয়া তাহাকে বেশী দীর্ঘকায় মনে হয় । সে এত দীর্ঘ কেন, ফস করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন । আমরাও বিস্মিত হইলাম । বেচারা একেবারে নিভিয়া গিয়া দীর্ঘ দেহটা কোথায় লুকাইবে ভাবিয়া পাইল না। তারপর তিনি সক্ষোভে বলিলেন যে, প্রতি এক শ বৎসরে বাঙালীর শরীরের উচ্চতা গড়পড়তা এক ইঞ্চি করিয়া হ্রাস পাইতেছে । এই বিচিত্র পরিসাংখ্যিক হিসাব তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, জানি না । তিনি ঘোষণা করিলেন যে, কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই নৃতত্ত্বের হিসাবে বাঙালী জাতি বুশম্যান বা পিগমির মতো খর্বাকার হইয়া যাইবে । মেধার দিক হইতে তাহা অর্ধশতাব্দীর পূর্বেই শুরু হইয়া গিয়াছে । মাথার দিক দিয়াও সেই দুর্ঘটনা ঘটিতে যাইতেছে । 'বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ'— এই মোক্ষম শাস্ত্রবাক্য নাকি ফলিতে বিলম্ব নাই । ছাত্রগুলি কিছু চিন্তিতমুখে প্রস্থান করিল । আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম ; সেই প্রলয়কাণ্ড ঘটিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে । তাহার মধ্যে আমরা দারাপুত্রপরিবার লইয়া আপিস-আদালত সারিয়া তাম্বুলচর্বণ ও তাম্বাকু সেবনের অবকাশে মহাপ্রস্থানের পালা চুকাইয়া ফেলিব ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোহিলালের বক্তৃতা হইতেছে। প্রথম দিন কর্তৃপক্ষ লোকসমাগম স্বল্প হইবে অনুমান করিয়া সভায় কোন মাইকের ব্যবস্থা করেন নাই। ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় 'অমায়িক' বক্তার আর যন্ত্রের প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু প্রথম দিনেই শ্রোতার সংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে, দ্বারভাঙা হল ছাপাইয়া পাশের বারান্দাতেও লোক দাঁড়াইয়া রহিল। সে অপূর্ব আলোচনার বিষয়, ভঙ্গী ও বক্তার কণ্ঠস্বর অনেকের কর্ণেই পৌঁছাইল না। পরদিন হইতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাইকের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার সে বক্তৃতা গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছে, অনেকেই পড়িয়াছেন। কিন্তু সেই দিনের স্মৃতি আমার কাছে এখনও অম্লান হইয়া আছে। মোহিতলাল টেবিলের উপর পদ্মাসন করিয়া উপবিষ্ট, তা না হইলে অনেকে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইত না। কলেজ স্ট্রীট দিয়া ঘড়-ঘড়ায়িত ট্রামের অবিরাম আর্তনাদে বজ্রধ্বনিও সাইরেনবৎ হইয়া পড়ে। সুতরাং মোহিতলালের স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরও যে সে আর্তনাদে ডুবিয়া যাইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে।

দেখিলাম তাঁহার হাত পা ঈষৎ ফুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, মহাকাল নিশানা পাঠাইয়াছে। তারপর রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পাইয়া, মাইকেল মধুসূদন যে- আতুর আশ্রয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইখানে কবি মোহিতলাল চির নিদ্রাবৃত হইলেন। অচেতন অবস্থায় তাঁহার সহিত মাইকেলের কী বার্তালাপ হইত জানি না।

মোহিতলালের গ্রন্থ পড়িয়া যে-মানুষটিকে মনে পড়ে, তাঁহার কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করিলে যিনি চোখের সামনে উপস্থিত হন এবং তাঁহার সান্নিধ্যে বসিয়া বিচিত্র আলোচনা শুনিবার স্মৃতি জাগিলে তাঁহার যে-মূর্তি ভাসিয়া উঠে, তাহা একই ব্যক্তির বিচিত্র ব্যক্তিত্ব। সেই অতন্দ্র সারস্বত প্রেম, পাটোয়ারিবুদ্ধি সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের প্রতি হিব্রু প্রফেটদের ন্যায় 'holy rage'—যাহা একাধারে পবিত্রতা ও দহনজ্বালার সমন্বয়—সে সব আজ হারাইয়া

গিয়াছে। একালের 'নিও-ফিলিস্টাইন' ভ্রষ্টাচার বাঙালী—যাহাকিছু স্নিগ্ধ সুকুমার মনোহর, তাহাকেই যেন দুই পায়ে দলিয়া মুচড়াইয়া ক্লিন্ন পঙ্কোৎসবে মত্ত হইয়াছে। এখন সহজ নির্মম প্রত্যক্ষ সত্যকথা বলিবার এবং শুনিবার লোকসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। তাই মিল্টনকে সম্বোধন করিয়া ওয়ার্ডসওয়ার্থ যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহার সামান্য পরিবর্তন করিয়া কবি-সমালোচক মোহিতলালের উদ্দেশে বলি :

Mohitlal! thou shouldst be living at this hour,
Bengal hath need of thee.

২

মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের * সান্নিধ্যে এলে মনে হত, যেন এক বিশ্বচেতনার পাদপীঠে বসে আছি। তখন শুধু আমাদের শ্রোতার ভূমিকা, মোহিতলাল একাই বক্তা। কখনও ওষ্ঠে ব্যঙ্গবিদ্রূপের বক্রতা, কখনো অর্ধবিকশিত নয়নে স্বপ্নের অঞ্জন। কখনও স্নিগ্ধ সজল কণ্ঠে মেঘনাদবধ কাব্যের শেষ সর্গের শেষাংশের আবৃত্তি, কখনো-বা রবীন্দ্রনাথের 'ঝুলন' কবিতার তরঙ্গায়িত দোদুল্যমানতা। সেই মোহিতলালকে আমরা কি ভুলে গেছি?

ইতিহাসের পটোত্তোলন করলে মনে হবে, বিস্মরণীর স্রোতোধারা বাঙালী চেতনার অন্তস্তল দিয়ে বয়ে চলেছে। আজ যাঁকে স্মরণের মণিকোঠায় ভক্তি-অর্ঘ্যে অর্চনা করি, কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে তাঁকে অবহেলা ও অনাদরে ধূলিধূসর কুলুঙ্গিতে তুলে রাখি। .গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনার তীরে তীরে গড়ে উঠেছে সভ্যতা, রচিত হয়েছে দেবদেউল মসজিদ, লেখা হয়েছে কত না কাব্যকাহিনী। ভরা ভাদ্রের প্রবল স্রোত তটভূমিকে গ্রাস করে, ভাঙনের আঘাতে গ্রাম কোন্ অতলে তলিয়ে যায়, তার ঠিকঠিকানা থাকে না। তাই কবি সত্যেন্দ্রনাথের মতো বলতে ইচ্ছা করে, গম্-ধাতুই বাঙালীর প্রাণের ধাতু, কেবল চলাই তার জীবনধর্ম। কিছুই সে জমিয়ে রাখে না, দু'হাতে যতটা সঞ্চয় করে, তার সবটাই বিলিয়ে দেয়। তাই বোধহয় একালে মোহিতলালের স্মৃতি ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগেও তাঁকে দেখেছি। তখন স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল, হাত-পা ফুলতে আরম্ভ করেছিল, মৃত্যুর পারোয়ানা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু তখনও কণ্ঠে কত তীব্রতা, শুষ্ক নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সাহিত্যে যাঁরা মিথ্যাচারী, নাস্তিক, ফিলিস্টাইন—তাদের প্রতি দুর্বাসার অভিশাপের মতো তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল তীব্র ব্যঙ্গ। আবার অন্যদিকে দ্বিতীয় বিধাতার মতো তিনি রসস্রষ্টা ; কামনার পঞ্চপ্রদীপে যাঁর আরতি করেছেন সেই কল্পনাসুন্দরী তাঁকে বারবার হাতছানি দিয়ে নিয়ে গিয়েছেন রূপ-রস-গন্ধমাতাল বিশ্বভুবনের শ্যামলে-হরিতে-নীলিমায়, পৌঁছিয়ে দিয়েছেন রসতীর্থের ঘাটে ঘাটে।

মোহিতলাল কবি ও সমালোচক, রসস্রষ্টা ও রসপ্রমাতা। এই দুই বিপ্রতীপ মনোধর্ম তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল । অনেক কবিই যুগপৎ শিল্পী ও শিল্পবিচারক। বোধহয় কবিরা নিজেদের মনের মধ্যে দুটি সত্তা লালন করেন। একটি সত্তা রসানন্দ সৃষ্টি করে, আর

* মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) চব্বিশ পরগণার কাঁচরাপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম নন্দলাল মজুমদার, পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার বলাগড়। ১৯০৮ সালে বি. এ. পাস করেন, প্রথম জীবনে কিছুদিন স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। পরে ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে অবসর গ্রহণ করেন। রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান স্বীকৃত হয়েছে। সমালোচক মোহিতলালও সমভাবে বিদ্বজ্জনগোষ্ঠীতে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এক সময়ে 'কৃত্তিবাস ওঝা' ও 'সত্যসুন্দর দাস' নামে প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমালোচনা করতেন। তৃতীয় পর্যায় 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করে তার পৃষ্ঠায় নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশ করেন। কবিতার বলিষ্ঠ ভোগবাদ ও ক্ল্যাসিক-রোমান্টিকতার সংমিশ্রণ এবং প্রবন্ধে মৌলিক চিন্তায় বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যাবে।

একটি সত্তা সৃষ্টিকর্মকে দূর থেকে নিরীক্ষণ করে। একদিকে তিনি কবি, আর একদিকে তিনি পাঠক। পাঠক তাঁর কবিসত্তার গুণাগুণ বিচার করে। তখন তিনি মননধর্মী, বিশ্লেষণ তাঁর হাতিয়ার। যাঁর মধ্যে এই দুই সত্তার মিলন হয়, তাঁর মধ্যে কবি ও সমালোচক অবিরোধে বাস করতে পারে। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ, কোলরীজ, হাইনে, শেলী, আরনল্ড, এলিয়ট, পাউন্ড— তাঁরা একই সঙ্গে কবি ও সমালোচক। আমাদের দেশেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং একালের কোনো কোনো কবি (সুধীন্দ্র দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে) কল্পনার তুরঙ্গে সওয়ার হয়ে বিশ্বভুবন পরিক্রমণ করেন, আবার অতন্দ্র বুদ্ধির পাহারায় কল্পনাকে সংযত করে রাখেন। হয়তো কেউ কেউ প্রধানতঃ কবি, গৌণতঃ সমালোচক। কেউ-বা তার বিপরীত। মোহিতলাল কিন্তু একই সঙ্গে কবি ও সমালোচক, তাঁর দুই মানসিকতাই সমভারসহ। কিন্তু তাঁর কবিস্বরূপ সম্বন্ধে যতটা আলোচনা হয়েছে, সমালোচক-সত্তা সম্বন্ধে ততটা বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ—যাকে এ্যাকাডেমিক আলোচনা বলে, চোখে পড়ে না। এই প্রসঙ্গে বাংলা সমালোচনার বিবর্তন সম্বন্ধে দু' এক কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

বাংলা গদ্য যেদিন থেকে সাবালকত্ব অর্জন করল, সেই দিন থেকে সাহিত্যবিচারপদ্ধতিও ক্ষীণভাবে আবির্ভূত হল। মধ্যযুগে গদ্যের ব্যবহার ছিল না, তাই কাকে সাহিত্যবিচার বলে, কোন্ মানদণ্ডে কাব্যাদি বিশ্লেষণ করতে হবে, সে বিষয়ে সেকালে কারো মনে কোনো প্রশ্ন জাগেনি। মধ্যযুগের শেষকবি ভারতচন্দ্রের অলঙ্কারশাস্ত্র ঘাঁটা মন কিছুটা রসের স্বরূপ বুঝতে পেরেছিল—'যে হৌক সে হৌক ভাষা, কাব্য রস লয়ে।' ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র ও রসতত্ত্বের মতে রসই কাব্যের প্রাণ। 'রস', অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টি থেকে যে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক আনন্দ জন্মায়। উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু পূর্বে সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে অল্পস্বল্প সমালোচনা শুরু হলেও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্বে এ বিষয়ে কোনো বড়ো মাপের সমালোচনা চোখে পড়ে না। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২) এবং 'পদ্মিনী উপখ্যানে'র ভূমিকায় কাব্যের গুণাগুণ বিচারের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি কাব্য-নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত ছিলেন। সে কথা বোঝা যাবে তাঁর চিঠিপত্র থেকে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সমালোচনার পথ নির্মাণ করেন। অবশ্যই পাশ্চাত্য সাহিত্যবিচারপদ্ধতির নানা প্রকরণ তাঁর চিন্তাশক্তিকে সচেতন করেছিল। ম্যাথু আর্নল্‌ডের মতো তিনিও মধ্যভিক্টোরীয় নীতিবাদ ও শুচিতাবোধের মুঠিপেষণ এড়াতে পারেননি এবং সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না, বরং রস সম্বন্ধে আলঙ্কারিকদের অভিমত তাঁকে যথেষ্ট বিরস করে তুলেছিল। সে যাই হোক, তাঁর সাহিত্যবিচারপদ্ধতি পুরোপুরি ইংরেজির অনুগামী। আমাদের মনে হয়, পাশ্চাত্য সমালোচনা পদ্ধতি ও প্রাচীন ভারতীয় রসবাদের মধ্যে অহিনকুল সম্বন্ধ নেই, এ সত্যটি তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হলে বাংলা সমালোচনার প্রথম বুনিয়াদ অধিকতর দৃঢ় হতে পারত। সাহিত্যবিচারে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত যুক্তিমার্গ অবলম্বন করেছিলেন। অপর দিকে কবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচারেও একান্তভাবে ব্যক্তিগত। গীতিকবিদের যে স্বভাব তা তাঁর প্রায় সমস্ত গদ্য রচনাতেই লক্ষ্য করা যাবে। কল্পনা, আবেগ, সৌন্দর্যবোধ ও ঔপনিষদিক আনন্দতত্ত্বকে সমালোচনার কায়া ও কান্তিগঠনে প্রয়োগ—সাহিত্যবিচারে তাঁর প্রধান অবলম্বন। সংস্কৃত সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য প্রভৃতি আলোচনায় তিনি ব্যক্তিগত উপলব্ধির মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন। তাই সমালোচনা তাঁর কাছে জ্ঞানানন্দ নয়, রসানন্দ। একালের মতো মূল্য যাচাই করা নয়; কারণ 'সাহিত্য এখন হাটের জিনিস।' তাই তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত, 'যথার্থ সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারি পুরোহিত।' এক সময়ে যাকে Creative criticism বলা হত, অর্থাৎ

সৃজনশীল রসসাহিত্যের মতো সমালোচনাকেও নিছক বুদ্ধিগ্রাহ্য না করে হৃদয়সংবাদী ও মনোহারী করার দিকে তাঁর ছিল স্বাভাবিক প্রবণতা। প্রথম যৌবনে তিনি শুরু করেছিলেন সৌন্দর্যতত্ত্ব দিয়ে, অর্থাৎ সৌন্দর্যসৃষ্টি সাহিত্যের মূল কথা। পরে তাঁর প্রথম যৌবনের সৌন্দর্যতত্ত্ব উত্তর-যৌবনে আনন্দতত্ত্বে পরিণতি লাভ করল, যে আনন্দতত্ত্ব তিনি উপনিষদের রসতত্ত্ব থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর উত্তর-জীবনে আবির্ভূত নব্য কবির দল, সেই সব *avant-garde*— যাঁরা প্রগতি, কল্লোল, কালি কলম, সংহতিতে আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন, তাঁরা পুরোপুরি ইংরেজি-ফরাসি-জার্মান সমালোচনা পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। মার্কস্, ফ্রয়েড, এ্যাডলার, য়ুং তাঁদের যাত্রাপথে আলো ধরলেন, 'শিকাগো ক্রিটিকস্' থেকে কডওয়েল পর্যন্ত সমালোচনার বিচিত্র পথে তাঁরা সাহিত্যসমালোচনাকে নামিয়ে আনলেন। ক্রমে আলোচনায় মননের স্থানে জেঁকে বসল যান্ত্রিকতা। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বোঝা গেল, যন্ত্র যন্ত্রই, তা চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে না। মানুষই যন্ত্র বানায়, দরকার হলে সে যন্ত্র ভেঙেও ফেলে। যান্ত্রিক বিচারপদ্ধতি মানুষকে গ্রাস করলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমষ্টির যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হবে। তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বেই প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন রসানন্দকে সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি ধরেছেন তেমনি এ্যাকাডেমিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমালোচকেরা বাংলা সমালোচনা রীতির আর একটি দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। কেউ কেউ প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের ধ্বনি, রস, বক্রোক্তি, ঔচিত্য প্রভৃতি তত্ত্বের আধারে বাংলা সমালোচনাকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করলেন এবং ভরত আনন্দবর্ধন অভিনবগুপ্ত মম্মট ভট্ট থেকে জগন্নাথ পর্যন্ত সংস্কৃত কাব্যবিচারপ্রণালীকে বাংলা সাহিত্যবিচারে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত করলেন ; অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত প্রভৃতি নব্য 'অভিনবগুপ্তেরা' পুরাতন ধ্বনিবাদ রসবাদের মাপকাঠি মেপে মেপে বাংলা সাহিত্যবিচারে প্রবৃত্ত হলেন। অপরদিকে, যাঁরা পাশ্চাত্যপন্থী, তাঁরা এ্যারিস্টটল থেকে টলস্টয় ক্রোচে রিচার্ডস এলিয়ট এজরা পাউন্ড প্রচারিত সাহিত্যবিচার প্রণালীকে একমাত্র শিষ্ট রীতি বলে গ্রহণ করলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের কৃতবিদ্য অধ্যাপক। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ছাত্র ও শিষ্যেরা। তাঁদের পূর্বে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শশাঙ্কমোহন সেন বাংলা সাহিত্য বিশ্লেষণেও বিদেশের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি এঁদের মমতা ছিল, কিন্তু অধিকতর শ্রদ্ধা ছিল ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি। তাঁরা চেষ্টা করলে বাংলা সাহিত্যের উপযোগী theory of literature গড়ে তুলতে পারতেন, যে-কাজ তাঁদের অনেক পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন। কলকাতায় Anglophil ও Orientalist-দের যে দ্বন্দ্ব উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে আরম্ভ হয়েছিল ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য-সমালোচনাতেও তার প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। এখন সংস্কৃত রসবিচার ও অলঙ্কার শাস্ত্র সংস্কৃত পড়ুয়ারা ছাড়া আর কেউ তা নিয়ে আলোচনা করেন না। সাহিত্যসমালোচনা, ভাষাবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান নিয়ে যে সমস্ত গবেষণা হচ্ছে, তার বারো আনা অংশ পাশ্চাত্য রীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে রামমোহন, হিন্দু কলেজের ছাত্রসমাজ, বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা ও চিন্তায় বুদ্ধির যে জয়ধ্বনি শোনা গিয়েছিল, তার মূলে ছিল সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি ও ধর্মতত্ত্বের নতুনভাবে পর্যালোচনার প্রয়াস । রামমোহন থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ- কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত ধর্মীয় অনুভাবনা নাগরিক কলকাতাকে বিচঞ্চল করে তুলেছিল । হিন্দু কলেজের ডিরোজিও-পন্থী 'ইয়ং-বেঙ্গল' যুবজন এ-সব ধর্মকর্মকে কুসংস্কার বলে পরিত্যাগ করেছিলেন, এই কালাপাহাড়ি যুবকদের হিন্দুধর্ম বিরোধিতায়

কলকাতায় উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। অবশ্য ইয়ং-বেঙ্গলদের "সংশপ্তক" হুংকার ক্রমেই উগ্রতা হারাল। কেউ পুরাতন বিশ্বাসে ফিরে গেলেন, ঘটা করে হিন্দুয়ানির চূড়ান্ত করে ছাড়লেন (যেমন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়)। এর কারণ, তাঁরা জাতির মূল আশ্রয় পরিত্যাগ করে বায়ুজীবী অর্কিডে পরিণত হয়েছিলেন। অপরদিকে ত্রিধাবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজ (আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ) ক্রমেই হীনবল হয়ে পড়ল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিমনস্ক পৌরাণিক মতবাদ সেই শূন্যস্থান পূরণে অগ্রসর হল, যার শেষ ফলশ্রুতি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমন্বয়মূলক হিন্দুধর্ম। অবশ্য কেউ কেউ বলে থাকেন (কাজী আবদুল ওদুদ, সুশোভন সরকার), রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ-প্রভাবিত মুক্ত বুদ্ধি ক্রমেই হিন্দু রক্ষণশীলতার কুক্ষিগত হল এবং নব্য পৌরাণিক হিন্দুসমাজ প্রবল হয়ে উঠল, তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা বাঙালীব উজ্জাগর নব্য মানসিকতাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখল। তাই এঁরা উনিশ শতকের শেষার্ধের বাঙালীর নবজাগরণকে, রক্ষণশীল হিন্দুমানসিকতার পুনর্জাগরণ বলে মনে করেন। এ-ধরনের অভিমতের গুহ্য কারণ— এই নবজাগরণে, যে-কোনো কারণেই হোক, মুসলমান সমাজ যোগদান করেননি। ফলে বাঙালীর রাষ্ট্রসাধনা, শিক্ষা ও সমাজপ্রগতি, ধর্মান্দোলন, সাহিত্যসৃষ্টিতে হিন্দু-মানসিকতার সঞ্চার হয়েছে। তার জন্য বিধাতা ছাড়া কাকেই বা দোষ দেব ? এ-সমস্ত সমাজ ও ইতিহাস-সংক্রান্ত তত্ত্বকথা ছেড়ে দিলে দেখা যাবে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই শতাব্দীর তিন-চার দশক পর্যন্ত বাঙালির মনন অসাধারণ দীপ্তি ধারণ করেছে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং আমাদের কালের মোহিতলাল মজুমদার মননের বিচিত্র ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এখনও মোহিতলালের সমালোচক সত্তার সম্যক আলোচনা হয়নি। যাও-বা হয়েছে, তাতে বাম হস্তের দাক্ষিণ্যের দান লক্ষ্য করে বিষণ্ণ হতে হয়। তাঁর সাহিত্যবিচার-বিশ্লেষণ শুধু সাহিত্যঘটিত রসবিচার নয়, তাতে আধুনিক বাঙালির সামগ্রিক চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী সংস্কৃতির মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মোহিতলাল সেই ঐতিহ্যের শিকড় সন্ধান করেছেন। বাঙালীর বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সংস্কার, মধ্যযুগীয় কুলাচার, শৈব নাথ সম্প্রদায়, বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা, সুফী, বাউল, দরবেশ ও লোকযানের মধ্যে সংগুপ্ত বাঙালীর অব্রাহ্মণ্য প্রত্ন-ইতিহাস ; পরিশেষে পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা ও সাহিত্যের প্লাবনে এ-জাতির নতুন জীবনায়ন। মোহিতলাল সাহিত্যসংক্রান্ত, সমাজ-সংস্কৃতিগত আলোচনা এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে বাঙালীর সেই মূল চরিত্রের সন্ধান করেছেন। তাঁর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্যকথা', 'সাহিত্যবিতান', 'বিবিধকথা', 'বিচিত্রকথা', মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-বিহারিলাল-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র বিষয়ে সূচীমুখ আলোচনা, বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্যাদর্শ ও চিন্তায় সাহিত্য ও শিল্পের মৌলিক প্রশ্ন ও তার উত্তরের আলোচনা নিশ্চয় আছে। তার সঙ্গে আছে বাঙালি চেতনার জীয়নকাঠি আবিষ্কারের ঐকান্তিক চেষ্টা। তাই তাঁর এই সমস্ত গ্রন্থগুলিকে নিছক সাহিত্য-সমালোচনা বলে তুচ্ছ করা যায় না, তার মধ্যে এদেশের সমগ্র চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। একালের দুর্মেধা পাঠককুল এবং 'দিলেতন্ত' সমালোচকবর্গ তাঁকে স্বল্পপ্রশংসায় আড়াল করে রেখেছেন। কিন্তু কে না জানে, অল্প প্রশংসা নিন্দারই ছদ্মবেশ। পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যা শুরু করেছিলেন, সেই তত্ত্বের আলোকে মোহিতলাল উনিশ শতকের বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের রচনা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর অসাধারণ মৌলিকতা, প্রকাশের ঋজুতা এবং গভীর চিন্তা রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের পর আর কার মধ্যেই বা এত অজস্র পরিমাণে ধরা পড়েছে ?

তাঁর ভাষা-ভঙ্গিমা সম্বন্ধে দু-এক কথা বলি । কারণ একালে কেউ কেউ বলেন, তাঁর গদ্যরীতি একটু গুরুভার, বাক্যগঠন দীর্ঘায়ত । ফলে সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা যথাস্থানে পৌঁছাতে বিলম্ব হয়ে যায় । শশাঙ্কমোহন সেন এবং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তার ক্ষেত্রে অনন্য, সিদ্ধান্তে নৈয়ায়িক । উভয়েই ইংরেজি সাহিত্য মন্থন করে বাংলা-ভাষায় তার অমৃতভাণ্ড উপহার দিয়েছেন । কিন্তু ইংরেজিগন্ধী কৃত্রিম ভাষারীতির জন্য তাঁরা পাঠকের হৃদয়-দুয়ার পুরোপুরি খুলতে পারেননি। মোহিতলালের বাণীগ্রন্থনা তাঁর চিন্তার মতো ঋজু কঠিন, কোনো দিকে হেলে না, বাঁকে না । এই ক্লাসিক গদ্যরীতি একালের দুর্বল-মস্তিষ্ক বাঙালির কাছে বিভীষিকা বলে মনে হতে পারে । টপ্‌পা-ঠুংরীর চালে অভ্যস্ত সৌখিন পাঠক ধ্রুপদ-ধামারের বোলে স্বতই বিমূঢ় হয়ে পড়বেন । যে-ভাষারীতি বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথে পূর্ণতা লাভ করেছে সে রীতি বোধহয় একালে আর অনুশীলিত হবে না । একালে লেখার গদ্য সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো । যেখানে বানান নিয়ে ‘ধুন্ধুমার’ চলেছে, এখনও পর্যন্ত বাংলা বানান দুরস্ত হল না, ব্যাকরণ ক্রমে বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে, সেখানে এ ভাষা পরম্পরাগত রীতি অনুসরণ করছে কিনা কে তার বিচার করবে ?

মোহিতলালের চিন্তাপ্রণালী এবং সাহিত্যবিচারের প্রকৃতি ও প্রবণতা একালের পাঠকের রুচিকর হবে কি ? কিন্তু কেউ যদি একটু মনোযোগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর প্রবন্ধ পড়েন, তা হলে তা থেকেই মোহিতলালের মন ও মেজাজের পরিচয় পাবেন । বাংলা সাহিত্যই বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ । তার রাজনীতি, সামাজিক আদর্শ, চিন্তাপ্রণালী, ধর্ম-উপধর্মসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত সহস্রবার পরিবর্তন হবে, কিন্তু দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্য বাঙালিকে বর্মের মতো রক্ষা করবে, সেই বর্মটির স্বরূপ বিশ্লেষণ তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধেই লক্ষ্য করা যাবে। তাঁর কাছে জীবন ও সাহিত্য এক হয়ে গিয়েছিল । সেই সাহিত্য নিয়ে কেউ ছেলেখেলা করলে বা দল ও মতের দাসত্ব করলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়তেন । তখন রসনা হত ক্ষুরধার, রচনা হত শাণিত কৃপাণ । ফলে অচিরে বন্ধুরা বক্র হতেন, কেউ শত্রু হয়ে পড়তেন, শিষ্যেরা একটু দূরে দূরে অবস্থান করতেন । বাঙালী ঐতিহ্যের ক্রমিক অধঃপতন দেখে দুঃখ থেকে তাঁর ক্রোধের উৎপত্তি হত—যে-ক্রোধ তামসিক নয়, পরম সাত্ত্বিক । তাঁর সেই বিচিত্র মানসিকতার পরিচয় প্রবন্ধগুলিতে লক্ষ্য করা যাবে ।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় তেইশ বৎসর পূর্বে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনান্ত হয় ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭০। জন্ম হইয়াছিল ১৮৯২ সালে (১৫ অক্টোবর)। আজ বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইত। আদর্শ শিক্ষক ও ক্ষুরধার বুদ্ধির সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও তাঁহার অসংখ্য ছাত্রমণ্ডলী ও গুণগ্রাহী ভক্তদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় মহিমা লইয়া বিরাজ করিতেছেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার জাতিস্মর প্রতিভার বিস্ময়কর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল, যাহা তাঁহার অধ্যয়নজীবনে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত আছে।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য আমাদের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নহে, ইহা আমাদের মাতৃভাষা নহে, বরং ধাত্রীভাষা বলা চলিতে পারে। তাহাও বলা চলে কিনা তর্কসাপেক্ষ। লালন-পালন, শিশুর শ্রীবৃদ্ধি সাধন ধাত্রীর কাজ। অবশ্য ধাত্রী জানে, এ শিশু তাহার নহে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শিশুও জানিবে, এই রমণীটি জননী নহে। দায়ে পড়িয়া আমরা ইংরেজি শিখিয়াছি। কিন্তু চাকুরি, খেতাব ও খেলাতের স্বর্ণমৃগ আমাদের মাতৃক্রোড় হইতে দূরে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বুঝিয়াছিলাম, এ স্বর্ণমৃগ বস্তুত নিখাদ সোনায় নির্মিত নহে। এ 'কেমিক্যাল গোল্ড্'। অচিরে আমাদের স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছিল। তবে তাহাতেই আমাদের কাজকারবার ভালোই চলিয়াছিল। এমন কি ইংরেজি ভাষায় কিছু কিছু সাহিত্য কর্ম করিয়া আমরা ইংরাজের কিছু প্রশংসাও লাভ করিয়াছিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন ইংরেজি ভাষা যেন সিংহচর্মাবৃত গর্দভে পরিণত না হয়। তাহা হইলে ডাক ডাকিলেই ধরা পড়িবে। অর্থাৎ বাঙালি ইংরেজি ভাষায় যতই কৃতবিদ্য হউক না কেন খাঁটি ইংরেজের মতো লিখিতে পারিবে না। মধুসূদন ভূদেবকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সর্ববিষয়ে ইংরেজি অভ্যাস করিলে (এমন কি স্বপ্ন দেখাও!) তবে এই বিজাতীয় ভাষা জাতীয় পোষাকে মানাইবে। অবশ্য অনেক বাঙালি লেখক সেকালে বিশুদ্ধ ইংরেজি লিখিতে পারিতেন, একালেও অনেক বিখ্যাত ভারতীয়ের নাম করিতে পারি যাঁহারা ইংরেজিতে কাব্য লিখিয়াছেন, গল্প-উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, নাটক ফাঁদিয়াছেন, এবং মননঋদ্ধ প্রবন্ধও লিখিয়াছেন। সেকালে কিশোরী তরু দত্ত ফরাসি ও ইংরেজি কবিতা লিখিয়া পাশ্চাত্য সমালোচকের প্রশংসা পাইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরাও ইংরেজিতে কবিতা লিখিয়া (যথা কাশীপ্রসাদ ঘোষ, স্বয়ং মধুসূদন) বাঙালি সমাজে বিস্তর প্রশংসা কুড়াইয়াছিলেন। একালে তো ভারতীয় লেখক-লেখিকা ইংরেজিতে বৃহদাকার উপন্যাস লিখিয়া ও-দেশেও সরস্বতীকে ভাঙাইয়া লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করিতেছেন। সুতরাং ভারতীয়েরা চেষ্টা করিলে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ইংরেজের মতো কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে। সেকালে ইংরাজ শিক্ষক বলিতেন, বাঙালিকে ভালো করিয়া ইংরেজি শিখাইতে হইলে তাহাকে ইংলণ্ডে আনিতে হইবে, আর তাহা না হইলে ইংলণ্ডকেই বাংলায় লইয়া যাইতে হইবে। প্রথমটি হয়তো সম্ভব, কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য পবনপুত্রকে স্মরণ করিতে হইবে। কিন্তু এ সব জল্পনার কথা থাক।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরীক্ষায় জয়মুকুট শিরে ধারণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এম. এ. পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইবার পূর্বেই তিনি কলিকাতার কলেজে ইংরেজির কনিষ্ঠ অধ্যাপক হইয়া বসিলেন। তখনই তাঁহার ইংরেজি বিদ্যার এমন খ্যাতি কলিকাতায়

বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ জেমস্‌ সাহেব তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "Look here Srikumar, others desire before they deserve. You deserve but don't desire". সাহেবের কথাটি অতি সত্য, চাকুরি তাঁহাকে তাড়া করিয়া ফিরিত। সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক রূপে তাঁহার খ্যাতি এখনও অম্লান হইয়া আছে। তাঁহার গবেষণা গ্রন্থ ("Critical Theories and Poetic Practice in the Lyrical Ballads") বিলাতে পণ্ডিত ও সমালোচক হারফোর্ড ও এ্যান্টজ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন— "A mind bent on pursuing the subtliest filaments of its own thinking"– ইংরেজিতে রচিত তাঁহার আরো কয়েকখানি গ্রন্থে এই চিন্তার সূক্ষ্মতা ও বিশ্লেষণের দক্ষতা তাঁহাকে ইংরেজি-জানা মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, জাঁদরেল ব্রিটিশ সমালোচকগণ ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে এত ভূরি পরিমাণ আলোচনা করিয়াছেন যে, ইংরেজি যাঁহার মাতৃভাষা নহে, তাঁহার পক্ষে তদধিক কিছু প্রকাশ করা দুঃসাহসের বিষয়। সেই দুঃসাহস দেখাইয়া শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র ও অধ্যাপকমহলে স্থায়ী কীর্তি লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ছাত্র ছিলাম না, সুতরাং তাঁহার ইংরেজি অধ্যাপনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারিব না। তবে স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার ন্যায় রসপ্রমাতা ও বিশ্লেষক এদেশে বড়ো একটা পাওয়া যায় না। সাহিত্যকে রসের দিক হইতে ততটা না দেখিয়া তাহার তত্ত্ব ও তাৎপর্য, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই তাঁহার অধিকতর কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার ভাষাভঙ্গিমা একটু গুরুভার, কিছু অলঙ্কৃত, উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষায় অতিশয় ঐশ্বর্যবান। আমরা আড়ালে বলিতাম, এ-যুগে বাণভট্ট জন্মাইলে কতকটা শ্রীকুমারীয় বাগরীতি অবলম্বন করিতেন। একটি বিশেষ্য, তাহার সহিত গাঁটছড়া-বাঁধা অনেকগুলি বিশেষণ, অদ্ভুত চিত্রকল্প, তুলনা,— সব যেন তাঁহার নখাগ্রে থাকিত। কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হইত না। ইঙ্গিতমাত্রেই তাহারা সারি দিয়া দাঁড়াইত। রাজা যেমন অগ্রপশ্চাতে বরকন্দাজ লইয়া চলেন, তেমনি তাঁহার লেখনীতে বিশেষ্য-মহারাজের আগে পিছে অনেকগুলি বিশেষণ-বরকন্দাজ জরির পোষাকে ঝলমল করিতে করিতে রাজাকে অনুসরণ করিত। কিন্তু তাঁহার ইংরেজি পাণ্ডিত্য লইয়া কিছু বলিব না, কারণ সে বিষয়ে মাদৃশজনের কিছুমাত্র অধিকার নাই। শুধু ইংরেজি বিদ্যাই যদি তাঁহার একমাত্র সম্বল হইত তাহা হইলে এত কথা বলিবার আবশ্যক হইত না। ইংরেজি পড়ুয়ারা শুধু তাঁহাকে স্মরণে রাখিত। কিন্তু যেদিন তাঁহার সারস্বত তরণী "Albion's distant shore" ত্যাগ করিয়া গঙ্গার তীরে ভিড়িল সেই দিনটি বাংলা সাহিত্যের পক্ষে একটি পরমপ্রার্থিত শুভযোগ। ইংরেজি সাহিত্য পাঠে যাঁহার রুচি প্রস্তুত হইয়াছে, ইংরেজি ভাষার মারফতে যিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যকে করতলগত করিয়াছেন, তিনিই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যথার্থ রসাস্বাদন করিতে পারেন। ইংরেজি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও রচনাকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার মনে শ্বেতভুজা ভারত-ভারতীর আহ্বান ধ্বনিত হইতেছিল। ইংরেজিতে দিগ্‌গজ হইলেও তাহাতে কি পুরা তৃষ্ণা মিটে? প্রয়োজন পড়িলে অথবা সখ করিয়া কিছুদিন পেলিটি-উইলসনের হোটেলে বিদেশী 'পরমান্ন' ভোজন চলিতে পারে, কিন্তু চিরদিন চলে না। মায়ের হাতে প্রস্তুত পায়েস-পিষ্টক কি কেক-প্যাসট্রির অপেক্ষা অধিকতর সুস্বাদু মনে হয় না? অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি পড়াইতে পড়াইতে কিছু কিছু বাংলা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কলেজপত্রিকা, নব্যভারত, বঙ্গবাণী, উদয়ন প্রভৃতি পত্রে বিধিবদ্ধ ভাবে বাংলা উপন্যাসের এ্যাকাডেমিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেই প্রবন্ধগুলিকে

মাজিয়া ঘষিয়া, একের সঙ্গে অপরকে সংযুক্ত করিয়া প্রকাশ করিলেন 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইল । ১৩৩০ সাল হইতে নানা পত্র-পত্রিকায় বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে তাঁহার প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে, পর পর প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে প্রবন্ধগুলির গ্রন্থাকারে আবির্ভাব। প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত ও সাহিত্যানুরাগী-মহলে সাড়া পড়িয়া গেল— নানা কারণে । প্রথম কারণ, ইংরেজির একজন জাঁদরেল অধ্যাপক এতটা পরিশ্রম করিয়া, এতটা শ্রদ্ধা লইয়া বাংলা উপন্যাসের বিবর্তন সম্পর্কে এত বড়ো একখানি গ্রন্থ লিখিতে পারেন তাহা যেন অবিশ্বাস্য মনে হইয়াছিল। যিনি স্কট-ডিকেন্স-থ্যাকারে, জর্জ ইলিয়ট, টমাস হার্ডি, গলস্‌ওয়ার্দি পড়িয়া রুচিবোধ মার্জিত করিয়াছেন তিনি বাংলা উপন্যাস লইয়া এতটা মাতামাতি করিলেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিলে পশ্চিমের উপন্যাসের পার্শ্বে বাংলা উপন্যাসকে কি অত্যন্ত ম্লান মনে হইবে না? তাহা হইতে পারে, তবু যাহাতে বাঙালির সমগ্র জীবন প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাকে কি অনাদরে ফেলিয়া দেওয়া যায়? তাই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত ইংরেজী সাহিত্যের আলোকে বাংলা উপন্যাস বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার পূর্বে বাঙালি পাঠক উপন্যাস ভালোবাসিলেও ইহার ধরণধারণ সম্বন্ধে অবহিত ছিল না। উপন্যাসের কলারূপ বিশ্লেষণে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন। বাংলা উপন্যাসের কতই বা বয়স? প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলালকে আমরা প্রথম উপন্যাস বলি বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলার পূর্বে যথার্থ বাংলা উপন্যাস রচিত হয় নাই। অর্থাৎ যাহার বয়স দেড়শ বৎসর পুরা হয় নাই তাহাকে লইয়া এতটা বাড়বাড়ি করা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে এই ৮২৫ পৃষ্ঠার রয়াল সাইজের বিশাল গ্রন্থটি পড়িয়া ফেলা প্রয়োজন। এ যুগে সে বড় কঠিন কাজ। বস্তুতঃ তিনিই প্রথম উপন্যাস বিচারের রীতিপদ্ধতি প্রস্তুত করিলেন, সারা ভারতীয় সাহিত্যেও অর্ধ শতাব্দী পূর্বে উপন্যাস বিচারের কোনো বাঁধা পথ প্রস্তুত হয় নাই।

এখন বাংলা সমালোচনা সাহিত্য সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, ইংরেজি সাহিত্য হইতেই বাংলা সমালোচনার জন্ম হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু পূর্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলা সমালোচনার জাতকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে রং ধরাইয়াছেন, তাঁহারও প্রধান অবলম্বন ছিল ইংরেজি সাহিত্য। সেই আদর্শে - 'high seriousness'-এর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ম্যাথু আর্নলডীয় ভঙ্গীতে তিনি বাংলা সমালোচনার এ্যাকাডেমিক রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব তিনি অভিনব গুপ্ত, আনন্দবর্ধন, মম্মটভট্ট পড়েন নাই, রসতত্ত্বও ধৈর্যের সঙ্গে বুঝিতে চাহেন নাই এবং সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রীদের পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহার সমালোচনাকে একপায়ে ভর দিয়া চলিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এ্যাকাডেমিক খাঁচা হইতে বাংলা সমালোচনাকে উদ্ধার করিয়া রস ও সৌন্দর্যের আকাশে মুক্তি দিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত ঔপনিষদিক আনন্দতত্ত্বে আসিয়া বিরাম লাভ করিয়াছেন। যুক্তির দিক হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বীকার করিতেই হইবে। বাঙালির মন সাহিত্য প্রসঙ্গে প্রায়শই এলাইয়া পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার ব্যতিক্রম। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বিচারপদ্ধতি অবগত ছিলেন না বলিয়া বাংলা সমালোচনার পুরা রূপ দিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ আপন মনের বাতায়নে বসিয়া সাহিত্যের রসভোগ করিয়াছেন, বিচার-বিশ্লেষণের প্রতি ততটা গুরুত্ব দেন নাই। তাই তাঁহার সমালোচনাকে বরং রসালোচনা বলা চলিতে পারে। আবেগ তাঁহার মনের দিশারী হইয়াছিল বলিয়া অনেক সময়ে তিনি বলিবার ঝোঁকে কূল ছাড়িয়া বার-দরিয়ায় ভাসিয়া গিয়াছেন। তবু তিনি সাহিত্যের প্রাণ-

ভোমরাকে মনের কৌটায় পুরিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুগত নিরেট তথ্যকে ত্যাগ করিয়া তিনি আত্মগত স্বগতভাষণে তৃপ্তি বোধ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে সমালোচনা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে ঠিক এ্যাকাডেমিক তত্ত্বদৃষ্টি ততটা প্রাধান্য পায় নাই। তাহা যেন সুখের জন্য আলোচনা, আনন্দের জন্য সাহিত্যব্যাখ্যা।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা সমালোচনায় যথার্থ তাত্ত্বিক আলোচনা আরম্ভ হইল। একদিকে অলঙ্কার শাস্ত্র, আর একদিকে ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্য। অতুল গুপ্ত মহাশয়ের 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' নামে চটি বহিখানি সর্বপ্রথম ইংরেজি সাহিত্যরসিক সমাজে নূতন বিস্ময় সৃষ্টি করিল। তাহা ব্যঞ্জনা-শক্তি, যাহার পরিণাম রসবাদ। পরে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুশীলকুমার দে (ইংরেজিতে রচিত) এবং সুধীরকুমার দাশগুপ্ত সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া সাহিত্য বিচারের ভারতীয় পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। ধ্বনি-ব্যঞ্জনা, রস, ঔচিত্য প্রভৃতি অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে সাহিত্যবিচার কতটা সম্ভব, সর্বোপরি কতটা আধুনিক, তাহা লইয়া কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিলেন। আধুনিক সাহিত্য কি ভরত,. আনন্দবর্ধন, অভিনব গুপ্ত, জগন্নাথের উত্তরীয় প্রান্ত ধরিয়া চলিতে চাহিবে? দ্রুতিকাব্য, দীপ্তিকাব্য, চিত্রকাব্য, বক্রোক্তি, ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর রসবাদ—এই সমস্ত অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত তত্ত্ব একালের সাহিত্যবিচারে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নহে। বরং যে পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বে আমাদের রুচি তৈয়ারি হইয়াছে তাহার দ্বারাই একালের সাহিত্য মাপিয়া জুখিয়া দেখিতে হইবে। সাহিত্য ও সৌন্দর্যতত্ত্ব লইয়া রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু সে তত্ত্ববাদ তাঁহার মনের রঙে রঙিন হইয়া নূতন রসরূপ লাভ করিয়াছে। সাধনা পত্রে প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন, যাঁহারা লেখেন এবং যাঁহারা পড়েন, সাহিত্য কী এবং কেন, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। তাই সাহিত্যতত্ত্ব বা Theory of Poetry সম্বন্ধে তিনি গুটিকতক প্রবন্ধ লিখিলেন, যাহাতে সাহিত্যতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্ব মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

পরবর্তীকালে দুই শ্রেণীর এ্যাকাডেমিক সমালোচকের আবির্ভাব হইলেন, যাঁহারা পুরাতন অলঙ্কার শাস্ত্রের দোহাই পাড়িয়া তাহার দ্বারা আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহাদের কথা পূর্বে বলিয়াছি। আর একদল সমালোচক য়ুরোপীয় সমালোচনার রীতি গ্রহণ করিয়া সাহিত্যবিচারের আধুনিক পন্থা অনুসরণ করিলেন-- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। মোহিতলাল কাব্যতত্ত্বকে পাশ্চাত্য আদর্শে ঢালিয়া সাজিয়া লিখিলেন 'সাহিত্য কথা'। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ও 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষায়' সেই রীতিরই অনুসরণ করিলেন, তাঁহার সুযোগ্য ছাত্র সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত গুরুর পন্থাই অনুসরণ করিলেন, যদিও উত্তরকালে 'ধ্বন্যালোক' অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের দুইজন বৃত্তিতে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, অপর জন বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হইলেও ইংরেজি সাহিত্যের রসেই বুঁদ হইয়া থাকিতেন। প্রথম দুই জন পুরোপুরি এ্যাকাডেমিক সাহিত্যতত্ত্বে নিষ্ণাত, অপর জন এ্যাকাডেমিক তত্ত্বে কিছু খোলা হাওয়া প্রবাহিত করিয়াছেন। অবশ্য পরবর্তীকালে টি. এস. এলিয়ট ও এজরা পাউণ্ডের মতো কয়েকজন নবীন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে সে খোলা দরজা আর একটু খুলিয়া দিলেন, এ্যাকাডেমিক ধ্রুপদ খেয়ালের বদলে তাঁহারা টপ্পা ও টপ্-খেয়াল ধরিলেন। তাঁহাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির বকযন্ত্রে চোলাই করিয়া সমালোচনা সাহিত্যকে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সহোদর প্রতিম করিয়া তুলিলেন। এই প্রসঙ্গে আরো দুইজনের কথা বলা কর্তব্য। শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও প্রমথনাথ বিশী—দুইজনে ভিন্ন গোত্রের মানুষ। শশিভূষণ

সর্বোপরি তাত্ত্বিক ও দার্শনিক, প্রমথনাথ মূলত রসসাহিত্যিক। একজন তত্ত্বের টংকারে চিন্তাশীল পাঠককে নূতন জগতের সন্ধান দিলেন, অপর জন কড়িমধ্যম লাগাইয়া পাঠকের মন নহে, হৃদয়কে আকর্ষণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্বগ্রাহ্য আলোচনার জন্য পাঠক সমাজে দীর্ঘজীবী হইবেন। সাহিত্য বিচার বিশ্লেষণে তিনি একটি নৈয়ায়িক পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার সাহায্যে যে-কোনো রচনাকে চিরিয়া চিরিয়া দেখাইতে পারিতেন। অন্তর্দৃষ্টি অর্থাৎ intuition না থাকিলে এ-ভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না। এই অতি-বিশ্লেষণ ও পুরাতন ক্লাসিক পন্থায় গদ্য লিখিবার জন্য তাঁহারা প্রকাশ ভঙ্গিমা কিছু কৃত্রিম, কখনো-বা ক্লান্তিকর মনে হয়। উপমা-রূপকের অতি-ব্যবহারও তাঁহার রচনাকে কিছু মন্থর করিয়া ফেলিয়াছে তাহা সাধারণ পাঠক স্বীকার করিবেন। তবে যে-কোনো রচনাকে তিনি নিঃস্পৃহভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারিতেন, তা সে বৈষ্ণব পদাবলীই হউক আর চণ্ডীমঙ্গলই হউক। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম খণ্ডে তাঁহার ভূমিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি। মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে কেহ কেহ বিশালাকায় গবেষণা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহা পড়িয়া ষষ্ঠী-মনসা-ধর্মঠাকুরকে প্রণাম নিবেদন করিয়া পলাইতে ইচ্ছা করে। এই সমস্ত নীরস বিবৃতিমূলক সুদীর্ঘ কাহিনী, ডিগ্রীলাভার্থী ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া কে আর সখ করিয়া পড়িতে চাহিবে। মঙ্গলকাব্যে ততটা কবিত্ব না থাকিলেও সমাজ, ধর্ম-উপধর্ম, ইতিহাস, বিশেষতঃ বাঙালির নিষাদ ও কিরাত সংস্কার (Austric ও Sino-Tibetan), যাহা উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ সংস্কারের তলায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার পাঠোদ্ধার করিতে হইলে মঙ্গলকাব্যগুলির সাহায্য লইতে হইবে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ একটি ভূমিকায় মঙ্গলকাব্যের যাবতীয় স্বরূপ. বাখ্যা করিয়াছেন। ঐটি অধিগত করিতে পারিলে গুরুভার থীসিস গ্রন্থ পড়িবার প্রয়োজন হইবে না। অথচ তিনি মধ্যযুগ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন না, কিন্তু সে যুগের জীবন ও ইতিহাসকে এমন নিপুণ-ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে তাঁহাকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সূত্রধার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিশ্লেষণ-বিদ্যাকে তিনি রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষায় প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু আলোচনা শেষ হইল না— রবীন্দ্র-সাহিত্যে সমালোচনার অপূরণীয় ক্ষতি। রস ও মনন, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের এমন হরগৌরী রূপ আবার কবে প্রত্যক্ষ হইবে কে জানে।

বিশেষ ধরনের অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ছিল। স্বরযন্ত্র আক্রান্ত হওয়ায় সঙ্গীতজ্ঞের নির্দেশে উচ্চাঙ্গের মার্গ সঙ্গীত অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহার গান আমরা শুনি নাই, কিন্তু এই শাস্ত্রের বিজ্ঞানের দিকটি যে তাঁহার নখদর্পণে ছিল, নানা প্রসঙ্গে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। মজলিসী মানুষ ছিলেন, কিন্তু 'বক্তার' ছিলেন না। রাঢ়বাসীসুলভ কিছু রসবোধও ছিল, ছিল স্বাভাবিক কৌতুকবোধ, তাহার সঙ্গে মাঝে মাঝে মিশ্রিত হইত pungent তীক্ষ্ণতা। সব কিছু মিলিত হইয়া একটি গোটা মানুষ আমাদের সম্মুখে বিরাজ করিতেন। শেষজীবনে তাঁহার রাজনীতি করিবার সাধ জাগে, তখন পাটোয়ারি বুদ্ধি পাইয়া বসে। উদাহরণ স্বরূপ আর একজন মনীষীর কথা মনে পড়িতেছে, তিনি আচার্য সুনীতিকুমার। দুই জনই কিছুকালের জন্য স্বধর্ম ভুলিয়া দলাদলির রাজনীতির আবর্তে পড়িয়াছিলেন। শালগ্রাম শিলাকে বাটনা বাটায় প্রয়োগ করিলে শালগ্রামের মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, মসলা পেষণও সুষ্ঠুভাবে চলে না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য় সংযুক্ত করিবার জন্য আধুনিক কথাকারদের সম্বন্ধে কিছু নোট রাখিয়া গিয়াছেন। রাজনীতির সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিলে হয়তো তিনি উক্ত মহাগ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশটি পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিতেন। এখানে একটু জনান্তিকে বলিয়া লই, সেই নোটগুলি আমার হেফাজতে আছে।

প্রকাশক আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি যেন সেই নোটগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া পরিশিষ্টে যোগ করিয়া দিই। সেগুলি মাঝে মাঝে পড়িয়া দেখি, এবং নিজের অক্ষমতায় নিজেই লজ্জা পাই। ডঃ সুনীতিকুমারও রাজনীতিতে যোগ না দিলে হয়তো তাঁহার বিশাল গ্রন্থটিকে সংশোধন ও সংযোজন করিয়া যাইতে পারিতেন। পাঁচ কাজে জড়াইয়া না পড়িলে হয়তো বাংলাভাষায় আরো একখানি বিশাল গ্রন্থ লিখিতে পারিতেন এবং বাংলাভাষার ইতিহাস ও বিবর্তন সম্বন্ধে বাংলা গ্রন্থ রচনার অভাব দূর হইত। দুই জনেই বহু গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে গিয়া অনেক অবকাশ ও সময় অপব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহা না হইলে আমাদিগকে শুধু 'Origin and Development of the Bengali Language' এবং 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইত না।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোজাইক' খচিত ভিক্টোরীয় যুগের ভাষারীতি একালে কেহ অনুসরণ করে না। কারণ যুগ বদলাইয়া গিয়াছে, সে মানসিক শক্তিও নাই। এখন নাকি 'গালা ভরা বালা' নহে, 'নিরেট আংটি' (প্রথম চৌধুরী) চাই। একালের ভাষা নাকি অমিত রায়ের উক্তির মতো "কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা— তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো। ফুলেব মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো.. খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়।" আধুনিক সাহিত্য-সমালোচকেরা 'Chicago Critics'-এর মতো বিজ্ঞান, গণিত, জ্যামিতি-পরিমিতি, সংখ্যা বিজ্ঞান, চিত্রলেখের সাহায্যে ভাষাভঙ্গিমা ও বক্তব্যের নানা কেরামত সৃষ্টি করুন, এই অবসরে মনীষী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রণাম নিবেদন করিয়া এই আলোচনায় ডোর দিই।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

১

১৯৬৪ সালের একুশে জুলাই তারিখটা মনে পড়িতেছে। ঐ দিন শশিভূষণ দাশগুপ্ত মাত্র তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করেন। কালস্বরূপ কর্কট-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বহু ছাত্রের আচার্য, বহুজনের অন্তরঙ্গ, পণ্ডিত ব্যক্তিদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন আদর্শ গবেষক শশিভূষণ দাশগুপ্ত অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে জীবনরশ্মি সংহরণ করিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষাসমূহের অধ্যক্ষ এবং বাংলা সাহিত্যের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' স্বল্পভাষী শশিভূষণ দাশগুপ্ত জীবিতকালে লোকচক্ষু ও সাময়িক পত্রের অন্তরালে থাকিতেই ভালবাসিতেন। সভা-সমিতির বরাসন লাভে তাঁহার কোনও আগ্রহ ছিল না, 'রাজ্য ভাঙাগড়া'র রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহার ডাক পড়ে নাই।

বাংলা সাহিত্যের সৌখিন পাড়ায় যাঁহারা বিচরণ করেন, তাঁহারা হয়তো শশিভূষণকে চিনিবেন না। যাঁহারা সাহিত্যের গবেষণাকে পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে করেন না, তাঁহারাই তাঁহাকে যথার্থ চিনিবেন। বৌদ্ধতন্ত্র, বাংলার লোকধর্ম ও লোকসাহিত্য, বৈষ্ণব ও শাক্তদর্শন এবং তৎসংশ্লিষ্ট সাহিত্যাদি—যাহাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতির মনঃ-প্রকৃতি বিকশিত হইয়াছে, যাহাকে প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর পৈতৃক সংস্কার বলে, শশিভূষণ তাহাকেই দুর্জ্ঞেয় জটিলতা হইতে উদ্ধার করিয়া বাংলাদেশের চিত্তভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিশ্ছিদ্র গবেষণা ও একনিষ্ঠ সাধনা ইদানীং এদেশের বিদ্বৎসমাজ হইতে যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থগুলি সম্মুখে রাখিয়া মনে হয়, এ ধরনের নিষ্কাম গবেষণার আদর্শ ক্রমেই অপসৃত হইয়া যাইতেছে। সেই শূন্যস্থান পূরণ করিতে চাহিতেছেন কমলদলবিলাসী রম্যরচনাকারের দল।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় শশিভূষণের অসাধারণ নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও দূরদর্শিতা যেন পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারের দ্বারাই অর্জিত হইয়াছিল। তাঁহার সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও দূরসন্ধানী মনন বিষম, বিপরীত ও দুর্জ্ঞেয়কে একসূত্রে বাঁধিয়াছে। চিত্ত-গুহাশায়ী বজ্রমণিকে বিদীর্ণ করিয়া তিনি যেভাবে মাল্যগ্রন্থন করিয়াছেন, আজিকার 'প্র্যাগমাটিক' যুগের নগদ বিদায়ের দিনে তাহার মূল্য অবধারণ করা সম্ভব নহে। এই খর্ব মানসিকতার যুগে শশিভূষণের প্রতিভা ও চরিত্রের যথার্থ মূল্য নির্ণয় করাও সম্ভব নহে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি আমরা 'পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল' না হই, তাহা হইলে শশিভূষণ-রচিত গ্রন্থের মধ্যে সেই কুলপরিচয় ও পৈতৃক সংস্কার আমাদিগকে খুঁজিয়া লইতে হইবে।

শশিভূষণ একাধিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কিছু গদ্য সাহিত্যেও তাঁহার অবাধ অধিকার ছিল, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ব্যক্তিগত রচনাতেও তাঁহার সমৃদ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যাইবে, কথাসাহিত্য ও নাটকের কমলবনেও তাঁহার মনোমধুপ মত্ত হইয়াছিল। কিন্তু কবি-সাহিত্যিক-সমালোচক শশিভূষণের পরিচয় দিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন, এখানে তাহার স্থানসঙ্কুলান হইবে না। তাঁহার যে চারিখানি (দুইখানি ইংরেজি ও দুইখানি বাংলা) গ্রন্থ বাংলাদেশের মন্ত্রপ্রধান গবেষণা-সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এখানে সে সম্পর্কে দুই-চারি কথার অবতারণা করা যাইতেছে।

বাংলা সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অতি তরুণ বয়সে শশিভূষণ প্রবীণ তত্ত্বদৃষ্টির সাহায্যে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি নূতন শাখা লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যুষ-পর্বের সঙ্গে যাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা একদা এই অঞ্চলের জনচিত্তে যেমন গভীর প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তেমনি বাংলা সাহিত্যের সূচনাপর্বের মুখে সেই অপরিণত বাংলা ভাষায় অনেকগুলি পদ (চর্যাগীতি নামে পরিচিত) রচনা করিয়াছিলেন— যাহার আক্ষরিক অর্থের অন্তরালে আছে গূঢ় গহন অধিমানসের নির্বাণমুক্তির কথা। বাংলা চর্যাগীতিকাগুলি অনুশীলন করিতে গিয়া ছাত্রাবস্থাতেই শশিভূষণ প্রহেলিকাধর্মী পদের পর্দা সরাইয়া তাহার যথার্থ দার্শনিক তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উপলব্ধি করিলেন, শঙ্করাচার্য-কুমারিল ভট্টের বৌদ্ধ-বিরোধিতা তদানীন্তন তান্ত্রিক বৌদ্ধদের গোপনচারী করিয়াছিল— তাহার প্রমাণ চর্যাগীতিকা। তালপাতা ও তুলোট কাগজে লেখা বহু প্রাচীন ও অর্বাচীন পুঁথিতে মহাযান শাখা হইতে উদ্ভূত এই 'তান্ত্রিক বৌদ্ধ' সম্প্রদায়ের কৃত্য, আচার ও দর্শনের কথা লেখা আছে— কখনও 'সন্ধ্যাভাষা'র ('সন্ধাভাষা') ধূমল আবরণের ছদ্মবেশে, কখনও বা তত্ত্বকথা ব্যাখ্যায় গৃহীত দেবভাষার সাহায্যে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য সিদ্ধাচার্যেরা কিছুমাত্র সতর্ক ছিলেন না। তাঁহাদের এই সমস্ত সংস্কৃত রচনায় সমাস-সন্ধির নিয়ম উপেক্ষিত হইয়াছে, ষত্ব-ণত্ব, বিভক্তি-প্রত্যয় ইত্যাদি সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রাথমিক নিয়ম সম্বন্ধে তাঁহারা এমন উদাসীন ছিলেন যে, একালের সংস্কৃত পাঠার্থী বালকেরাও লজ্জা পাইবে। সেই সমস্ত পুঁথির কিছু আছে এসিয়াটিক সোসাইটির হেপাজতে, কিছু আছে প্যারিসে 'বিব্‌লিওথেক ন্যাশানেলে', কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে। ভারতে বরোদা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত বৌদ্ধ তন্ত্রের কিছু কিছু পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে।

শশিভূষণ কিছু মূল পুঁথি, কিছু মূলের 'রোটোগ্রাফ', কিছু-বা মুদ্রিত পুঁথি লইয়া এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করিলেন। বস্তুত চর্যাগীতিকা বা দোঁহার যথার্থ স্বরূপ ও তাৎপর্য আবিষ্কার করিতে হইলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকসাহিত্যের বিপুল জঞ্জাল ঘাঁটিতে হইবে নিরঙ্কুশ ধৈর্যের সঙ্গে--একথা তিনি তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কাজটি যে কী অসাধারণ পরিশ্রমসাধ্য তাহা এ পথের পথিকেরা কিঞ্চিৎ অবগত আছেন। এ বিষয়ে ইদানীং দেশে-বিদেশে কিছু কিছু আলোচনা হইতেছে, কিন্তু আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই তত্ত্ব-দর্শনের তিনিই ছিলেন একমাত্র গবেষক। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাহিত্য অধিগত করিয়া ফেলিলেন। এম. এ. পাস করিবার পর দুই বছরের মধ্যে তাঁহার প্রথম গবেষণা 'An Introduction to Tantric Buddhism' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিল (১৯৩৭)। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং আনুষঙ্গিক বাধার জন্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে অনেক পরে—১৯৫০ সালে। অবশ্য এটি প্রকাশের কিছু পূর্বে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য লেখা তাঁহার 'Obscure Religious Cults As Background of Bengali Literature' প্রকাশিত হইয়াছিল (১৯৪৬)। এই দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর তত্ত্বসন্ধানী জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা শশিভূষণের বিপুল পরিশ্রম ও ক্ষুরধার বিশ্লেষণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন। দুরূহ তত্ত্বপূর্ণ এই গ্রন্থ দুইটি পরিপক্ক প্রবীণ বয়সের রচনা নহে, একথা ভাবিতেই বিস্ময় জাগে।

প্রথম গ্রন্থে শশিভূষণ তান্ত্রিকতার স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে, তন্ত্রাচার ব্রাহ্মণ্য সাধ্যসাধনার মতো বৌদ্ধ দার্শনিকতাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। বরং বৌদ্ধতন্ত্রের সম্পর্ক, একের উপর অপরের প্রভাব, মূল বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে তন্ত্রের খিড়কীপথে

বহমান রহস্যময় যান-উপযান, মন্ত্রযান ('মন্ত্রনয়') বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি উপদর্শনের স্বরূপ ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ ইত্যাদি দুরূহ ব্যাপারে নিযুক্ত তরুণ শশিভূষণ সেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মকে ঘৃণা-নিন্দার হাত হইতে রক্ষা করিলেন। তাঁহার পূর্বে ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে কিছু কিছু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু শশিভূষণ বিশুদ্ধ অ্যাকাডেমিক কৌতূহলের পক্ষ হইতে বহুনিন্দিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ উপসম্প্রদায়ের কৃত্য, চর্যা ও দর্শনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেন এবং এই গোপনচারী ও রহস্যবাদী সম্প্রদায়ের বিচিত্র তত্ত্বকথা ও বিচিত্রতর সাধনপ্রণালীর প্রতি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের প্রথম বিষয়— হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন্ ধরনের সম্পর্ক ছিল, বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দুতন্ত্রেরই কোন অর্বাচীন শাখা কিনা সে বিষয়ে বহু মুদ্রিত গ্রন্থ এবং অসংখ্য পুঁথি হইতে নানা তথ্য উদ্ধার করিয়া তিনি দেখাইলেন--তন্ত্র ও তন্ত্রচর্যা ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী হিন্দু-সমাজের একচেটিয়া কারবার নহে। আধিমানসিক সংস্কারকেও যে দেহাধারে উপলব্ধি করা যায়, তন্ত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় সাধনা তাহারই দিগ্‌নির্দেশ করিতেছে। বৌদ্ধ মহাযান শাখার বিভিন্ন উপশাখা কিভাবে হিন্দু-তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হইযাছিল, শশিভূষণ তাহারই অবজেকটিভ স্টাডি করিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল ধারিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে তন্ত্রসম্বন্ধে নানা-ধরনের বিরুদ্ধতা জমিয়া উঠিতেছিল। তন্ত্রের 'ভুক্তি-মুক্তি' তত্ত্ব হইতে অচিরে 'মুক্তি' খসিয়া পড়িল এবং মুক্তির স্থানলাভ করিল 'ভুক্তি'। 'পঞ্চ মকার', নাদবিন্দুসাধন, প্রজ্ঞা-উপায়ের যুগনদ্ধরূপ--ইত্যাকার ব্যাপারের ফলে বাহিরের দিক হইতে লালসাব লোলতা যেভাবে রিরংসাকে উদগ্র করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে সে মতবাদকে শ্রদ্ধা করা কঠিন। তন্ত্র কোথাও 'পর্ণোগ্রাফি', কোথাও কামসংহিতা, কোথাও বা ভোগায়তন দেহের উচ্ছ্বসিত বর্ণনায় পর্যবসিত হইয়াছে। তাই ব্যক্তিগত অভিরুচিকে নিষ্ক্রিয় তন্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত করানো সহজ নহে। শশিভূষণকে এই 'ক্ষুরস্য ধারা'-র উপর দিয়া অতি সাবধানে চলিতে হইয়াছে। তন্ত্রের মূলতত্ত্ব, তাহার স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ, সাধ্য-সাধনায় তন্ত্রের প্রয়োগ, বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব ও নির্বাণের স্বরূপ নির্ণয়ে তন্ত্রের সহায়তা, পরবর্তীকালে মহাযানের উপশাখা সমূহের দার্শনিক ভূমি প্রস্তুতিতে তন্ত্রের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে শশিভূষণের মৌলিক অনুসন্ধান গবেষণাক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত আবিষ্কার বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সেইদিক হইতে সমস্ত বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে শশিভূষণের 'An Introduction to Tantric Buddhism' একখানি উৎস-গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হইবে।

উল্লিখিত গবেষণাগ্রন্থে দেখা যাইতেছে, চর্যাগীতিকার দার্শনিক পটভূমি বিচার করিতে গিয়া শশিভূষণ ছাত্রজীবন হইতেই বৌদ্ধধর্মের শেষপর্বের রূপান্তর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহোদয়ের মহাসমুদ্রের মতো রত্নগর্ভ চিত্তের সংস্পর্শে আসিয়া এবিষয়ে শশিভূষণেরও কৌতূহল জাগ্রত হয়। সুরেন্দ্রনাথের দীপশিখা হইতে শশিভূষণ নিজের অন্তর -প্রদীপটিকে জ্বালাইয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি উল্লিখিত গ্রন্থের গবেষণালব্ধ সূত্রের সাহায্যে অধিকতর ব্যাপক পটভূমিকায় তন্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা-সম্পর্কিত উক্ত গবেষণাগ্রন্থটি ১৯৩৭ সালের মধ্যে সমাপ্ত হয় এবং ঐ বৎসরই তিনি ইহার জন্য প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। কিন্তু এতবড় গুরুতর কর্ম সম্পাদনের পর তিনি ক্ষণমাত্র বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ১৯৩৯ সালের মধ্যেই আর একটি দুরূহ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করিলেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভের দুই বৎসরের মধ্যেই পি-এইচ. ডি. উপাধিলাভের জন্য 'Obscure Religious Cults as Background of Bengali

Literature' রচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারকমণ্ডলীর নিকট পেশ করিলেন (১৯৩৯) এবং অচিরে (১৯৪০) উক্ত বিচারকমণ্ডলীর দ্বারা উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়া তরুণ বয়সেই শশিভূষণ প্রবীণতার জ্ঞানগৌরবে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। পূর্বের গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং ঈষৎ সীমাবদ্ধক্ষেত্রে গবেষণাকর্ম চালাইয়াছিলেন। উপরন্তু উক্ত আলোচনাটি অ্যাকাডেমিক ও দার্শনিক ধরনের হইয়াছিল। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাহার যোগ ছিল অল্প। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থে আলোচনা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অধিকতর প্রসারিত লইল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য পুঁথিপত্রের ধূলিধূসর কলেবর ঝাড়িয়া মুছিয়া শশিভূষণ সেকালের বাঙালী-জীবনের এক গূঢ় রহস্য আবিষ্কারে ব্রতী হইলেন।

বিবিধ, বিচিত্র ও রহস্যবাদী 'কাল্ট' (cult) এবং নানা উপসম্প্রদায়ের বিচিত্রতর অধ্যাত্মচেতনা, সংস্কার, অধিমানসের ব্যঞ্জনা, আচার-আচরণের দুর্জ্ঞেয় টোটেম (totem) তত্ত্ব প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক ব্যাপার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালীর সাহিত্যে ও সংস্কারকে যে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও রূপান্তরিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড, হোমো-আলপাইন, প্রোটোনর্ডিক, মেলানিড, ইণ্ডিক প্রভৃতি নানাবিধ জনসম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে পূর্বভারতে যে বিচিত্র নৃতাত্ত্বিক ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে, চলতি কথায় তাহাকে বলে বাঙালী জাতি। কয়েক হাজার বৎসর ধরিয়া এই মিশ্র ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক কটাহে। আকারে-আয়তনে বাঙালী উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে সদাসর্বদা গঙ্গা-যমুনার মতো দুইটি পৃথক ধারা দেখা যায় না। গাত্রবর্ণে, আয়তনে, নাসাকর্ণের মাপে এবং মুণ্ডের গোলত্বে অনেক সময়ে নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে জল-অচল অন্ত্যজবর্ণের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। মহাকালের সূপশালায় ব্রাহ্মণ, ইতর-ভদ্র, জলচল ও জল-অচল-সমস্ত বিচিত্র ও বিপরীত নরগোষ্ঠী একসঙ্গে 'সুপক্ব' হইয়াছে। তাহারই নাম বাঙালী জাতি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকা ও ভিত্তিভূমি বিচার করিলে দেখা যাইবে, দুইটি বড়ো বড়ো সংস্কৃতির ধারা বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে সুগ্রথিত করিয়াছে। একটি আদিম জীবনধারা, আর একটি পরবর্তিকালে-অর্জিত ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষাবংশবাহী (অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থরাজি) ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক সংস্কৃতির ধারা। মঙ্গলকাব্য, নাথসাহিত্য, শিবায়ন, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ভবানন্দের 'হরিবংশ' (সপ্তদশ শতাব্দী) প্রভৃতি কাব্যে আদিরসের উল্লাস, বৈষ্ণব সহজিয়া, আউল-বাউল, সাঁইগুরু, কর্তাভজা প্রভৃতি রহস্যবাদী সাধকদের যৌন প্রতীক আশ্রয়--এগুলির মধ্যে সেই আদিকালের জীবনচেতনা অস্পষ্টভাবে রহিয়া গিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত গীতিসাহিত্য--ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এবং পৌরাণিক ঐতিহ্যের পরিস্রুত ধারাও আছে। কিন্তু কালক্রমে এই দুই বিভিন্ন প্রবাহ এমনভাবে একাকার হইয়া গেল যে, পরে তাহাদের পৃথকভাবে চিনিয়া লইবার উপায় রহিল না। কিন্তু বাহিরের আবরণ খুলিয়া ফেলিলেই সেই পুরাতন রূপের আভাস পাওয়া যাইবে। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পশ্চাদ্‌পটে যে সমস্ত লোকধর্ম (অর্থাৎ আদিম সংস্কারের ধ্বংসাবশেষ এবং পুরাতন যুগের যৎসামান্য) বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার মধ্যেই এজাতির পৈতৃক সংস্কারের যথার্থ পরিচয় নিহিত আছে। শশিভূষণ বাঙালীর সেই পরিচয় আবিষ্কারের জন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের মৃত্তিকা খননকার্যে একাকী প্রস্তুত হইলেন। বিশুদ্ধ ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্বের সাহায্যে বাঙালীর সে-কুলপরিচয় আবিষ্কার করা যাইবে না। সকলের উপর ক্রান্তদর্শী সাহিত্যবোধ না থাকিলে বাঙালীচেতনার যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কারের স্থলে শুধু 'পাথুর্যা প্রমাণ'

আকাশস্পর্শী হইয়া উঠিবে। দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি শাখার সঙ্গে শশিভূষণ গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। আবার অপরদিকে সাহিত্য-সংক্রান্ত সহজাত রসবোধ তাঁহার সমস্ত চেতনাকেই নিয়ন্ত্রিত করিত— এই ব্যাপারে তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মের রহস্যাচার ও দুর্জ্ঞেয়তাকে তিনি বুদ্ধির সীমার মধ্যে অবধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থে সেই চাবিটির সাহায্যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মূল স্বরূপ বিশ্লেষণের নিপুণ প্রয়াস লক্ষ্য করা যাইবে।

'Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature'-এ চর্যাগীতিকা ও সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল সম্প্রদায়, নাথধর্ম ও নাথসাহিত্য ধর্মঠাকুর ও ধর্মমঙ্গল কাব্য—মোট পাঁচটি প্রধান উপ-ধর্মশাখা তাহাদের দর্শন, কৃত্য ও সাহিত্যরূপ লইয়া শশিভূষণ সবিস্তারে গবেষণা করিয়াছেন। অবশ্য সাহিত্যের রূপ ও রীতি অপেক্ষা বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের তত্ত্বালোচনাই এ গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পৌরাণিক আদর্শ এবং অ-পৌরাণিক—গ্রাম্য, অপ্রচলিত ও রহস্যভারাতুর বিশ্বাস—উভয় রীতিই এ সমস্ত উপসম্প্রদায়ে স্বীকৃত হইয়াছিল। শশিভূষণ এই সময়ে গুরুমুখী ও দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে অতি তরুণ বয়সেই বিশেষ অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন এবং বিশুদ্ধ অ্যাকাডেমিক কৌতূহলের বশে রহস্যবাদী উপসম্প্রদায়ের তুচ্ছ সাহিত্য-নিদর্শনকেও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল, প্রাচীন আর্যেতর সংস্কার এবং পৌরাণিক তান্ত্রিক ও বৌদ্ধসংস্কারের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে বাঙালীর অভিনব মানসপ্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার প্রভাব পড়িয়াছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে। সাহিত্যের পশ্চাদ্‌পটে অবস্থিত বাঙালীর মিশ্র চিত্তপ্রকৃতির যথাযথ স্বরূপ আবিষ্কারের জন্য ভবিষ্যতের পণ্ডিতসমাজ শশিভূষণকে নিশ্চয়ই সাধুবাদ দিবেন।

৩

ইহার পর আমরা শশিভূষণের অনেকগুলি বাংলা গ্রন্থের মধ্যে মোট দুইখানি গবেষণা পুস্তকের উল্লেখ করিব। এইগুলি তাঁহার প্রবীণ জীবনের প্রথম ভাগে রচিত। তন্মধ্যে 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ— দর্শনে ও সাহিত্যে' এবং 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য' গ্রন্থ দুইখানিতে তাঁহার পরিপক্ক বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞাননিষ্ঠার অভ্রান্ত প্রমাণ রহিয়াছে। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' প্রকাশিত হয়। বস্তুত এই গ্রন্থটি সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই একটি অতি-মূল্যবান গবেষণাকর্ম বলিয়া বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। রাধা চরিত্রের মূল বেদে না পুরাণে, অথবা অর্বাচীনকালের লোকসাহিত্যে প্রোথিত, তাহা লইয়া ইতিপূর্বে নানা তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা হইয়াছে। কিন্তু এই বিচিত্ররূপিণী নারীচরিত্রের মধ্যে যে একটি বিশেষ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শশিভূষণ সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ মন্থন করিয়া রাধা চরিত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাহারই সঙ্গে 'রাগানুগা' ভক্তিধর্মের প্রভাবে সাহিত্যের বিকাশ-পরম্পরাকে নূতনভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

রাধাতত্ত্বের মূলকথা শক্তিতত্ত্ব। বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে তাই গোত্রগত সম্পর্ক আছে— যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাহার সবটা ধরা পড়ে না। বাংলাদেশের মধ্যযুগে বাঙালীসমাজ দুই নারীর ভজনা করিয়াছিল। একজন রাধা—যিনি কুলত্যাগিনী ; ভাববৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লোকেই তাঁহার নিত্য অভিসার। ইহা যেন অনন্ত সৌন্দর্য ও অনশ্বর প্রেমের সন্ধানে উধাও হইবার রোমান্টিক অভীপ্সা, বিজ্ঞানের ভাষায় 'সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স' (centrifugal force)। আর অন্য জন উমা—যিনি কুলকন্যার প্রতীক। উমা-পার্বতীর মধ্য দিয়া দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার নিরিখে বিশ্বমাতা আদ্যাশক্তি ঘরের মেয়ের রূপ ধরিয়াছেন। বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে পারি,

'সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স' (centripetal force)। বাঙালীর চিত্তগহনে এই দুই বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে সুপ্রাচীন কাল হইতে। সেই তত্ত্বের পটভূমিকায় শশিভূষণ রাধাতত্ত্বকে সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাধাতত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সর্বসাধ্যসার হইলেও শশিভূষণ সমগ্র ভারত ঐতিহ্যের আদর্শেই এই তত্ত্বের বিকাশ আলোচনা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রাধাতত্ত্ব, গৌরতত্ত্ব এবং বৈষ্ণব সহজিয়াদের কিশোরী-ভজনের অতি গূঢ় দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনার সাহায্যে, সমগ্র ভারতের প্রায় যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তসম্প্রদায়ের নানা শ্রেণী, শাখা ও প্রস্থানের বিবরণ দিয়া এই বিচিত্র কাল্ট (cult) -এর দার্শনিক সিদ্ধান্তের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন--

> 'বৈষ্ণধর্মের লীলাবাদ--বিশেষ করিয়া রাধাবাদ আমাদের জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্যেরই দ্যোতক, ধর্ম ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত এই জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্য বহুদিন আমাদের মনকে নাড়া দিয়াছে, সুতরাং জিনিসটিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি— সেই লক্ষ্য নূতন তথ্য ও দৃষ্টি দিয়াছে। জিনিসটির একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আরও দেখিতে পাইয়াছি রাধাবাদের ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় সে বৈশিষ্ট্য শুধু রাধাবাদে নয়, ব্যাপকভাবে সে বৈশিষ্ট্য ভারতীয় শক্তিবাদে।'
> ('শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে', প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন)

সমগ্র ভারতীয় মানস, বিশেষতঃ বাঙালীর অধিমানস, রাধাতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া কিভাবে রসসাহিত্যে ও মননসাহিত্যে বিকাশলাভ করিয়াছে, কখনও আবেগকে, কখনও চিন্তাকে, কখনও উভয়কে প্রভাবিত করিয়া যুগপৎ ধর্মসাধনা ও সাহিত্যসাধনাকে নব নব বৈচিত্র্যের সম্মুখীন করিয়াছে, শশিভূষণের গ্রন্থে সেই জাতিগত ঐতিহ্য-সংবাদটি গবেষণার আকারে বিবৃত হইলেও আসলে শিল্পীর রস-সংবেদনই তাঁহাকে এই কষ্টসাধ্য কর্মে প্রেরণা দিয়াছে।

শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব (রাধাবাদী)--এই শাখাত্রয় যে মূলতঃ একই ভাব-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং সে-ভাবটি যে আদ্যাশক্তির কায়ব্যূহ, এই তত্ত্ববাদ-- ইহাকে তিনি যেভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় গবেষণার আকাশে তিনি একটি উজ্জ্বল তারকারূপেই স্বীকৃত হইবেন। তাঁহার এই গ্রন্থটির সর্বভারতীয় মর্যাদা ও ব্যাপক প্রসার অন্য প্রদেশবাসীদেরও কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছে। তত্ত্বদর্শনের দিক হইতে গৌড়-বঙ্গের সঙ্গে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের যে রাখীবন্ধন হইয়াছে, ইহার সমস্ত গৌরব শশিভূষণের প্রাপ্য--যদিও নীরব ও নিরলস কর্মযোগী কোন খ্যাতি গৌরব কামনা করেন নাই। যে কোন আত্মপ্রচারের প্রতি তাঁহার স্বভাবসুলভ ঔদাসীন্য ছিল। তাই এই মহাগ্রন্থ তাঁহাকে যে কতটা গৌরবের অধিকারী করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন কৌতূহল ছিল না। এখন তিনি দিব্যধামবাসী, সুতরাং আজ এ-কথা বলিতে কোনও সংকোচ নাই যে, ইদানীং গবেষণার নামে যে গুরুভার তথ্যপুঞ্জ ক্রমেই বিকটাকার লাভ করিতেছে, তাহার তুলনায় ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের জার্মান-পণ্ডিতসুলভ এই বিপুল সৃষ্টি আগামীযুগের মননের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ রচিত না হইলে শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের যথার্থ সম্পর্ক ধরা পড়িত না। অবশ্য এটি গবেষণাগ্রন্থ হইলেও রসজ্ঞ পাঠক এই গ্রন্থ হইতে শুধু 'জ্ঞান-নিম্বফল'-ই নহে, তাহার সঙ্গে মানসিক আরামও পাইবেন প্রচুর। একাধারে 'Literature of Power' এবং 'Literature of Knowledge'-এর চমৎকার সমন্বয় ইদানীং গবেষণাগ্রন্থে খুব অল্পই চোখে পড়িবে। এই একখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা অবলীলাক্রমে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের তত্ত্বসাগর পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারি। কাঞ্চী-কেরল-

অন্ধ্র হইতে আরম্ভ করিয়া কাশী-কোশল-বিদেহ পর্যন্ত যাতায়াত করিতে পারি। গান্ধার-পুরুষপুর-তক্ষশীলা হইতে ব্রহ্মাবর্ত-আর্যাবর্ত পরিক্রমাতেও বাধা নাই। পরিশেষে অঙ্গ-দ্বারবঙ্গ-তীরভুক্তি পার হইয়া গৌড়-বঙ্গ-সুহ্ম-সমতট-হরিকেল-প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত একই অয়নরেখাকে অনুসরণ করিতে পারি। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে আধুনিক যুগের রাজনীতিসর্বস্ব স্বদেশানুরাগ-মূলক রাষ্ট্রিক ঐক্যচেতনা ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু সমগ্র ভারতব্যাপী বিশেষ-বিশেষ ধর্মচেতনা, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও আধিমানসিক সত্তাকে একসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছিল, তাহা শশিভূষণের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' হইতেই প্রতিভাত হইবে। মোট কথা, এই গ্রন্থ তত্ত্বদর্শন ও সাহিত্যরূপে যতটা মূল্যবান, ভারত ঐতিহ্যের স্মারকসূত্র হিসাবেও ততটাই মূল্যবান।

৪

শশিভূষণের বহুখ্যাত ও পুরস্কারে সম্মানিত গবেষণাগ্রন্থ 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য' ১৩৬৭ সালের ভাদ্রমাসে প্রকাশিত হয়। ইহা পূর্বের গ্রন্থেরই পরিপূরক। 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' আলোচনা প্রসঙ্গে শশিভূষণ ভারতীয় আধ্যাত্ম-সাধনার মূল প্রকৃতি যে শক্তিকেন্দ্রিক, সে বিষয়ে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হন এবং সেই নিরিখে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব তত্ত্ববাদ, দর্শন ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে শাক্ত তত্ত্বকথা এবং শাক্ত সাহিত্যকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে গিয়া প্রথমে তিনি প্রাগৈতিহাসিক, বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক দর্শন ও সাহিত্যে শক্তিদেবীর স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন। কীভাবে আদ্যাশক্তিরূপে উমাপার্বতীর আর্বিভাব হইল, কেমন করিয়া ইতিহাস ও জনমানসের নানা স্তর পার হইয়া শিবের অর্ধাঙ্গিনী বাংলা দেশে এক বিচিত্র রূপ লাভ করিলেন— শশিভূষণ এই গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত এবং চমকপ্রদ তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। রামায়ণাদি অনুবাদ-সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্যাদিতেও শক্তি দেবতার বিকাশ হইয়াছে, বিশেষত মঙ্গলকাব্যের, পার্বতী-চণ্ডী-দুর্গা-অভয়ার কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মঙ্গলকাব্য মূলতঃ বাঙালীর আদিম আরণ্য ও কৃষি সংস্কারের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে হর-পার্বতীর উপাখ্যান আছে যাহাতে তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনের বাস্তব চিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অভয়ামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলে নিজ পূজা প্রচারের জন্য দেবীকে বিশেষ তৎপর হইতে দেখা যায়। এই কাব্যে প্রয়োজন স্থলে তাঁহাকে নির্মম হইতে হইয়াছে। পূজালাভের জন্য কিছু নীচতাও আশ্রয় করিতে হইয়াছে। ইহা আদিম মনের লক্ষণ। একদা নিষাদ ও পাহাড়ী জাতির মধ্যে পশু-অধিষ্ঠাত্রী এবং কান্তারবাসিনী কোন-এক-শিকারের দেবীর আরাধনা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধযুগের অবসানে এবং পৌরাণিক যুগে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রাক্কালে এই অরণ্যবাসিনী আদিম-দেবীকে আদ্যাশক্তিরূপে সম্ভবতঃ গ্রহণ করা হয়। ইহার উপর উত্তরপৌরাণিক যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের পালিশ পড়িলেও এই দেবীর পরিকল্পনায় আর্যেতর বৈশিষ্ট্য জড়িত ছিল। লোভ, স্বার্থ, নিষ্ঠুরতা, হঠকারিতা—এগুলি মঙ্গলকাব্যের চণ্ডিকাচরিত্রে নিতান্ত অপ্রতুল নহে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে শাক্তসাহিত্য মঙ্গলকাব্যের অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া দিয়া আর-একটি শাখাপথ খনন করিয়া লইল। ইহা শাক্ত-গীতিকা। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি মাতৃতন্ত্রের ভক্তসাধক ও কবিগণ মঙ্গলকাব্যের শক্তিকেই মাতৃরূপে দেখিলেন, আপনাকে অসহায় শিশুর মতো কল্পনা করিয়া সর্বশক্তিময়ীর অঞ্চলতল আশ্রয় করিলেন।

বহুকাল ধরিয়া বাংলাদেশ তন্ত্রের দেশ বলিয়া পরিচিত। বেদগোপ্য সাধনায় শিরঃস্থিত সহস্রারের সহস্রদলে শিবশক্তির সামরস্যসম্ভূত দিব্যানন্দ লাভ করা, নিজ দেহেই মোক্ষপ্রাপ্তি, ভুক্তি-মুক্তিকে একসূত্রে বাঁধিয়া দেওয়া—তন্ত্রসাধনার ইহাই রীতি। এদেশের তন্ত্রসাধকেরা

গুরুশিষ্যানুক্রমে মন্ত্রগুপ্তির রীতিতে ইহাকে সংরক্ষণ করিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের এখানে-ওখানে তন্ত্রাচারের যৎসামান্য উল্লেখ থাকিলেও এই তত্ত্বকথা ও কৃত্য এই যুগের সাহিত্যকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে নাই। কিন্তু উমাপার্বতী ও মেনকাকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত আগমনী ও বিজয়ার গান রচিত হইয়াছিল, সেগুলি সাধক ও ভক্তসমাজে অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে—যদিও শাক্ত কবি ও সাধকগণ কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গান রচনা করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে শাক্তধর্ম ও শাক্তসাহিত্যের ভারতব্যাপী ঐতিহ্যের পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য শশিভূষণ অন্য প্রদেশের ভাষায় রচিত কাব্য ও গান হইতেও অনেক উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, এবং শাক্তধর্ম শাক্তসাহিত্যকে শুধু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া নানা অঞ্চল হইতেই এই তত্ত্বদর্শনের মূল রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন, অবশ্য বাংলার শাক্তসাধনা ও শাক্তসাহিত্যই তাঁহার আলোচনার প্রধান বিষয়। কারণ ভারতের পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া তন্ত্রের একটি বিশেষ সাধনপ্রণালী যেমন দীর্ঘদিন ধরিয়া বিকশিত হইয়াছে, তেমনি আদ্যাশক্তির মানবীমূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া একপ্রকার ভক্তিসাহিত্য (মূলতঃ গীতিসাহিত্য) বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। বাৎসল্যভাব এ শক্তির মূল উপাদান। মাতাপুত্রের মানবীয় লীলা এই ভক্তিশাখার আলম্বন-বিভাব। বৈষ্ণব সাধ্যসাধনার আদিরসাশ্রিত সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা পরবর্তীকালে অনধিকারীর হস্তক্ষেপের ফলে অমেধ্য গৌড়ীসুরায় পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শাক্ত ভক্তিসাধনার সেইরূপ কোনও বিকার দেখা দেয় নাই। কারণ মাতা-পুত্রের চিরপবিত্র বাৎসল্যরসের সম্পর্ক কোনও প্রকারেই বিকৃত হইতে পারে না।

শশিভূষণ তথ্য, তত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃত নানা সূক্ষ্ম ও স্থূল উপাদান হইতে শাক্তদর্শনের মূল-রহস্যের সন্ধানে তৎপর হইয়াছেন এবং সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিষয়টিকে তিনি কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে দেখিয়াছেন, সেইপ্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বলিতেছেন, "বিষয়টির দুইটি দিক রহিয়াছে; একটি ঐতিহাসিক, অপরটি আধ্যাত্মিক। এই দুইটি দিককে আমি পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করি না। ঐতিহাসিক দৃষ্টি অবলম্বন করিলেই যে আধ্যাত্মিক সকল সত্যকে অস্বীকার করিতে হইবে এমন কথার তাৎপর্য আমি উপলব্ধি করিতে পারি না...ঐতিহাসিক দৃষ্টির উপরে যাঁহারা জোর দিতে চান তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ইতিহাস শুধু তথ্যকে ঘটায় না, তথ্যঘটনা দ্বারা সে জাগাইয়া তোলে ভাবব্যঞ্জনা; সেই ভাবব্যঞ্জনা ঘনীভূত হইয়াই অধ্যাত্মদৃষ্টির রূপলাভ করে। এক্ষেত্রে, তথ্যের ঘটনায় সত্য-মানুষের চিত্তভূমিতে তাহার যত রকমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাহার কোনই মূল্য নাই, আশাকরি এমন কথা কোন ঐতিহাসিকই বলিবেন না। আবার যাঁহারা অধ্যাত্মদৃষ্টির উপরেই জোর দিতে চান, তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অধ্যাত্ম সত্য যদি নিত্য এবং পূর্ণও হয়, তথাপি কালে কালে যে-সব তথ্যের ভিতর দিয়া তাহার উদ্ভাস ও আত্মপ্রকাশ, তাহাকে আমরা উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিতে পারি না।" ('ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য', নিবেদন।)

এখানে তিনি তাঁহার অবলম্বিত পদ্ধতির কথা সুস্পষ্টভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। শাক্ত ভক্তির যেটুক 'সাধনসমর', সেটুকু ব্যক্তিসাপেক্ষ; আর বাকি অংশটুকু বস্তুপ্রবাহের উপরেই ভাসমান। সুতরাং এই সাধনার যেমন একটি দেশ-কাল-নিরপেক্ষ নির্বিকল্প সত্তা আছে, তেমনি এই বিবর্তনের পিছনে দেশকালের প্রভাবও অল্প নহে। এই দুইয়ের যুক্তরূপ দর্শনই যথার্থ তাত্ত্বিক ও গবেষকের দৃষ্টি। শশিভূষণ শাক্ত ভক্তিবাদ ও দর্শনকে যেমন অধ্যাত্মমার্গের দিকে হইতে বিচার করিয়াছেন, তেমনি আবার আর পাঁচটি বিকাশধর্মী চিত্তবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

করিয়াও দেখিয়াছেন। তত্ত্বদর্শন ও ইতিহাস-দর্শন তাঁহার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে অধিকতর স্বচ্ছ করিয়াছে তাহাতে কোনও সংশয় নাই। আধুনিক ভারতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁহার এই গ্রন্থ দিঙ্নির্দেশক বলিয়া গৃহীত হইবে।

উপরে আমরা শশিভূষণের যে প্রধান চারখানা গবেষণা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম, সেগুলি ছাড়াও সাহিত্যবিচার, অলঙ্কারশাস্ত্র , হিন্দুধর্মের গঠন-পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ চিন্তাশীল পাঠকসমাজে বিশেষভাবে পরিচিত। আসলে তাঁহার মনের বাতায়ন সব সময় খোলা থাকিত। সেই অর্গলহীন পথে নানা চিন্তা ও তত্ত্বকথা অবাধে প্রবেশ করিত। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে 'দুঃসাধ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুর্দান্ত সিদ্ধান্তে'-নিমগ্ন ভীতিকর গবেষক বলাও ঠিক হইবে না। গবেষণাকে কৌতূহলের রসে মিশাইয়া পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন জাগাইয়া দিয়া তিনি আধুনিককালে তত্ত্বগ্রন্থের একটি বিচিত্র মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন।

অকালে শশিভূষণ বিদায় লইয়াছেন, আকস্মিকভাবে মৃত্যুদূত আসিয়া তাঁহার কর্মোদ্যমে ছেদরেখা টানিয়া দিয়াছে। ভারতের 'শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্যে' তিনি দক্ষিণভারতের শক্তিসাধনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার সুযোগ পান নাই। কারণ এই বিষয়ে ইংরেজীতে কিছু কিছু আলোচনা হইলেও তাহার পরিমাণ অতি অল্প এবং সবটা নির্ভরযোগ্য নহে। যে তথ্যগুলি second hand- উৎস হইতে পাওয়া যাইতে পারিত, তিনি তাহার উপর আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ

> "অন্ততঃ তথ্যগুলি যাচাই করিয়া লইবার মত কিছু কিছু দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার অধিকার থাকিলেও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম ; কিন্তু তাহাও নাই বলিয়া সম্পূর্ণ ধারকরা তথ্য অবলম্বনে আলোচনা করিতে বিরত থাকিলাম। কিন্তু গ্রন্থের এই অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি, এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কিছু অগ্রসর হইবার সংকল্পও পোষণ করিতেছি।"

তাঁহার এই মন্তব্য হইতে মনে হইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণভারতীয় ভাষা শিখিয়া তিনি ঐ ভাষায় রচিত শাক্তসাহিত্য ও শাক্তদর্শন পাঠ করিবেন এবং পরে তাঁহার রচনায় দক্ষিণভারতীয় উপাদান সংযুক্ত করিবেন— এই ছিল তাঁহার মনোগত অভিলাষ। কিন্তু সে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিল না, এ গ্রন্থের ক্রোড় অঙ্ক কোনও দিন অভিনীত হইবে কিনা কে বলিতে পারে?

৫

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে শশিভূষণ চর্যাগীতিকার এক মৌলিক তথ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। তখন তিনি লণ্ডনে ছিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' বিভাগের সংস্কৃতের অধ্যাপক আরনল্ড বাকে ছিলেন গানপাগল। কর্নেল বাকের নিকট কয়েকটি গান শুনিয়া শশিভূষণ বুঝিলেন যে এগুলি পুরাতন চর্যাগানেরই দোসর, তাই দেহে কালব্যাধিভার লইয়াও নেপালে ও দার্জিলিঙে গিয়াছিলেন-এবং চর্যার আধুনিক উপাদান-সংক্রান্ত অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এগুলি মূলতঃ বৌদ্ধ মহাযানের উপশাখা বজ্রযান ও সহজযানের সাধনভজন বিষয়ক গীতিকা হইলেও পরিবর্তীকালে ইহাতে ব্রাহ্মণ্য শাক্ত তন্ত্রের প্রচুর প্রভাব পড়িয়াছে এবং তাই এই সমস্ত পদের অনেক স্থলে বৌদ্ধমতবাদের সঙ্গে শাক্ততন্ত্রের অনেক তত্ত্ব মিশিয়া গিয়াছে। 'নৈরামণি'-কে উমা-পার্বতী-দুর্গা-চণ্ডিকায় পরিণত করিতে ভক্তসাধকদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় নাই। 'বাজ্জলী শ্রীবজ্রযোগিনী' কোন কোন চা-চা গীতে (চর্যাগীতে) প্রায় শাক্ত মাতৃকামূর্তিতে পর্যবসিত হইয়াছেন। নিম্ন এইরূপ একটি বজ্রযানী-শাক্তভাবমিশ্রিত পদের উল্লেখ করা যাইতেছে :

—বারাহিবে স্থিত ত্রিদল সরোজা দিনকর মণ্ডলমধ্য স্থিতা।
রক্ত ধর্মোদয়া চাপিয়া তাণ্ডবী মুক্তকেশা দিগম্বরা ।। ধ্রু।।
প্রণমামি বাজ্ছলী শ্রীবজ্রযোগিনী অনুত্তর-বোধি-প্রদায়িনী।
দ্বিভুজ একমুখ ত্রিনি লোচনা লৌহিত বর্ণ প্রজ্জ্বলিতা।।
ত্রিভুবনব্যাপিনী দহিণ করোটিধারী মজ্জপূরিত কপালধারী।
চক্রী-কুণ্ডল-কণ্ঠীধারী হাথে লোচক বিভূষিণী।।
চরণে নৌপুর দহিন কটিয়ে মেখলা নরশিরমালা বিভূষিতা।
বিশ্বজননী পরম গুহ্যেশ্বরী ভবভয়তারিণী বীরেশ্বরী
সহজানন্দ স্বরূপিণী দেবী সিদ্ধি ঋদ্ধি চরণ প্রসাদদায়িনী।

শশিভূষণ মনে করিয়াছিলেন, হয়তো এই নবাবিষ্কৃত পদগুলি বিশ্লেষণ করিলে বৌদ্ধ সহজিয়া মত ও শাক্তমতের এক বিচিত্র রসায়নের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে এবং বাংলা সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করা সম্ভব হইবে। খ্রীঃ একাদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত বিশেষ কোন বাংলা গ্রন্থ হস্তগত হয় নাই। অথচ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রাথমিক বাংলা ভাষার রচিত চর্যা-গীতিকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যাহার যৎসামান্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। অসুস্থ শরীরেই শশিভূষণ পদগুলির ভাষা ও বক্তব্যবিষয় ধরিয়া একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করেন এবং প্রথমদিকে অল্প কয়েকটি পদে পাঠান্তর ও টীকা টিপ্পনী সংযুক্ত করিয়া নব-আবিষ্কৃত পদগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের অভিলাষ করেন। তাঁহার আবিষ্কৃত এই গীতিকাগুলি প্রসঙ্গে বাকে সাহেবের কথা অনেকের মনে পড়িবে। ভারতীয় মার্গসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতে বিশেষ অভিজ্ঞ ও অনুরাগী বাকে এক নেপালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কণ্ঠে বিচিত্র গান শুনিয়া তাহাকে লোকসঙ্গীত মনে করেন এবং সেই সন্ন্যাসীর অনেকগুলি গান টেপ-রেকর্ড করিয়া লন। লণ্ডনে তিনি শশিভূষণকে সেই গানগুলি শুনাইয়াছিলেন। বাকে অনুমানে বুঝিয়াছিলেন যে সেগুলি বৌদ্ধসম্প্রদায়ের। গানগুলি শুনিয়া শশিভূষণের মনে হইল, ইহাই তো অতি পুরাতন বজ্রযানী বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের ভজনগীতিকা। বাকে সাহেবের কাছে তিনি এই শ্রেণীর বাইশটি গানের সন্ধান পাইয়াছিলেন--যাহার মধ্যে অন্ততঃ চার-পাঁচটি গানে হাজার বছরের পুরাতন সুর ধ্বনিত হইয়াছে, যাহার সঙ্গে বৌদ্ধ চর্যাগীতিকার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তাঁহার আবিষ্কৃত এই শ্রেণীর গানের নমুনা উল্লেখ করা যাক .

এ মহিমণ্ডল হেরু সমুদ্রা
ধনজনযৌবন উদকবিন্দু চন্দা।
পেখুরে অমুস্মিন লোয়নে গয়নে
ফুল্ল পরিহাসই জিনগুণ রঅনে।। ধ্রু।।
কণ্ঠে দারী ইন্দ্রিয়া বিষয় সব একা
সমুদ্রতরঙ্গ জিম একু অনেকা।
পবন দুয়ি ভেদি দিঢ় খিরে চিআ
জ্বলয়ি বজ্রানল দহদিহ দাহিয়া।
সুগত ভেদ ভাবয়িয়া ন হোয়ি রে স্বধা
সুগতবজ্র ভণ অচিন্তালয় বোধা।।

সুগতবজ্রের এই পদটি চর্যাগীতিকারই অনুরূপ। অনেকে মনে করেন, বাংলা হইতে পলাতক চর্যাগীতিকাগুলি নেপালে আশ্রয় লওয়ার পর ইহার কিছু অংশ তিব্বতে চলিয়া যায়, তিব্বতী ভাষায় সেগুলি অনূদিত হয়। কালক্রমে হিন্দুধর্মের দাপটে এবং ইসলামের

প্রতিকূলতার জন্য এই দেশে প্রকাশ্যভাবে চর্যাগীতিকার ব্যবহার লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু শশিভূষণ অধ্যাপক বাকে-পরিবেশিত তথ্য হইতে বুঝিতে পারিলেন, এখনও দার্জিলিং, নেপাল-ভুটানের বৌদ্ধ গুম্ফায় চর্যার অনুরূপ গীতিকার ব্যবহার আছে। নেপালী ভাষায় ইহাকে বলে 'চা-চা' গীত। মনে হয়, 'চা-চা' শব্দ চর্যারই অপভ্রংশ। সেই সমস্ত পুরাতন তথ্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বস্তুত বন্ধ্যা নহে, খুব সম্ভব বজ্রযানী-সহজযানী চর্যাগান এই দুই শতকে এবং তাহার পরেও অনুশীলিত হইয়াছে। এইভাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারিল না, মৃত্যু আসিয়া যবনিকা টানিয়া দিল। জানি না, এ পথে আবার কোন্ নূতন পথিক আসিয়া অতীতের বাণীকে মূকত্বের অভিশাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।

তারাশঙ্কর, বিশালতা ও উত্তরকাল

উপন্যাসের সঙ্গে মানবজীবনের যতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বোধহয় সাহিত্যশাখার অন্যান্য শরিকের সঙ্গে ততোটা নয়। কল্পনাকে বাদ দিয়ে শিল্পলোক রচনা সম্ভব কিনা তা 'ইমেজিস্ট্' গোষ্ঠীই বলতে পারবেন। প্রতিদিনের ভূমিচারী মানুষ মোটামুটি প্রত্যক্ষ, তাকে জানবার জন্য ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সাহায্য সব সময়ে প্রয়োজন নাও হতে পারে। কিন্তু সেই মানুষকে যখন সাহিত্যে, বিশেষতঃ উপন্যাসে ঠাঁই দিতে হয় তখন প্রত্যক্ষ বাস্তব মানুষের জীবনে কল্পনার রং মেশানো অপরিহার্য হয়ে পড়ে। স্থূল বস্তুপিণ্ড থেকে শিল্পী রূপমূর্তি তৈরি করেন। বলাই বাহুল্য, শুধু হাতুড়ি ছেনি থাকলেই পাষাণের বুকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায় না। তা সম্ভব হলে মূর্তি নির্মাণে রদ্যাঁর ডাক পড়ত না, রাজমিস্ত্রীই যথেষ্ট হত।

উপন্যাস মূলতঃ বস্তুজগতের কারবারী হলেও ঔপন্যাসিক কল্পনার দ্বারা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে 'রিপোর্টাজ' ও আইন- আদালতের নথি থেকে উদ্ধার করে জীবনের মধ্যে তার সঙ্গতি ও ঐক্য বিধান করেন, পলাতক চলিষ্ণুতাকে নিত্যরূপ দান করেন। সেই নিত্যরূপ আসলে জীবনের শিল্পরূপ। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম কল্পনার বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেন। সেই ঐশ্বর্যের অর্থ বিশালতাবোধ। প্রতিদিনের ছিটেফোঁটাও যেমন উপন্যাসের উপাদান, তেমনি দেশকালপরিব্যাপ্ত কাহিনী ও জীবনের বিপুল প্রসারও উপন্যাসের হৃদ্য সামগ্রী। বস্তুতঃ ঔপন্যাসিকের কুশলী নিপুণতার সঙ্গে বিশালতাবোধ না থাকলে উপন্যাস যুগকে অতিক্রম করতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাসে এ গুণটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রধানতঃ ইতিহাসের রোমান্টিক পরিবেশ বেছে নিয়েছিলেন এই বিশালতার দৈর্ঘ্যপ্রস্থবেধ সৃষ্টি করার জন্য। কল্পনার অকৃপণ সহযোগিতা ব্যতীত ইতিহাসের পটে এই বিশালতা সৃষ্টি করা যায় না। তার প্রধান দৃষ্টান্ত রমেশচন্দ্রের 'শতবর্ষ' এবং প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'। বিশালতা বলতে শুধু পটভূমিকার বিপুল প্রসার নয়। ঘটনার কুশীলবগণ প্রতিদিনের ধূমাঙ্কিত গ্লানি ছাড়িয়ে অপরিমেয় ঐশ্বর্যের তুঙ্গলোকে না উঠলে উপন্যাসের ভাবগত বিশালতা ঠিক ফুটে উঠতে পারে না। বোধহয় বর্তমান শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র মধ্যেই সেই বিশালতাবোধ সমগ্র জাতিমানসকে অনেকটা প্রকাশ করতে পেরেছে। আমাদের ধারণা, এ উপন্যাসটি যদি শুধু ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের রচনা হত, এবং ঘটনা ও চরিত্রের মাঝে যদি কবি এসে স্বর্ণযবনিকা টেনে না দিতেন, তা হলে এটি বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশাল উপন্যাস হতে পারত। কারণ রবীন্দ্রনাথই এই উপন্যাসে ভারতাত্মার যথার্থ স্বরূপ অবধারণ করতে পেরেছিলেন। তখন রাজনৈতিক উচ্চমঞ্চে দেশ-নেতৃবর্গ যতোই, 'ভারতমাতা' 'ভারতমাতা' বলে কণ্ঠ বিদীর্ণ করুন না কেন তাঁরাও একচক্ষু হরিণের মতো শুধু রাজনৈতিক ভারতমাতার উজ্জীবন কামনা করছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিক উত্তাপের মধ্যে বাস করলেও তার জ্বালার চেয়ে আলোর মহিমাকেই চিত্তলোকে বিকীর্ণ করতে চেয়েছিলেন। এর পর শরৎচন্দ্র এসে বাংলা উপন্যাসকে এমন একটা আবেগতরল মর্মবেদনার মধ্যে স্থাপন করলেন যে, বিশালতাবোধকে সুলভ হৃদয়োচ্ছ্বাস গ্রাস করে নিল। 'পথের দাবী'তে তিনি বিশালতাবোধের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ আবিষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের

রোমান্স তাঁকে তরল আবেগের জলাভূমিতে টেনে নিয়ে গেছে, কর্মোদ্যমের শিলাচত্বরে স্থাপন করতে পারেনি। মানবিক বাস্তব আবেগের রোমান্টিক মূর্তি, ভাবোচ্ছ্বাসের সকরুণ মর্মপীড়া, নিষ্প্রাণ সমাজ ও প্রাণরসময় মানবপ্রবৃত্তির সহজিয়া দ্বন্দ্ব, গার্হস্থ্য স্নেহপ্রেমপ্রীতির ঘরোয়া আবেগতরঙ্গ— শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ মানবজীবন বলতে এটাই বুঝেছিলেন। তাঁর দু' একটি উপন্যাসে নিয়তির গূঢ় ব্যঞ্জনা থাকলেও শরৎসাহিত্য বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবারের একটি আবেগময় মানবিক রূপ উদঘাটিত করেছে। অর্ধ-শতাব্দী আগে জন্মালে তিনি দ্বিতীয় তারক গঙ্গোপাধ্যায় হতেন। সে যাই হোক, সে-আবেগ যে-পরিমাণে উচ্ছ্বসিত, সেই পরিমাণে প্রত্যয়গভীর নয়। দেশকালপরিব্যাপ্ত বিশাল সৌধ নির্মাণও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ব্যথাহত নরনারীর অশ্রুবেদনাময় মূর্তি অঙ্কন করতে চেয়েছিলেন, তাতেই তাঁর ছিল অসাধারণ দক্ষতা।

শরৎচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ও রূপান্তর ঘটালেন তারাশঙ্কর। বাংলা উপন্যাসের যে বিশালতাবোধ বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথে এসে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, তারাশঙ্করের রুক্ষ কঠোর লেখনী স্পর্শে আবার তার উজ্জীবন হল। তিনি শরৎচন্দ্রের ভাবালু আবেগকে যেন পাশ কাটিয়ে দেশ ও কালের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও জীবনের নতুন রূপ ফুটিয়ে তুললেন। এক সমাজ ভেঙে পড়ছে, তার স্বপ্ন, সংস্কার, সীমাবদ্ধ জীবনের সদাসন্তুষ্ট পরিবেশ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আর একদিকে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে অনাহূত অতিথির বজ্র-নিনাদ শোনা যাচ্ছে। এই দুই মানসিকতার দ্বন্দ্বকে তিনি দুই ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বরূপে দেখাতে চেয়েছেন। দেশ, কাল, সমাজ ও জীবনের বিশাল প্রান্তরে তিনি নরনারীকে স্থাপন করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাস শুধু অবসরবিনোদনের সুলভ সামগ্রী নয়, কিংবা 'লিবিডো'-আক্রান্ত মানব-জন্তুর গুহাহিত বিকৃত কামনার পঙ্কোৎক্ষেপ সৃষ্টি করাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'— যে-কোন উপন্যাস থেকেই দেখা যাবে, তিনি কীভাবে সমকালীন যুগ ও জীবনকে বিশেষ ভাবরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রাচীন মহাকাব্যের সঙ্গেই যেন তাঁর কোন কোন উপন্যাসের কৌলিক সম্পর্ক আছে। মহাকাব্য যেমন দেশকালের প্রতীক, শুধু ব্যক্তিজীবনের ক্ষণকালীন আবেগ নয়,—তারাশঙ্করের কোন কোন উপন্যাসকেও মনে হয়, তার মধ্যে যেন একটা বিশেষ যুগ তার আশা, আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা, সফলতা নিয়ে বিশাল পটভূমিকায় এমন কয়েকটি নরনারীকে সৃষ্টি করেছে যে, তারা যেন মহাকাব্যেই অধিকতর শোভা পায়।

কেউ কেউ কয়েক খণ্ডে 'এপিক নভেল' লিখেছেন। কিন্তু তার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত ভাব ও ভাবনা অধিকতর প্রশ্রয় পাওয়ায় সে সমস্ত এপিক নভেলের বস্তুগত এপিকধর্ম প্রায় কোথাও রক্ষিত হয়নি। ব্যক্তিগত চিন্তার রোমন্থন আর যাই হোক, এপিকধর্মী হতে পারে না। কিন্তু তারাশঙ্কর যথার্থই গদ্যে মানবভাগ্যকে মহাকাব্যের বিশাল, ব্যাপক ও গভীরতার মধ্যে স্থাপন করেছেন। যা নিপুণ, তীক্ষ্ণ, সূচীমুখ, বিশ্লেষণধর্মী, তা আমাদের আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু সে আনন্দ তাজমহল দর্শনের আনন্দ। নগাধিরাজের বিস্ময়স্তব্ধ বিশালতা সৃষ্টি করতে গেলে তারাশঙ্করের মতো পেশীবহুল রূপদক্ষ ভাস্করের প্রয়োজন।

অবশ্য কেউ কেউ বলেন, তারাশঙ্করের উপন্যাস আঙ্গিকের দিক থেকে কোথাও কোথাও কিছু শিথিল। তাই সমালোচক বলেছেন, 'অনেক সময় মনে হয়, তারাশঙ্কর ঠিক ঔপন্যাসিক নহেন; তিনি গ্রাম্যজীবনের চারণকবি।' গ্রাম্যজীবনের যে গতায়ুরূপ এবং নব প্রাণবেগের চিত্র তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠেছে তাকে ঠিক চারণগান এবং তাঁকেও চারণকবি বলা যায় না। প্রতিদিনের গ্রামীণ পাঁচালী রচনা ও সেই জীবনের গুণগান করাই বোধ হয় 'গ্রাম্যজীবনের চারণকবির' উদ্দেশ্য। কিন্তু তারাশঙ্কর কি শুধু গ্রাম্যজীবনের সুলভ ভাবাবেগে-উদ্বেল রোমান্টিক

আখ্যান লিখেছেন? গ্রামজনপদের সুখদুঃখ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ছায়াধূসর নরনারীর স্খলিত পদক্ষেপ, আবার গৈরিক মৃত্তিকানুরঞ্জিত বলিষ্ঠ বাহুর উদ্ধত উৎক্ষেপ—তাঁর উপন্যাসের মানুষগুলিকে কি দুরধিগম্য জীবনরহস্যের বিশাল চেতনার মধ্যে উপস্থাপিত করেনি?

তারাশঙ্করের কোন কোন রচনায় নিপুণ নিটোল আঙ্গিকের মাপাজোখা পরিমিতি নেই, একথা স্বীকার্য। কিন্তু জীবনের বিশালতা ও গভীরতা যেখানে উপেক্ষিত, সেখানে শুধু আঙ্গিকের কলাকৌশল কালজয়ী হতে পারে না। আঙ্গিকের নৈপুণ্য কোথাও অবহেলিত হলেও যদি শিল্পের মধ্যে জীবনের গভীর প্রত্যয় ও ব্যাপ্তি স্বীকৃত হয়, তবে সেই সাহিত্যই অপার বিস্ময় হয়ে দেখা দেয়। তারাশঙ্কর সেই বিশাল বিস্ময়রসের শিল্পী, যা উপন্যাসকে মহাকাব্যের তুঙ্গ শীর্ষে তুলে ধরে।

ইদানীং বাংলা উপন্যাসের বিচিত্র রূপকল্প শিল্পীদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। তারাশঙ্করের তিরোধান হলেও বাংলা উপন্যাস বন্ধ্যা হয়ে থাকবে না, থাকছেও না। আজ সামাজিক, পারিবারিক, মানসিক—নানা দিক দিয়ে নানা রন্ধ্রপথে শিল্পীদের উদ্যত লেখনী ধাবমান হয়েছে। প্রকাশভঙ্গীর যে কত বৈচিত্র্য, জীবনকে দেখার যে কত অভিনব দৃষ্টিকোণ সাম্প্রতিক ঔপন্যাসিককে চেতনার দুর্গমতায় নিয়ে যাচ্ছে, তার হিসাব নিলে তারাশঙ্করের অবসান আর ক্ষোভের কারণ হয়ে থাকবে না। কিন্তু একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সাম্প্রতিক উপন্যাসের বিস্ময়কর বিশ্লেষণ এবং মনোলোকের গুহাপথে অবাধ সঞ্চরণ সত্ত্বেও উত্তর-তারাশঙ্কর ঔপন্যাসিকগোষ্ঠী মানুষের জীবনজিজ্ঞাসাকে কি কোনো তুঙ্গ শীর্ষে স্থাপন করতে পেরেছেন, অথবা চেতনার গভীর সমুদ্রতলে ডুব দিয়ে অকূল অপার বারিধির নৈঃশব্দ্য অবধারণ করতে পেরেছেন? জীবনের সেই কিনাঙ্ক-কঠিন বলিষ্ঠতা, সুদৃঢ় প্রত্যয়, নিয়তিতাড়িত মানবজীবনের সন্ত্রস্ত অপসরণ, আবার নতুন যুগ রচনার উদ্দেশ্যে পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিতকে ইতিহাসের ভাবীকালে উপস্থাপনা—একালের ঔপন্যাসিকেরা সেই দিগন্তসঞ্চারী বিশালতার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পেরেছেন কি? আগামীকালের পাঠক তার বিচার করবেন। উপসংহারে শুধু এইটুকু বলতে পারি, তারাশঙ্করের দেশকালপাত্রের মধ্যে যে গভীরতা ও ব্যাপ্তি আছে, ইদানীন্তন কালের কথাসাহিত্যে নানা সূক্ষ্ম কারুকর্ম থাকলেও সে ধরনের এপিক-রস তার থেকে বড়ো-একটা পাওয়া যায় না। একালের খণ্ড খর্ব বিক্ষিপ্ততার যুগেও যে গদ্যে মহাকাব্যের বিশাল, গাম্ভীর্য ও গভীরতা সৃষ্টি করা যায়, তারাশঙ্করের কয়েকখানি উপন্যাস তার দুর্লভ দৃষ্টান্তস্থল। উত্তরকাল, অযুত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও, তাঁকে এখনও অতিক্রম করতে পারেনি, একথা স্বীকার করতে বাধা নেই।

গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে

তখন আমরা এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাদি পড়ে তাঁয় প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। পত্র ব্যবহার চলতে লাগল। একবার বিদ্যাসাগর কলেজের নতুন ভবনে সাহিত্যসেবক সমিতির অধিবেশনে মোহিতলাল, ডঃ সুশীলকুমার দে প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সাহিত্যের নানা আলোচনা চলতে লাগল। আমরা বয়ঃকনিষ্ঠরা পিছনের সারিতে বসে আলোচনা শুনতে লাগলাম। কী একটা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কথা উঠল। তারপরে বলা হল 'গীতাঞ্জলি' রচিত না হলে, এবং কবিকৃত অনুবাদ লণ্ডন থেকে প্রকাশিত না হলে য়ুরোপে বাংলা সাহিত্যের গৌরব স্বীকৃত হত কি? তার জন্য রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠ সাধুবাদের যোগ্য।

কিন্তু মোহিতলাল ভিন্ন কথা বললেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ যেদিন থেকে নিজেকে কবি না ভেবে নবী অর্থাৎ Prophet ভাবতে শুরু করলেন, দেশবাসী, এমন কি পাশ্চাত্য কাব্যরসিকরাও তা স্বীকার করে নিলেন, তখনই কবি রবীন্দ্রনাথের অপমৃত্যু হল। যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হতে পারতেন, তিনি নিজের হাতে নিজ স্বাভাবিক প্রতিভার শেষকৃত্য করলেন। কবি ও নবী সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা। একজন বৈচিত্র্যের পূজারী, অপরজন ঐক্যের সাধক। সাধক-সত্তা ও কবি-সত্তার মধ্যে জ্ঞাতিবিরোধ আছে। উপনিষদ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ এবং নোবেল পুরস্কার না পেলে তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করতে পারতেন না বটে, কিন্তু নিজের স্বধর্ম ত্যাগ করে দার্শনিক ও মিস্টিক তত্ত্বের সাধক বলে দেশ-বিদেশে পরিচিত হতে পারতেন না। মোহিতলাল বোধহয় বলতে চেয়েছিলেন, বিশুদ্ধ কবিত্বের সঙ্গে ধর্মীয় ভাব-ভাবনা ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিরোধ আছে। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদের পর থেকে তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবনদেবতা ইত্যাদি নিয়ে এতটা সচেতন না হলে লিরিক কবি হিসাবে তাঁর সৃষ্টিকর্ম আগামী সাহিত্যের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় হয়ে থাকতে পারত। যেদিন থেকে তিনি ভারতের বাইরে ভারতাত্মার বাণীবাহক রূপে নিজেকে প্রচারিত হবার সুযোগ দিলেন, সেই দিন থেকে তাঁর বিশুদ্ধ কবি-চেতনা আধ্যাত্মিক রাহুর গ্রাসে পড়ল। তাঁর পূর্বে বিবেকানন্দ যে ভার নিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে সেই ভার নেওয়ার কোন আবশ্যকতা ছিল না।

মোহিতলালের মন্তব্য নিয়ে সভায় একটু মৃদু গুঞ্জন উঠল, কিন্তু কবি সমালোচকের রক্তচক্ষু সমস্ত বাদ-প্রতিবাদ স্তব্ধ করে দিল। আমরা তখন ছাত্র, আমাদের তখন শুনবার বয়স, তাই ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করলেও সাহস করে তাঁর কোন কথার প্রতিবাদ করতে পারিনি। তাঁকে যাঁরা চিনতেন, তাঁরা তাঁর ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার তীব্রতাও জানতেন। সে যাই হোক্, তখনই আমার মনে হয়েছিল, ঈশ্বরভাবনা ও মিস্টিক চেতনাকে সাহিত্যের প্রাঙ্গণ থেকে নির্বাসন দেওয়া যায় না। তা হলে পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ কবির রচনাকে বরবাদ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'-পর্ব থেকে উত্তরোত্তর যত অগ্রসর হয়েছেন ততই ঈশ্বর ভাবনায় মগ্ন হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে সাধু-সন্ত বলে গ্রহণ করাও চলবে না। সর্বোপরি তিনি কবি, ঈশ্বরভাবনাও তাঁর কবিত্বের অঙ্গীভূত। অবশ্য ঈশ্বর তত্ত্ব নয়, তত্ত্বকে রসে পরিণত করাই তাঁর কবি-স্বভাব। মধ্যযুগের অনেক খ্রীষ্টান ভক্তও অনেক ভক্তির

কবিতা ও স্তোত্র রচনা করেছিলেন। কিন্তু তা সব সময় কবিত্বরসমণ্ডিত হয়নি। কারণ তাঁরা মূলতঃ ছিলেন সাধ্য-সাধন তত্ত্বের সেবক, কবিতা ও স্তোত্র হয়েছিল তাঁদের ধর্মানুশীলনের বাহন। চিরঞ্জীব শর্মা (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) ভক্তির গান লিখেছিলেন, নিজেও ছিলেন ভক্তিপথের পথিক, কিন্তু তাঁর বিখ্যাত ভক্তির গানেও স্বাভাবিক কবিত্বের চেয়ে তত্ত্বকথা অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' সেদিক থেকে এক বিচিত্র সৃষ্টি, একই সঙ্গে কবিতা ও গানের যুক্তবেণী রচনা করেছে।

এই সঙ্গীতগুচ্ছের মূল কথা ভক্তি। কখনো দাস্যভক্তি, কখনো সখ্যপ্রেম, কখনো 'পিতা নো অসি', কখনো কান্তাপ্রেম। মহর্ষি ছিলেন শান্ত ভক্তির উপাসক। রবীন্দ্রনাথের ভক্তিসাধনায় বৈষ্ণবদের চতুর্বিধ ভক্তির (দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর) কখনো কখনো প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু সে ভক্তি বৈষ্ণবদের মতো উচ্ছ্বসিত আবেগের নির্বাধ প্রবাহ নয়। 'নৈবেদ্য' কাব্যে তিনি প্রার্থনা করেছেন—

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য-গীত-গানে
ভাবোন্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল ফেনভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ।

বোধহয় এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তির প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ আছে। জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি চৈতন্যপন্থীদের কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। বিশুদ্ধজ্ঞানবাদী রামমোহন তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও চৈতন্যপন্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন উপনিষদের শান্তভক্তির সাধক। কেশবচন্দ্র সেন শেষ জীবনে বৈষ্ণব ও শাক্ত ভক্তির প্লাবনে ভেসে গিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনো ভক্তির ফেনোচ্ছ্বাসে ভেসে যান নি। তাঁর ঈশ্বরসাধনা প্রধানত ব্যক্তি-ঈশ্বরের সাধনা অর্থাৎ বেদান্তের নির্বিকল্প ব্রহ্মবাদ নয়, ঈশ্বরচেতনা তাঁর কাছে শান্ত রসের মধ্য দিয়ে বিচিত্র রূপে আবির্ভূত হয়েছে। তা হচ্ছে বাস্তব জীবনরস। প্রিয়রূপে, সখারূপে, পিতারূপে ঈশ্বরকে তিনি উপলব্ধি করেছেন, কখনো জীবনদেবতা রূপে, কখনো অন্তর্যামী রূপে, কখনো, বিচিত্ররূপিণী, মানসসুন্দরী রূপে ঈশ্বরকে তিনি নিজ হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করেছেন। মোহিতলাল বলেছেন, 'গীতাঞ্জলি'- পর্বে (গীতালি, গীতিমালা) অধ্যাত্মচেতনার অতিরেক গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দিয়েছে। একথা বোধহয় যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ 'গীতাঞ্জলি' পর্ব থেকে 'পূরবী', 'পূরবী'র পর থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত ঈশ্বরভাবনা তাঁকে সৃষ্টির নানা ঘাটে নিয়ে গেছে। সুতরাং 'গীতাঞ্জলি' থেকে তাঁর সিসৃক্ষু শক্তির ক্রমিক অবসান হয়েছে, এ কথা তথ্যসঙ্গত নয়। গানের একটি ধ্রুবপদ থাকে, যা বার বার ঘুরে ঘুরে আসে। 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্র-সাধনার সেই ধ্রুবপদ।

ঈশ্বরবোধ ও অধ্যাত্ম অনুভূতি শুধু কি ভারতের একচেটে সম্পত্তি? তাঁর গীতাঞ্জলি ('Song Offeings') প্রকাশের পর 'The Times Literary Supplement, (Nov 7, 1912) -এ তাঁর গীতিগুচ্ছ সম্বন্ধে যে প্রশস্তি প্রকাশিত হয়েছিল, এখানে তা উল্লেখ করে পুঁথিতে ডোর দিই। তখন কি পাশ্চাত্য জগৎ, বিশেষত উপনিবেশ-শিকারী গ্রেট ব্রিটেন রাতারাতি ভক্ত বনে গিয়েছিল? তখনও মহাযুদ্ধ বাধেনি, পরে যুদ্ধফেরত হতাশ সৈনিকরা না হয় প্রতিক্রিয়া কাটাবার জন্য ভক্ত হলেও হতে পারত। কিন্তু তার পূর্বেই, গীতাঞ্জলির ইংরেজি-অনুবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর এত প্রশংসা শুরু হল কেন? কবিত্ব, না অধ্যাত্ম-চেতনা, কোন্‌টি রণরঙ্গমুখর য়ুরোপকে আকৃষ্ট করেছিল? উক্ত উদ্ধৃতি থেকে কিছুটা উল্লেখ

করি :

> Mr. Tagore has translated his poems into English prose, simple and often half-mystical, so that their sense is not obscured by an obvious inadequacy of language; and in reading them one feels, not that they are the curiosities of an alien mind, but that they are prophetic of the poetry that might be written in England if our poets could attain to the same harmony of emotion and idea. That divorce of religion and philosophy which prevails among us is a sign of our failure in both. We keep our emotions for particular things and cannot carry them into our contemplation of the universe. That chills us and turns our speech to cold scientific jargon; and the jargon affects our very thought, so that from speaking of life as if it were a mechanical process we come to think of it so. But this Indian poet, without any obsolete timidity of thought, makes religion and philosophy one. He contemplates the universe as a primitive poet might contemplate a pair of lovers, and makes poetry out of it as naturally and simply. As we read his pieces we seem to be reading the Psalms of a David of our time who addresses a God realized by his own act of faith and conceived according to his own experience of life.

লেস্‌লি এ্যাবারক্রমবি (Lascelles Abercrombie) ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান (Manchester Guardian) পত্রিকায় (১৪ জানুয়ারি ১৯১৩). "The Indian Poet" নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতে "great spiritual and mental rhythm", "mystical or metaphysical significance in life" লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর শেষ মন্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য- "The characteristic of the epoch of Rabindranath is plainly mysticism, speaking out of Life itself." গীতাঞ্জলির কবিত্বের প্রশংসা করেও য়ুরোপীয় পাঠক ও সমালোচক এ কাব্যের অতীন্দ্রিয় ভাবরহস্যের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এর বহুগানের শেষ কথা আত্মসমর্পণ, এটি খ্রীস্টান পাঠককে স্বতই ভক্তির দিকে টেনে নিয়েছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন, প্রাচ্য দেশ থেকে এক নতুন 'মেসায়া' এসেছেন য়ুরোপকে প্রার্থিত পথের সন্ধান দেবার জন্য। অযুত কর্মে ব্যস্ত রাজসিক প্রকৃতির য়ুরোপকে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে তাঁর গানের তাৎপর্য বুঝতে হয়েছিল। গীতাঞ্জলির মূল সুর যে ভক্তি তা তাঁরাও উপলব্ধি করেছিলেন। এ্যাবারক্রমবি উক্ত আলোচনায় আরো বলেছিলেন যে, প্রাচীন ইরানীয় Sufi কবিরা যেমন প্রেম-ভক্তির দ্বারা উপলব্ধির গভীরে ডুবে গিয়েছিলেন, একালের একজন ভারতীয় কবি সেই রসসমুদ্রেই অবগাহন করেছেন। সুতরাং কবি ও নবীর মধ্যে তফাত কোথায়? কবি তখনই নবী হন যখন তিনি রচনার মধ্যে অধরা লোকের স্পন্দন উপলব্ধি করতে পারেন, এবং নবী তখনই কবি হন যখন ব্যাখ্যাতীত উপলব্ধিকে রূপময় করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি তাই রূপলোক ও রসলোকের সঙ্গমতীর্থে অবস্থান করছে।
